KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : মীর্ হুসেন
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৫৫/১ ৫৫/২ ৫৫/৩ ৫৫/৪	Year of Publication : শ্রাবণ ১৪০১ কার্তিক ১৪০১ মাঘ ১৪০১ বৈশাখ ১৪০২
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : আবদুর রাউফ	Remarks :

I.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫৫ সংখ্যা ৩ মাঘ ১৪০১

প্রখ্যাত অসমিয়া সাহিত্যিক বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য লিখেছেন, পরম বৈদগ্ধের নিদর্শনবাহী সন্দর্ভ 'বাকসংস্কৃতি এবং ভারতীয় সাহিত্য'—এটি তাঁর লেখকজীবনে বাংলা লেখার প্রথম প্রয়াস।

ঔপনিবেশিক আমলে পূর্ব ভারতে আদিবাসী সমাজের উপর হিন্দু-প্রভাবের বিস্তার নিয়ে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক প্রফেসর বিনয় চৌধুরীর গবেষণামূলক ধারাবাহিক নিবন্ধের প্রথম কিস্তি।

ঢাকার রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্র ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ডক্টর আহমদ রফিকের নিবন্ধ— 'সংস্কৃতির অবক্ষয়, সাম্প্রদায়িকতা ও বাঙালির সম্প্রীতি ভাবনা'।

বামফ্রন্ট সরকারের প্রাক্তন স্পিকার মনসুর হবিবুল্লাহ্ আলোচনা করেছেন 'মুসলমানদের জন্য চাকরিতে সংরক্ষণের প্রশ্ন'।

'শিল্পী সাহাবুদ্দিনের সৃষ্টি-ভুবন' নিয়ে সত্যজিৎ চৌধুরীর আলোচনা।

অমলেশ ত্রিপাঠীর রেনেসাঁস-ভাবনা, মহাদেব সাহার কবিতা, উত্তর আধুনিকতা এবং সদ্য অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস 'অলীক মানুষ' নিয়ে আলোচনা।

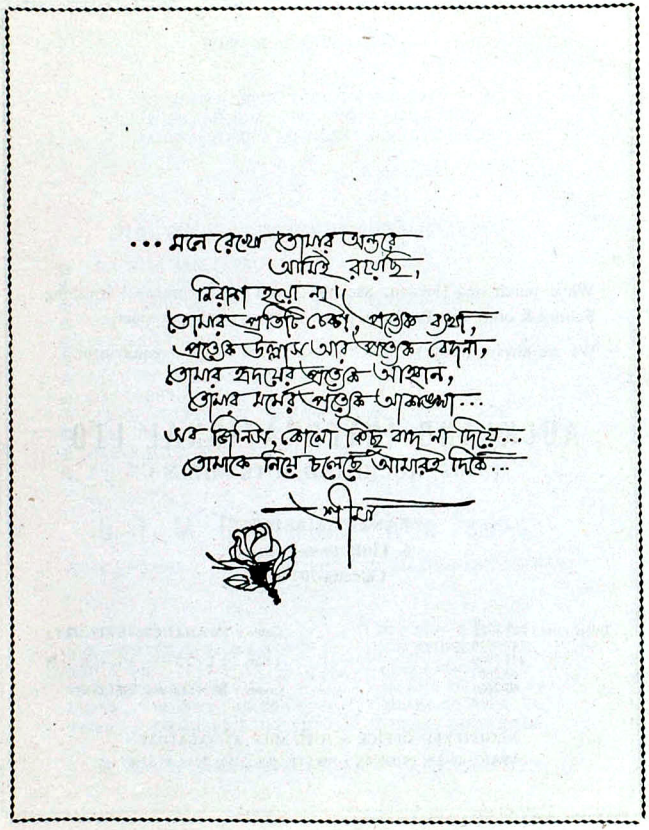

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মনের প্রত্যেক আকাঙ্খা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

শ্রীমা

বর্ষ ৫৫ সংখ্যা ৩
মাঘ ১৪০১.

ঔপনিবেশিক পূর্বভারতে হিন্দু-আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিনয় চৌধুরী ১৫৯
বাক্‌সংস্কৃতি এবং ভারতীয় সাহিত্য বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য ১৮০
সংস্কৃতির অবক্ষয়, সাম্প্রদায়িকতা ও বাঙালির সম্প্রীতি ভাবনা আহমদ রফিক ১৯০
মুসলমানদের জন্য চাকরিতে সংরক্ষণের প্রশ্ন মনসুর হবিবুল্লাহ্‌ ১৯৬
উত্তরাধুনিকতার অর্থ ও উত্তরাধুনিকতার বিতর্ক সালাহ্‌উদ্দীন আইয়ুব ২০০

কবিতা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর তিনটি কবিতা ১৭২
মুকুটের ব্যাসকূট সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ১৭৩
মিলির সঙ্গে কথাবার্তা/৪ বিজয়া মুখোপাধ্যায় ১৭৪
এখন তোমার থেকে আশিস সান্যাল ১৭৫
শান্তিকুমার ঘোষের দুটি কবিতা ১৭৬
অজাতক অমলেন্দু ভট্টাচার্য ১৭৭
টক্কর রূপা দাশগুপ্ত ১৭৮
নিঃসঙ্গ নির্মাণ সুকুমার চৌধুরী ১৭৯

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

গল্প

পাপের অভিজ্ঞান মীনাক্ষী ঘোষ ১৮৪

গ্রন্থ সমালোচনা

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় ২০৫ নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ২০৭ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ২০৯ নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ২১১ আবদুর রউফ ২১৬

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি

মহাদেব সাহার কবিতা সুজিৎ ঘোষ ২২০

শিল্পকলা

শিল্পী শাহাবুদ্দিনের সৃষ্টি-ভুবন সত্যজিৎ চৌধুরী ২২৮

মতামত

'ধর্ম ও রাজনীতি' ২৩০ 'লেখা ও তার লেখক' ২৩৩

প্রতিবেদন

পুরস্কৃত উপন্যাস 'অলীক মানুষ' আবদুর রউফ ২৩৫

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক গুপ্ত প্রেস, কলি-৯ থেকে মুদ্রিত
এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলি-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত

অফিস ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলি-১৩ দূরভাষ ২৭ ৬৩২৭
শিল্প পরিকল্পনা রণেন আয়ন দত্ত নির্বাহী সম্পাদক আবদুর রউফ

আমাদের প্রকাশিত কিছু উল্লেখযোগ্য বই-

Das Gupta, R- **Labour and Working Class in Eastern India : Studies in Colonial History**	Rs.450.00
Chattopadhyay, A- **Bhupendronath Datta and his study of Indian Society**	Rs. 155.00
Mukherjee, S- **Indian Administration of Lord William Bentinck**	Rs. 140.00
Chattopadhyay, KP- **Essays in Social Anthropology**	Rs. 450.00
Bhattachoryya, HM- **Jaina Logic and Epistemology**	Rs. 325.00
Basu, N- **The Working Class Movement: A study of Jute Mills of Bengal- 1937-47**	Rs. 225.00
Nakazato, N- **Agrarian System in Eastern Bengal c.1870-1910**	Rs. 300.00
Perera, ES- **The Origin and Development of Dhrupad and its Bearing on Instrumental Music**	Rs. 300.00
Chakrabarti, B- **A Comparative Study of Santal and Bengali**	Rs. 300.00
Bodding, PO- **Traditions and Institutions of the Santals**	Rs. 400.00
Bhattacharya, P- **Britain in the European Community : Implications for Domestic politics and Foreign Relations**	Rs.250.00

সচ্চিদানন্দ দত্ত রায়- পশ্চিমবঙ্গবাসী (পরিসংখ্যান ভিত্তিক আর্থসামাজিক চিত্র)	১৫০.০০ টাকা
সুবীরা জায়সবাল- **বৈষ্ণবধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : খৃষ্টপূর্ব ২০০ অব্দ থেকে ৫০০ খৃষ্টাব্দ**	৮০.০০ টাকা
সুমিত সরকার- **আধুনিক ভারত : ১৮৮৬-১৯৪৭**	১০০.০০ টাকা
বিপান চন্দ্র- **আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ**	৮৫.০০ টাকা
গীতা মুখোপাধ্যায়- **বিবর্তনের আলোকে শতক্রতু**	৫০.০০ টাকা
রামশরণ শর্মা- **প্রাচীন ভারতে শূদ্র : আনুমানিক ৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নিম্নবর্গের সামাজিক ইতিহাস**	৯০.০০ টাকা
দিলীপ সাহা- **বাংলা সাম্যবাদী কবিতার দুইদশক (১৯২৭-৪৭)**	৫০.০০ টাকা
সুভাষ ভট্টাচার্য- **বিশ্ব-ইতিহাস অভিধান : ১৭৮৯-১৯৫০**	৮০.০০ টাকা
অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় (সম্পা:) - **মধ্যযুগের বাংলার সমাজ সংস্কৃতি**	৮০.০০ টাকা
ইরফান হবিব (সম্পা:) - **মধ্যকালীন ভারত, ২খণ্ড সেট**	১৩০.০০ টাকা
গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পা:) - **সংহতি লাঙ্গল গণবাণী**	৭০.০০ টাকা

K.P. BAGCHI & COMPANY
286 B.B. Ganguli Street, Calcutta- 700 012.

ঔপনিবেশিক পূর্বভারতে হিন্দু-আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক

বিনয় চৌধুরী

হিন্দু-আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্কের যে দিক নিয়ে আমাদের এ আলোচনা তা হল, ঔপনিবেশিক আমলে আদিবাসী সমাজের উপর হিন্দু-প্রভাবের চরিত্র। এ প্রসংগে নানা ধারণা গড়ে উঠেছে। বর্তমান নিবন্ধে আমরা তাদের কয়েকটার বিচার করার চেষ্টা করব।

॥ ১ ॥

আমাদের নিবন্ধের বিষয়বস্তুর এ প্রাথমিক উপস্থাপনা থেকে ধারণা হতে পারে আদিবাসী ও হিন্দু-সংস্কৃতির উপাদান সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। আমরা পরে দেখব, এ ধারণা ভ্রান্ত। কিন্তু তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য তো ছিলই। বিশ্লেষণের প্রয়োজনে আমরা তাই এ ভিন্নতাকে স্বীকার করে নেব।

আসলে হিন্দু ও আদিবাসী সংস্কৃতির মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সম্পর্কে একটি ধারণা বহুদিন টিকে ছিল।এমন কি পেশাদার নৃতত্ত্ববিদদের মধ্যেও। সুরজিৎ সিংহের স্বীকারোক্তিকে একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে নেওয়া যায়। উনিশশো পঞ্চাশের দশকে নানা সময়ে তিনি সিংভূমের (পরবর্তী পুরুলিয়ার) ভূমিজদের সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করেন। অনুসন্ধানের কাজ শুরু হবার আগে তাঁর ধারণা ছিল, ভূমিজ-সংস্কৃতির ধারা বৃহত্তর হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মূলধারা থেকে আলাদা; ভূমিজ সমাজ যেন প্রাক্-'সভ্যতা' পর্বের অংশ[১]। গবেষণার কাজ কিছু এগুলে তিনি বুঝতে পারেন, তাঁর প্রাগমিক ধারণা কত ভ্রান্ত। তাঁর নূতন ধারণা ক্রমেই দৃঢ় হতে থাকে যে, এই দুই সংস্কৃতির মধ্যে সংযোগ বহুদিনের; এর এলাকাও বিস্তীর্ণ। যেখানে ব্যবধান স্পষ্টভাবে দেখা গেছে, তার কারণ এ নয় যে এ সংযোগ আদৌ ছিল না; এর কারণ, এককালের প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক ভেঙ্গে গেছে বা শিথিল হয়েছে। এটা এ দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ ও সংঘাতের পরিণাম। এ সংঘর্ষে ভূমিজদের হার হয়েছে। এর একটা প্রধান কারণ, কৃষি-উৎপাদনের কলা-কৌশলে হিন্দুরা অনেক বেশি নিপুণ। পরাজিত ভূমিজরা তাই হিন্দু-প্রভাব বহির্ভূত কোনও দূর এলাকায় সরে গেল। দীর্ঘদিনের চেষ্টায় উৎপাদন-শক্তির উপর যতটুকু নিয়ন্ত্রণ তারা আয়ত্ত করতে পেরেছিল, তার অনেকটা বিফলে গেল। আবার নূতনভাবে তাদের অর্থনীতি ও সমাজ গড়ে তুলতে হল[২]।

সুরজিৎ সিং-এর মূল সিদ্ধান্ত—আদিবাসী জগৎ, প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে, বহুদিন ধরে 'হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য' সংস্কৃতির সংগে সংযোগে নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

॥ ২ ॥

কিন্তু সংযোগ থাকলেও বিভিন্ন ঐতিহাসিক মুহূর্তে বা বিশিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এর রূপ পরিবর্তিত হতে পারে। হিন্দু সংস্কৃতির বিশেষ কোন কোন দিক গ্রহণ (বা বর্জন) করার মানসিকতাও পাল্টাতে পারে। আদিবাসী সংস্কৃতির উপর 'হিন্দু' প্রভাবের চরিত্র সম্পর্কিত কোন কোন ধারণার বিচার প্রসংগে আমরা এ প্রেক্ষাপটের কথা বিশেষভাবে মনে রাখব।

'সংস্কৃতি' শব্দটাকে এর ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করেছি—যেমন সামাজিক জীবন-চর্যা, ধর্ম-কর্ম, ধ্যান-ধারণা, মনন। কৃষি এবং নানা উৎপাদনের কলা-কৌশল, এবং এর সংগে সম্পৃক্ত সমাজ-সংগঠন অবশ্যই এর অংশ। তবে এ দিকটার উপর আমরা বিশেষ নজর দিইনি। কারণ, আমাদের সময়কালের মধ্যে হিন্দু-আদিবাসী সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ দিক থেকে বিশেষ কোন পরিবর্তন আসেনি। কিন্তু যেখানে আদিবাসী গ্রামে বাইরের নানা গোষ্ঠীর (যাদের মধ্যে কেউ কেউ হিন্দু) ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা ও প্রভুত্ব ওখানকার অর্থনীতিতে জটিলতা সৃষ্টি করেছে, আমরা তার তাৎপর্য বোঝতে চেষ্টা করেছি।

গোটা পূর্ব ভারতকে আমরা আলোচনায় আনিনি, বাংলা ও বিহারেই তা সীমাবদ্ধ। এর একটা কারণ, এ দুই প্রদেশে, আদিবাসী জগতের উপর একটা প্রধান প্রভাব চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-সৃষ্ট নূতন ভূমিব্যবস্থা। এ অঞ্চলেরও কয়েকটা মাত্র গোষ্ঠীকে আমরা বেছে নিয়েছি—যেমন, সাঁওতাল, ভূমিজ, মুণ্ডা, ওরাঁও এবং হো। রাজমহলের পাহাড়িয়া, উড়িষ্যার জুয়াঙ এবং আরও কোন কোন সম্প্রদায়ের কথা এসেছে—কিন্তু তুলনা হিসাবে। আদিবাসী সংস্কৃতিতে হিন্দু প্রভাবের যে জটিল প্রক্রিয়া আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়, তা বোঝানোর জন্য আমরা এসব গোষ্ঠীর পরিবর্তমান মানসিকতাকে দৃষ্টান্ত হিসাবে নিয়েছি। এ প্রসংগে আবারও একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য। যেসব এলাকায় আদিবাসীদের দীর্ঘদিনের সমাজ সংগঠন ভেঙ্গে গেছে, গ্রামজীবনের সংগে তাদের সংযোগ বিনষ্ট বা শিথিল হয়েছে, এবং ফলে আদিবাসী হিসাবে তাদের সংহতিবোধ দুর্বল হয়েছে, সেখানে হিন্দু প্রভাব বিস্তারের রকমটাই আলাদা।

আমাদের নির্বাচিত আদিবাসীদের গ্রামীণ সমাজ-সংগঠনের উপরও নানা আঘাত এসেছে; কিন্তু তাদের সংহতিবোধ বিলুপ্ত হয়নি। এ বোধের একটা প্রধান উৎস, তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, এবং ইতিহাস সম্পর্কে সচেতনতা। বহিরাগত শত্রুকুলের বিরুদ্ধে চিরন্তন প্রতিরোধ এ বোধকে সমৃদ্ধ করেছে।

॥ ৩ ॥

হিন্দু আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিষয়ে প্রধানত হিন্দু প্রভাবের কথাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে। বস্তুত, সংগত কারণেই। এই দুই সংস্কৃতির বিনিময়ে এ প্রবণতাটাই বিশিষ্ট ছিল। কোন কোন গবেষক এ বিনিময়ের অন্য একটা দিকের কথাও বলেছেন; অর্থাৎ কীভাবে আদিবাসী ধর্ম-বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান হিন্দু জীবন-চর্যার নানা দিককে প্রভাবিত করেছে।

দুই সংস্কৃতির সংযোগের ফলে এ ধরনের বিনিময় ঘটতেই পারে। কিন্তু আদিবাসী সংস্কৃতির প্রভাবের তাৎপর্য সম্পর্কে একটা ধারণা বিচার-সাপেক্ষ। বলা হয়েছে, গুরুত্বের দিক থেকে হিন্দুপ্রভাব আর আদিবাসী প্রভাবে বিশেষ কোন তারতম্য নেই। কুমার সুরেশ সিং হিন্দু প্রভাবের তুলনায় এ দ্বিতীয় প্রভাবকে 'Countervailing process' বলেছেন।[৩]

এ প্রসংগে আমরা নীহাররঞ্জন রায়[৪] এবং কুমার সুরেশ সিং[৫]-এর গবেষণা উল্লেখ করতে পারি। অবশ্য দুজনেই অনেক আগেকার ঘটনার কথা বলেছেন। রায়ের বিষয়বস্তু 'আদি পর্বের' বাঙালির ইতিহাস। তাঁর মতে: "আজ আমরা যাকে হিন্দু ধর্মকর্ম সাধনা বলিয়া দেখি, বা যাহাকে আর্য-ব্রাহ্মণ্য সাধনা বলিয়া জানি তাহা একদিকে আর্য ও অন্যদিকে প্রাক্-আর্য বা অনার্য ধর্মকর্মসাধনার সমন্বিত রূপ"। এ সমন্বয়ের সূচনা হয়েছে বেশ কয়েক শতাব্দী আগে। "বাংলাদেশে মোটামুটি খ্রীষ্টোত্তর পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে আর্যধর্মের প্রবাহ প্রবলতর হওয়ার সময় হইতেই সদ্যোক্ত সমন্বয় ক্রিয়া চলিতে আরম্ভ করে; মধ্যযুগে এ সমন্বয় সাধনা সামাজিক চেতনার অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং আজও তা চলিতেছে লোকচক্ষুর অগোচরে"।[৬]

আগেকার ঘটনা হলেও হিন্দু আচার ও ধ্যান-ধারণায় আদিবাসী সংস্কৃতির কোন কোন উপাদানের সংমিশ্রণের কথা উল্লেখ করছি, প্রধানত একটা কারণে। আমরা বলার চেষ্টা করছি, হিন্দু-আদিবাসী সাংস্কৃতিক বিনিময়ের তাৎপর্য এ দুই সমাজের পক্ষে সমান নয়; বিনিময়ের এলাকাও সমান ব্যাপক নয়।

আসলে কিন্তু আদিবাসী সংস্কৃতির প্রভাবের বিস্তীর্ণতা ও গভীরতার কথা অধ্যাপক রায়ই বিশেষভাবে বলেছেন।[৭] তিনি প্রধানত লোক-সংস্কৃতির (Folk culture, popular culture) ক্ষেত্রেই এ প্রভাবের কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন, তথাকথিত 'হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য' সংস্কৃতি আর এ সুবিশাল লৌকিক বিশ্বাসের জগৎ বহুক্ষেত্রে আলাদা।[৮] তিনি হিন্দু-জনসাধারণের অনেক বিশ্বাস ও আচারের কথা বলেছেন, যাদের উৎস কোন ব্রাহ্মণ্য বিধান বা অনুশাসন নয়। তাঁর দেওয়া দৃষ্টান্তগুলির কয়েকটা মাত্র উল্লেখ করছি। যেমন 'গ্রাম-দেবতা'র পূজা। এ পূজা কখনও 'গ্রামের ভিতরে বা লোকালয়ে' অনুষ্ঠিত হত না; তার জন্য 'সর্বত্রই গ্রামের বাহিরে, জনপদসীমার বাহিরে 'থান' বা 'স্থান' বলিয়া একটা জায়গা নির্দিষ্ট থাকে'। অধ্যাপক রায় নিঃসংশয় যে, যে নামেই গ্রাম-দেবতার পরিচয় হোক না কেন, 'সর্বত্রই তিনি প্রাক-আর্য আদিম গ্রাম-গোষ্ঠীর ভয়-ভক্তির দেবতা।...ব্রাহ্মণ্য বিধানে গ্রাম্য দেবতার পূজা নিষিদ্ধ; মনু তো বারবার এসব দেবতার পূজারীদের পতিত্ই বলিয়াছেন'। গ্রামীণ কৃষিকাজের সংগে সম্পৃক্ত নানা যৌথ আচার অনুষ্ঠানও ছিল, যেখানে 'সাধারণ কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের' ভূমিকা ছিল না। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেও রায় আদিবাসীদের কাছে হিন্দু সমাজের ঋণের কথা বলেছেন। 'বস্তুত, বাঙ্গালীর ধর্মকর্মের গোড়াকার ইতিহাস হইতেছে, রাঢ়-পুণ্ড্র-বঙ্গ প্রভৃতি জনপদগুলির অসংখ্য জন ও কোমের, এক কথায় বাঙ্গলার আদিবাসিদেরই পূজা, আচার, অনুষ্ঠান, ভয়, বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতির ইতিহাস....এ তথ্য সর্বজনস্বীকৃত যে, আর্য-ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ধর্মকর্ম, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সংক্রান্ত বিশ্বাস, সংস্কার ও আচারানুষ্ঠান, নানা দেবদেবীর রূপ ও কল্পনা, আহার-বিহারের ছোঁয়াছুঁয়ি আমরা অনেক কিছুই সেই আদিবাসীদের নিকট হইতে আত্মসাৎ করিয়াছি'।

অধ্যাপক রায়ের আলোচনা থেকে হিন্দু-আদিবাসী সাংস্কৃতিক বিনিময়ে দুটি প্রবণতার আভাস মেলে: কোথাও কোথাও হিন্দু-সমাজের উপর আদিবাসী সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট; অন্যদিকে এ দুটি সংস্কৃতির সমান্তরাল অবস্থান, যার প্রধান কারণ, আদিবাসী এলাকায় হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য বিধান নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

কুমার সুরেশ সিং-এর আলোচনা একটু ভিন্ন ধরনের। প্রথমত, তিনি বলছেন, বহিরাগত সব হিন্দুগোষ্ঠীর উপর আদিবাসী সংস্কৃতির প্রভাব সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। উচ্চবর্ণ বা উচ্চবর্গের ক্ষেত্রে এ প্রভাব মোটেই ছিল না; থাকলেও নগণ্য। কিন্তু নিম্নবর্ণ বা নিম্নবর্গের হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর এ প্রভাব গভীর এবং ব্যাপক। এ প্রসংগে তিনি দুটি গোষ্ঠীর কথা বলেছেন: জমির সন্ধানে আসা চাষী, আর কামার, কুমোর, ছুঁতোর, তাঁতী ইত্যাদি নানা বৃত্তিজীবী। সিং মনে করেন, আদিবাসী এলাকায় আসার আগেও এদের ধর্মবিশ্বাস, নৈতিক ধারণা ও আচার অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব খুবই সীমিত ছিল। এদের কেউ কেউ গাছ, পাথর, পাহাড়, ফল, ফুল,

পশুপাখী ইত্যাদির উপর দেবত্ব আরোপ করত (Animistic belief)। আদিবাসীদের ধর্মবিশ্বাসের সংগে এর বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। আদিবাসী জীবন-চর্যার নানা দিক্ গ্রহণ করা তাই তাদের পক্ষে সহজ এবং স্বাভাবিক ছিল। তা ছাড়া আদিবাসী সমাজের সংগে তারা এত নিবিড়ভাবে মিলে গিয়েছিল বলে এ গ্রহণে কোন বিঘ্নই ঘটেনি।

আদিবাসী প্রভাবের অন্য কয়েকটা দৃষ্টান্তও একটু বিশেষ ধরনের। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের আমলাদের নানা প্রতিবেদনে এদের উল্লেখ আছে।[৯] যেমন, হিন্দুদের উৎপীড়নে আদিবাসীরা গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেও, গ্রামের পূজারী-পুরোহিত (পাহান) এবং আদিবাসী রীতি-অনুসারী কুশলী চিকিৎসক ('medicine--men ') বহু ক্ষেত্রে থেকে গিয়েছিল। হিন্দুরাও চায়নি যে, তারা গ্রাম ছেড়ে যাক। হিন্দুরা তাদের বিশেষ সামাজিক মর্যাদাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। শুধু তাই নয়। অন্যান্য আদিবাসীরা চলে গেলেও গ্রামদেবতা এবং অন্যান্য দেবদেবীর পূজা বহুদিন বন্ধ হয়নি। তা চলতে থাকে পুরনো রীতিতে। আর আদিবাসী পাহানদের ভূমিকা এখানে অপরিহার্য ছিল। তাছাড়া মুণ্ডা-রাষ্ট্রের নানা মঙ্গলানুষ্ঠান মুণ্ডাগ্রামের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি ছাড়া সিদ্ধ বলে গণ্য হত না। হিন্দুধর্মান্তরিত মুণ্ডারাজপরিবার এভাবে মুণ্ডাসমাজের সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতা ও ঐতিহ্যকে মেনে নেয়।

আদিবাসীপ্রভাবের এসব নানা দৃষ্টান্ত থেকে, এ সিদ্ধান্ত কি যথার্থ হবে যে, এদের ফল 'ট্রাইব্যালাইজেশন' (Tribalization)? সুরেশ সিং-এর এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি নিজেই বলেছেন, কোন কোন হিন্দুগোষ্ঠীর (যেমন ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের লোক) উপর এ প্রভাব প্রায় পড়েইনি। গ্রামের ধর্মানুষ্ঠানে পাহানদের ভূমিকা সম্ভবত সেখানেই টিকে ছিল, যেখানে ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন নানা কারণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠতে পারেনি, বা এ অনুশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ঠিকমতো গড়ে উঠতে পারেনি। মুণ্ডারাষ্ট্রের কোন কোন মঙ্গলানুষ্ঠানে বিশেষ কোন কোন মুণ্ডার যোগদান অনেক প্রাচীন প্রথা। এ প্রথা যে উনবিংশ বিংশ শতাব্দীতেও কোন কোন জায়গায় মানা হত, তার এক ধরনের প্রতীকী তাৎপর্য হয়ত ছিল। কিন্তু মুণ্ডারাজতন্ত্রের পক্ষে এর বিশেষ মূল্য ছিল। এ যোগদান যেন মুণ্ডাগ্রামের পক্ষ থেকে মুণ্ডারাজের বৈধতার স্বীকৃতি।

বস্তুত, আদিবাসী জীবনে যে হিন্দুপ্রভাবের কথা আমরা পরে বলব, তার তুলনায় এসব দৃষ্টান্ত থেকে অনুমেয় আদিবাসী সংস্কৃতির প্রভাব অনেক সীমিত। এর প্রধান কারণ, বর্ণাশ্রমের কাঠামোর মধ্যে গড়ে ওঠা হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণ উচ্চবর্গ গোষ্ঠী সচেতনভাবে কোম-জনগোষ্ঠী থেকে বহুক্ষেত্রে নিজেদের দূরে রাখতে চেষ্টা করেছে। এর অনিবার্য ফল, কোথাও কোথাও কোমেরা হিন্দুসমাজের অংশ বলে গণ্য হলেও তাদের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল সমাজের একেবারে নীচু তলায়। প্রাচীন বাংলার ব্রাহ্মণেতর বর্ণবিভাগের যে আলোচনা নীহাররঞ্জন রায় করেছেন, তা থেকে আমরা জানতে পারি, এরা আসলে ছিল বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত; 'অন্ত্যজ', 'ম্লেচ্ছ', অস্পৃশ্য।[১০]

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও আদিবাসী সম্পর্কে উচ্চবর্ণের হিন্দুগোষ্ঠীর মনোভাবে কোনও পরিবর্তন আসেনি। ঐ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভাগলপুরে গ্রাম-পরিক্রমার সময় বুকানন হ্যামিলটন এ মনোভাবের কথা জানতে পারেন। সেখানকার এ আদিবাসীরা ছিল সাম্প্রতিককালে অন্য জায়গা থেকে চলে আসা সাঁওতাল। গ্রামের যে-অংশে বর্ণহিন্দুদের বাস, সেখানে সাঁওতালদের বাড়িঘর বানানোর কোন অধিকার ছিল না। তারা থাকত গ্রামের নির্দিষ্ট সীমার বাইরে। হিন্দুদের গরুর দুধ দোয়া এদের পক্ষে ছিল নিষিদ্ধ; মনে করা হত, তাদের 'অশুচিতায়' গরু বা দুধের পবিত্রতা নষ্ট হবে। এর কোন ব্যত্যয় ঘটলে সারা গ্রাম এ 'অনাচারের' প্রতিবাদ জানাত।[১১]

ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও তথাকথিত ট্রাইব্যালাইজেশনের ভিত্তি ছিল অগভীর। যেমন উত্তরপ্রদেশে এবং মধ্যপ্রদেশে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের লোকেরা তাদের শাস্ত্রীয় বিধানসম্মত জীবন-যাত্রার রীতি বর্জন করেছে, এবং আদিবাসীদের আচার ও রীতি গ্রহণ করেছে। এটা ঘটেছে একটা বিশেষ ক্ষেত্রে। তারা আদিবাসী অঞ্চলে দীর্ঘদিন বাস করেনি; অতি স্বল্প সময়ের জন্য সেখানে তারা ছিল। তাদের আদি সমাজের অনুশাসন থেকে সাময়িক বিচ্যুতি গুরুত্বপূর্ণ কোনও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের দ্যোতক নয়।[১২]

॥ ৪ ॥

হিন্দু-প্রভাবের প্রসার (Hinduization) হিন্দু-আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ঔপনিবেশিক যুগে তো বটেই। সমসাময়িক বর্ণনায় এবং বিশ্লেষণে 'হিন্দু-প্রভাবে'র সুনির্দিষ্ট কোনও সংজ্ঞা নেই। নানা অর্থে এ শব্দ-সমষ্টিকে ব্যবহার করা হয়েছে। যেসব ঐতিহাসিক ঘটনা হিন্দু-প্রভাবের প্রমাণ এবং লক্ষণ হিসাবে ধরা হয়েছে, তার আলোচনায় আবার আমরা এ প্রসংগে ফিরে আসব। এখানে এটুকু বলা যথেষ্ট হবে যে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের আমলা এবং নৃতত্ত্ববিদ্দের বর্ণনায় দুটো প্রবণতা দেখা যায়। গোড়ার দিকে একটা ধারণা ছিল, আদিবাসীরা শুধুমাত্র হিন্দুদের কোনও কোনও ধর্মবিশ্বাস, নৈতিক ধারণা, আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণ করছে। তবে প্রায় সবক্ষেত্রেই আরও দুটি দিকের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন এ গ্রহণ শুধুমাত্র বিক্ষিপ্ত কয়েকটি পরিবারের ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফল নয়, এটা যৌথ প্রয়াস। দ্বিতীয়ত, এ প্রয়াসের প্রেক্ষাপট হিসাবে আদিবাসীদের নূতন এক 'রাজনৈতিক' চেতনার কথা বলা হয়েছে। তবে হিন্দু-প্রভাব এবং এ দুটি দিকের কার্য-কারণগত যোগ কোথায়, তা পরিষ্কারভাবে বলা হয়নি।

'হিন্দু প্রভাব' বলতে পরে আঁরও ব্যাপক পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। যেমন নানাভাবে আদিবাসীরা বর্ণাশ্রম ও জাতিপ্রথার কাঠামোয় গড়ে ওঠা হিন্দুসমাজের অংগে পরিণত হচ্ছে। তবে এ পরিণতির চরিত্র সম্পর্কে নানা মত ছিল।

এ দুটি প্রবণতার কয়েকটা মাত্র দৃষ্টান্ত আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করব। সীমিত অর্থে হিন্দু-প্রভাবের দ্রুত বিস্তার সম্পর্কে প্রথম বিস্তারিত উল্লেখ পাই আমলাদের সাঁওতাল খেরওয়ার আন্দোলনের (১৮৭৪-১৮৮২) বিবরণে। এর থেকে বোঝা যায়, এ প্রভাব বিস্তারের ঘটনা সাম্প্রতিক। এ ঘটনার নানা ব্যাখ্যা থেকে আরও বোঝা যায়, এখানে নানা উপকরণের জটিল সংমিশ্রণ ঘটেছে।

হিন্দু-প্রভাবের চরিত্র সম্পর্কে আমলাদের ধারণার দৃষ্টান্ত হিসাবে তাদের বিবরণের প্রাসংগিক অংশের সংক্ষিপ্তসার আমরা দেব। বিবরণগুলি কালানুক্রমে সাজানো; তাই তাতে কোনও কোনও বিষয়ে পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যাবে।

ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার: (৭ অক্টোবর, ১৮৭৪)[১৩]: সাঁওতাল নেতা ভগীরথের নির্দেশে দক্ষিণ ভাগলপুরের বাউসী নামক জায়গায় এক 'হিন্দু মন্দিরে' বারোশ সাঁওতালের এক জমায়েত হয় (২৪ জুলাই ১৮৭৪)। কিছুদিনের মধ্যে তাঁরই উদ্যোগে তারদিহা নামক জায়গায় আর একটা নূতন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। সেখানে পূজার সব অনুষ্ঠান পুরোপুরি হিন্দু রীতিতে। '(Hindoo Principles)'। তার পুরোহিত (পাণ্ডা) কিন্তু একজন সাঁওতাল। ভগীরথ-অনুগামীদের উপর নির্দেশ ছিল, তারা যেন তাদের সব মোরগ আর শুয়ার মেরে ফেলে। কারণ, এর ফলে তারা 'শুচি' হবে। দলে দলে সাঁওতাল এ মন্দিরে আসতে থাকে। এ নির্দেশ সব সাঁওতাল মানেনি বটে; তবে প্রায় প্রত্যেক গ্রামেরই কেউ কেউ এ শুচিতার আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে এক অনিশ্চিত আশংকাবোধ ('panic') এবং অস্থির উত্তেজনা '(excitement)'। তারদিহা মন্দিরের পাণ্ডা এবং এর সংগে যুক্ত সবাই'র বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হয়েছে।

সাঁওতাল পরগণার সহকারী কমিশনার: (১ অক্টোবর, ১৮৭৪)[১৪] —গোটা উত্তর সাঁওতাল পরগণা জুড়ে মোরগ এবং শুয়োর মারার নূতন অভিযান চলছে। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলেও তা ছড়িয়ে পড়ছে। সাঁওতালদের বিশ্বাস, এটা একান্তই 'ধর্ম' সম্মত কাজ ('religious act')। গোড়ায় তারা এ কাজ প্রকাশ্যে করেছে, সম্পূর্ণ নির্দ্বিধায়। এ বিষয়ে সরকারের ('হাকিম') মনোভাব মোটেই অনুকূল নয় জেনে এ কাজের সমর্থনে নানা ধরনের অজুহাত দেখাতে থাকে। যেমন, খিদের জ্বালায় তারা এসব করছে। সরকারী জেরায়, তারা স্বীকার করে, এ অজুহাত সত্য নয়। তারা এখন বলল, অন্যসব পাড়াপড়শিরা এ কাজ করছে, তাই তারাও করছে।

ভগীরথ মাঝির ব্যাপক প্রভাব সন্দেহাতীত। তারদিহার মন্দিরে সাঁওতালরা বিপুল সংখ্যায় আসছে। ভগীরথকে ঘিরে নানা ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ('ceremonies') হয়েছে। মাতাদিন নামক এক হিন্দু তার কপালে লাল রঙের টীকা ('red mark') পরিয়েছে। ভগীরথের পরিকল্পনা ছিল, সাঁওতালদের মধ্যে যে নূতন এক ধর্ম-আন্দোলন ('religious movement') সৃষ্টি করবে; তার নেতৃত্ব সবাই মেনে নিয়েছে। 'আমার বিশ্বাস, এ মন্দিরে অজস্র লোকের আনাগোনা এবং এ 'শুদ্ধি' ('purification') আন্দোলন, সাঁওতালদের চিন্তা-ভাবনায় এক নূতন প্রবণতার দ্যোতক; তারা চারপাশের হিন্দুদের সংগে মিশে যেতে চাইছে।' ('amalgamate with the Hindoos who surround them')

ভাগলপুর-বিভাগের কমিশনারের ১৮৭৪-৭৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন[১৫]: গোটা ব্যাপারটা ঘটেছে ভগীরথ এবং মাতাদিন নামক এক হিন্দুর মধ্যে যোগসাজসে; মাতাদিন ভগীরথের পুরনো সাকরেদ; বিদ্রোহী সিপাহী ('ex-Mutineer of a cavalry regiment') হিসাবে তার সাজাও হয়েছিল। বাউসীর মন্দিরে ধর্মানুষ্ঠান চলে দু' তিনদিন ধরে; একেবারে অর্থহীন ক্রিয়াকলাপও ('a good deal of absurd monsense') হয়েছে। তালদিয়ার নূতন মন্দিরে মহাদেবের পূজোর জন্য। 'অশুচি' জীবজন্তু মারার জন্য ভগীরথের হুকুমনামা এখান থেকে জারী করা হয়। "সাঁওতালরা এমনিতেই উত্তেজনাপ্রবণ জাত; স্থানীয় প্রশাসনের মতে, আধা-হিন্দু নানা ধারণা গ্রহণ করার জন্য তারা মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত" ('ripe for the acceptance of semi-Hindu ideas')। 'দাবাগ্নির মতো' এ নূতন আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে; শুয়োর ইত্যাদি নিধন-পর্বের পর বিশাল জন-প্রবাহের গতি তালদিয়ার মন্দিরাভিমুখী। ভগীরথের অন্তরঙ্গ অনুগামীদের মধ্যে ধোনা মাঝি ও জ্ঞানমাঝি— এ দুজনের শুদ্ধি আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা ছিল। জ্ঞান মাঝি এমনও বলেছে, ভগীরথের নির্দেশ অনুযায়ী 'শুদ্ধাচারী' না হলে তাদের এক বড় বিপদ আসন্ন: খ্রিস্টান এক পাদ্রী গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে; তাঁর হাতে তারা জাত খোয়াবে। ('a certain padree was coming round who would take their caste')। ভগীরথের নূতন ধর্মের দীক্ষিতদের চেনার একটা সহজ উপায় ছিল; বেলপাতার রস থেকে তৈরি একধরনের প্রলেপ দিয়ে তারা কপালে টীকা পরত। (Bela-tika)

ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার (২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৫):[১৬] সাম্প্রতিককালে অনেকেই বলেছে, কীভাবে হিন্দুধর্ম সাঁওতালদের চিন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে। ('the stronghold which Hinduism is taking of the sonthal mind at the present moment')। এ আন্দোলনে আমরা ব্যাঘাত সৃষ্টি করব না: সাঁওতালদের ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনার প্রকাশে আমরা বাধা দেব না; আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, যাতে এর সংগে 'সন্দেহজনক সব রাজনৈতিক সম্পর্ক'কে ('all the political connection of a doubtful kind') বন্ধ করা যায়।

ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার (৯ মার্চ, ১৮৭৫)[১৭]: ভগীরথ মাঝি একেবারে ভূঁইফোড় নেতা নয়; জমিদার ও রাজ-বিরোধী আন্দোলনে তার ভূমিকা অনেক আগেই প্রশাসনের নজরে এসেছে। ১৮৬৬ সালে তার কারাদণ্ড হয়। ১৮৭৩/৭৪ সালে দুর্ভিক্ষের সময় দুঃস্থ সাঁওতালদের মধ্যে সরকারী অনুদান (বিশেষ করে খাদ্যশস্য) বণ্টনে চরম বিশৃঙ্খলার প্রতিবাদ করে সে আবার জনপ্রিয় হয়। সাম্প্রতিক ধর্ম-আন্দোলনের হিন্দুমুখিতা তার উদ্যোগেরই ফল। এটা তার নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির কৌশলমাত্র। শুয়োর ইত্যাদির প্রতিপালন সাঁওতাল অর্থনীতির একটা বিশিষ্ট দিক; অথচ ভগীরথের আদেশে বিনা দ্বিধায় সাঁওতালরা বিপুল সংখ্যায় 'অশুচি' জীবজন্তু মেরে ফেলেছে; এটা যেন নূতন ধর্ম সম্পর্কে তাদের আন্তরিকতার পরীক্ষা ('test of sincerity')। সরকারী খাস মহল 'দামিন-ই-কো'তেই এ নূতন ধর্ম আন্দোলন সব চাইতে বেশি ছড়ায়। এ সময়েই সাওঁতালরা তাদের 'জাতির আদি নাম' ('an old tribal name') 'খেরওয়ার' কথাটা আবার ব্যবহার করতে শুরু করে। নূতন ধর্মে দীক্ষিত সাঁওতালরা এ নামেই নিজের পরিচয় দিচ্ছে। মহেশপুর অঞ্চলে ভগীরথের এক অনুগামী জ্ঞান মাঝি এক নূতন ধরনের প্রচার শুরু করে। সে বলছে, 'শুদ্ধ' না হলে এক 'পাদ্রী সাহেব' তাদের জাত মারবে; অবশ্য জ্ঞান মাঝির 'পরওয়ানা' থাকলে এটা সম্ভব হবে না। এ ধর্ম-আন্দোলন এত ব্যাপক হয়েছে যে সরকারী হস্তক্ষেপে একে বন্ধ করার চেষ্টা বৃথা। অথচ সাঁওতালদের মত উত্তেজনা-প্রবণ 'জাতি'র মধ্যে নূতন ধর্মের প্রবর্তন ('chage of religion') ব্যাপক অস্থিরতা ('movement') সৃষ্টি করবে।

লেফটেন্যান্ট রিচার্ড টেম্পলের মন্তব্য (৯ মার্চ, ১৮৭৫)[১৮]: 'সাঁওতালরা তাদের আদি ধর্ম ('aboriginal religion') ক্রমেই পরিত্যাগ করছে; এবং হিন্দুধর্ম গ্রহণ করছে।'

সাঁওতাল পরগণার সহ-কমিশনার (১৬ মার্চ, ১৮৮১)[১৯]: সবাই ধরে নিয়েছিল খেরওয়ার আন্দোলন ফুরিয়ে গেছে। এমনকি ১৮৭৯ সালেও, অর্থাৎ এর পুনরুজ্জীবনের আগের বছর। নূতনভাবে এর শুরু ১৮৮০ সালের মাঝামাঝি সময়ে। (জুন) সূচনা সাঁওতাল জগতে অতিপরিচিত এক ধর্মীয় উন্মাদনার ঘটনা দিয়ে। পাঁচজন সাঁওতাল অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় দুমকার মহকুমা শাসকের দপ্তরে আসে। হাতে কয়েকটা কাগজের টুকরো। দুর্বোধ্য লিপিতে লেখা। তারা বলে, এসব আকাশ থেকে পড়েছে; দৈববাণী বলেছে, এগুলো তারা যেন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে যায়। ঐ বছরের শেষে বোঝা গেল, এটা তাদের অর্থহীন বাগাড়ম্বর নয়। খেরওয়ার আন্দোলনের পুরনো মেজাজ আবার ফিরে এসেছে। দেওঘর এবং জামতারা মহকুমায় দেখা গেল, অজস্র বেনামী চিঠি লোকের হাতে হাতে ঘুরছে। তাকে একই কথা লেখা: সব শুয়োর মেরে ফেলতে হবে। উদ্দেশ্য সম্ভবত এটা জানানো যে, তারা 'শুদ্ধ' বা হিন্দু হয়ে গেছে; ('to signalize their having become pure or Hindus'). পালগঞ্জের দুবিয়া গোঁসাই-এর নাম এ সময় থেকে শোনা যায়। বহু সাঁওতাল তার সাক্ষাতের জন্য পালগঞ্জ আসে। জিজ্ঞেস করলে, তারা আসল কথাটা কবুল করে না। হাণ্ডোয়া অঞ্চল থেকে আসা একটা বড় দল বলে, তারা গরু ইত্যাদি 'সওদা'র জন্য পালগঞ্জ যাচ্ছে। বেনামী চিঠির সংখ্যাও বাড়তে থাকে। তাদের ভাষায় হেরফের আছে; তবে তাদের জবান একই রকমের: আসন্ন এক 'বিপর্যয়' ('Calamity') এড়াতে সাঁওতালরা রোজ ভগবানের নাম জপ করবে; পালগঞ্জে গিয়ে গোঁসাই-এর সংগে দেখা করবে; সব মোরগ, শুয়োর মেরে ফেলতে হবে; রবিবার কোন কাজ করবে না। কোনও কোনও জায়গায় চিঠিতে নির্দেশ ছিল, সাদা রঙের ছাগলকে মেরে ফেলতে হবে। চতুর্দিকে অজানিত এক আশংকাবোধ; সাঁওতালদের চোখে-মুখে একান্ত স্বাভাবিক খুশির চিহ্ন নেই; বহু জায়গায় ওরা ওদের অতি প্রিয় দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানও করেনি। আদমসুমারির (১৮৮১) প্রস্তুতি চলছে সর্বত্র; সাঁওতালরা এ কাজে সংঘবদ্ধ হয়ে বাধা দিচ্ছে। পাকুড়ের সহ-কমিশনার ক্যাম্পবেলকে মুখের উপর বলে দিল, তারা খেরওয়ার; আদমসুমারির দায়-দায়িত্ব থেকে তারা মুক্ত; এটা তাদের এক নেতা ভাগরাই মাঝির নির্দেশ; করণিক ('scribe') লাখান পরওয়ানা মারফৎ তা সবাইকে জানাচ্ছে। কোন কোন জায়গায় তারা বলছে, তাদের নাম 'বাবা ভগীরথে'র ('father Bhagirath') খাতায় উঠেছে; নূতন করে আদমশুমারিতে তারা নাম লেখাবে না। কেউ কেউ বলছে, যদি লেখাতেই হয়, তাহলে 'হিন্দু' হিসাবে লেখাবে; সাঁওতাল হিসাবে নয়। অবশ্য এ যুক্তি 'আদি' খেরওয়ারদের ('old Kherwars'); সাঁওতাল পরগণার উত্তরে এবং পূবে তাদের সংখ্যা অনেক। কিন্তু পশ্চিমে নূতন দীক্ষিত খেরওয়াররা একথা বলছে না।

দুমকার মহকুমা শাসক, ডাব্‌লিউ.এম্.স্মিথ ১৮৮১[২০]: দুমকা মহকুমায় ১৮৮১'র আদমশুমারিতে নথীভুক্ত খেরওয়ারের সংখ্যা ৫৯০৬; আর আদি সাঁওতালদের ('old-style Sonthals') সংখ্যা ১২৬, ৫৬২। দামিন-ই-কো'র যে অংশ দুমকা মহকুমায় পড়েছে সেখানে খেরওয়ারদের সংখ্যা অনুপাতে কম। কিন্তু আদি সাঁওতালদের সংগে যোগ তারা রাখে না। বস্তুত তারা স্বীকারই করে না যে, আদতে তারা সাঁওতাল। তাদের সাঁওতাল, বা 'মাঝি' বলা, ডাকা পছন্দ নয়। তারা বলে, 'আমরা খেরওয়ার', 'রামহিন্দু খেরওয়ার'।

রাজমহলের সহকারী কমিশনার, এস.এস.জোনস্

(১৮৮১)[২১] : খেরওয়ার আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য, সাঁওতালরা যাতে ধর্মীয় এবং সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের সংগে মেলামেশা করতে পারে; এর উপায় হিন্দুসমাজের অংগীভূত হওয়া ('to mix in the social and religious scale by admission into Hinduism')। তারা 'কালীমা'র পুজো করে; বৈদ্যনাথ এবং মধুসূদন তাদের তীর্থস্থান; মোরগ, শুয়োর ইত্যাদি তারা মেরে ফেলে; এদের বদলে 'হিন্দু' খেরওয়াররা পোষে পায়রা, ছাগল আর ভেড়া। উত্তেজক সুরা জাতীয় ('intoxicating liquors') পানীয় তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ বর্জনীয়।

ডাব্লিউ. এইচ. রাট্টে (Rattray); দুমকার সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর (১৮৮১)[২২] : খেরওয়ারেরা হিন্দুধর্মানুগামী ('follow the footsteps of the Hindu religion')। মোরগ বা শুয়োরের মাংস খাবে না; বস্তুত, হিন্দুরা যা খাবে না, তারাও তা খাবে না। পুরাতন পন্থী সাঁওতালদের সংগে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক নেই; তাদের পূজানুষ্ঠানের রীতি হিন্দুদের মতোই।

ডাব্লিউ.এম্.স্মিথ, দুমকার মহকুমা শাসক (১৮৮১)[২৩] : খেরওয়ারেরা নিজেদের বিশিষ্ট সম্প্রদায় ('peculiar people') বলে ভাবে। আমার সংগে যাদের সাক্ষাৎ ঘটেছে। তাদের অনেকেই বাউসীর গোঁসাই মঙ্গলদাসের দেওয়া কাগজপত্তর সংগে রাখে। মঙ্গলদাসের 'চেলা' বলেই, এ কাগজে তাদের পরিচয় লেখা আছে।

ক্যাপ্টেন কারনাক (Carnac), সহকারী কমিশনার (১৮৮১)[২৪] : খেরওয়ারেরা নিজেদের সম্পূর্ণ আলাদা ('Exclusive') ভাবে; নূতন ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যা হয়, এখানেও তাই হয়েছে। পুরনো ধর্মের প্রতি তাদের প্রবল বিতৃষ্ণা ('intense hatred')। বিশেষ করে আদি সাঁওতালদের সংগে তারা সম্পর্ক রাখতে চায় না। হিন্দুদের সহ্য হয়ত করে; কিন্তু সাঁওতালদের সম্পর্কে তারা অত্যন্ত অসহিষ্ণু। 'আমি একজন খেরওয়ারের কথা জানি, যে আচমকা রাগের বশে এক 'অশুদ্ধ' সাঁওতাল পরিবারের তিন চারটি মোরগ মেরে ফেলে। তাদের বলে, নূতন ধর্ম গ্রহণ না করলে তাদের পক্ষে ফল খারাপ হবে।' আচার আচরণে কিন্তু খেরওয়ারেরা অন্য সাঁওতালদের চেয়ে অনেক উন্নত। ধর্মানুষ্ঠান ইত্যাদি ব্যাপারে তারা অনেক মনোযোগী এবং নিয়মনিষ্ঠ; কোনও রকম মাংস বা উত্তেজক পানীয় তারা খায় না; বিশেষ করে সাঁওতালদের 'সর্বনাশের মূল' ('bane of the Santals') হাঁড়িয়া তারা ছোঁয় না। সাধারণভাবে তারা বেশি বুদ্ধিমান। তাদের বেশ কয়েকজন গুরু এবং গোঁসাই আছে; বেশির ভাগ হিন্দু। তাদের অতি শ্রদ্ধাভাজন এক গোঁসাই হল বাউসীর মঙ্গল দাস। অন্যান্য গুরুদের মধ্যে আছে ঠাকুর গোঁসাই, চন্দ্র সাধু এবং সালকোন সাধু; সবাই অত্যন্ত নীচু জাতের হিন্দু ('miserable low caste Hindus')। বাউসীর বিখ্যাত মেলায় তারা যায়; সেখানে মঙ্গল দাসের সংগে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে; উদ্দেশ্য হিন্দু-ধর্মের সংগে তাদের আত্মিক যোগের কথা বোঝানো ('simply to declare their affinity with Hinduism')।**

খেরওয়ার আন্দোলনের যুগে সাঁওতাল গোষ্ঠীর উপর হিন্দু-প্রভাবের চরিত্র সম্পর্কে সরকারী আমলাদের দেওয়া তথ্যের সারাংশ আমরা উপরে দিয়েছি। বহুক্ষেত্রে এ তথ্য স্থানীয় বেসরকারী নানা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের থেকে পাওয়া। ভাগলপুর ডিভিশনের কমিশনার এ সম্পর্কে জানতে চেয়ে তাদের কাছে কয়েকটা প্রশ্ন পাঠায়।[২৫] বেশ কয়েকটা সরকারি প্রতিবেদন একের উত্তরের উপর ভিত্তি করে লেখা বলে মনে হয়। নিচে দেওয়া এরকম কয়েকটা উত্তরের সারাংশ থেকে তা বোঝা যাবে। উত্তরগুলি সব ১৮৮১ সালে লেখা, যখন খেরওয়ার আন্দোলনের ব্যাপ্তি ছিল সবচাইতে বেশি।

মহেশপুরের জমিদার মহারাজা গোপালচন্দ্র সিং[২৬] : 'খেরওয়ার' সাঁওতালদের পূর্বপুরুষদের নাম। খেরওয়ারদের আচরণ অনেকটা হিন্দু ব্রাহ্মণদের মতো। মুরগী, শুয়োর ইত্যাদি পোষা তারা ছেড়ে দিয়েছে।

পাকুরের জমিদার ভরাসনাথ পাণ্ডে[২৭] : সমাজ এবং ধর্মের সংস্কারের জন্যই এ আন্দোলন; উদ্দেশ্য হিন্দুদের মতো বৈষয়িক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ। এ জন্যই তারা কোনও কোনও 'হিন্দু বাবাজী'র সাহায্য চায়; এসব বাবাজীরা মাঝে মধ্যে সাঁওতাল অঞ্চল পরিক্রমা করে; এদের থেকেই সাঁওতালরা হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্র সম্পর্কে কিছু কিছু শেখে; অন্যদেরও তা বোঝাতে চায়। এভাবেই সংস্কার আন্দোলনের সূচনা ('proclaimed a reformation')। তারা বলে, তারা হিন্দু; তারা 'পবিত্র পৈতে' পরে; গলায় পরে রুদ্রাক্ষের মালা ('wearing sacred beads about their necks')। সব ধরনের মাংস আগে তারা খেত; এখন সব বাদ দিয়েছে; বলে এসব 'অপবিত্র জিনিষ' ('unclean things')। তাদের পোষাক-পরিচ্ছদেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। আগেকার মতো খাটো লেঙ্গটি তারা আর পরে না; তার বদলে পরে হিন্দুদের মতো ধুতি। মদের নেশায় মাতলামি এখন বন্ধ; নৈতিক জীবন অনেক বেশী নিয়ন্ত্রিত। সূর্য, দুর্গা, কালী এবং অন্যান্য আরও হিন্দু দেবদেবীর পুজোর প্রচলন হয়েছে। তাদের গুরুকে তারা হিন্দুদের ভাষা নকল করে 'বাবাজী' বলে। সর্বত্র তার সম্মান। খেরওয়ারদের মধ্যে ধর্মের বাঁধন দৃঢ়, সব সামাজিক ও ধর্মানুষ্ঠানে তারা অন্য সাঁওতালদের এড়িয়ে চলে।

জমিদার রামকানাই কারফোরমা[২৮] : বৈষ্ণবগুরু মঙ্গলদাস থেকে মন্ত্রদীক্ষার জন্য সাঁওতালরা বাউসীতে জমায়েত হয়;

এভাবে অনেকেই হিন্দু হয়ে যায় ('turned Hindus')। বৈষ্ণবদের মতো তারা রাম ও কৃষ্ণের পুজো করে।

এফ্.এফ.কোল, রাজমহলের খ্রিস্টান মিশনারী[২৯] : খেরওয়ার আন্দোলনের মূল সুর রাজনৈতিক; ধর্ম একটা ছদ্মবেশ মাত্র। কোনও কোনও দিকে খেরওয়ারদের বিশিষ্টতা আছে। কারোর ঘরে মোরগ বা শুয়োর নেই। হিন্দুদের মতো মাথায় চুলের গোছা রাখে। কেউ কেউ পৈতা পরে। রোজ স্নানও করে।

কর্নেলিয়স, জামতারার খ্রিস্টান মিশনারী[৩০] : 'ভূতপূজা' ('demon worship') এবং পিতৃপুরুষের জন্যে তর্পণাদি অনুষ্ঠানে ('ancestor worship') মোরগ-বলি সাঁওতালদের দীর্ঘদিনের প্রথা। অথচ খেরওয়ারেরা সব মোরগ মেরে ফেলছে। পুজোতে ঘি, দুধ ও চালের ব্যবহার নূতন একটা রীতি। কেউ কেউ পৈতা পরে। হিন্দু যোগীর মত চুল বাঁধে, এবং গাঁজা খায়। হালচাষের জন্য গরু দিয়ে হাল টানে না। মাটির হাড়ি-কলসী ভেঙ্গে ফেলে; এজন্যই তো তাদের নাম 'সাফাহোর', অর্থাৎ 'পরিচ্ছন্ন', 'শুদ্ধ' মানুষ।

(৪.১)

সাঁওতাল আন্দোলনের এক বিশেষ পর্যায়ে (১৮৭৪-১৮৮২) সাঁওতাল সমাজের উপর হিন্দু-প্রভাবের চরিত্র সম্পর্কে সমসাময়িক ধারণার যে কয়েকটি দিক আমরা দেখেছি, আবার তাদের সংক্ষেপে উল্লেখ করব।

(ক) সাঁওতালদের আদি ধর্ম হিন্দু ধর্মের সংগে মিশে যাচ্ছে—এ ধারণা কারো কারোর ছিল। সবার নয়। কেউ কেউ সাঁওতাল সংস্কার আন্দোলনে হিন্দুমুখিতার কথা বলেছে। আবার অনেকে সুস্পষ্টভাবে বলেছে। সাঁওতাল 'জাতি'র আদিনাম, 'খেরওয়ারে'র প্রচলন তখন থেকেই। 'সাফাহোর' (অনাবিল মানুষ, বিশুদ্ধ মানুষ) কথাটাও নাকি আদৌ নূতন নয়—তাও কেউ কেউ বলেছে।

(খ) হিন্দু প্রভাব আগে যে ছিল না, তা নয়; তবে এর দ্রুত প্রসার সাম্প্রতিক ঘটনা। এ প্রসার এক জটিল প্রক্রিয়াও। এ জটিলতার একটা বিশিষ্ট দিক এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। অনেকেই বলেছে, সাঁওতালদের নূতন 'রাজনৈতিক' চেতনা থেকে এ প্রক্রিয়াকে আলাদা করা যায় না। (এ বিষয়ে আমরা পরে বিশদ আলোচনা করব)।

(গ) সাম্প্রতিক হিন্দু-প্রভাবের অভিনবত্ব শুধুমাত্র তার বিস্তারের গতিতে নয়। কোনও কোনও হিন্দু ধারণা, বিশ্বাস, রীতি, এবং আচার সাঁওতালদের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যময় ছিল। কারণ এগুলি সাঁওতাল সমাজের আমূল পুনর্বিন্যাসের জন্য নূতন পরিকল্পনার ভিত্তি। এটাকে নূতন এক সামাজিক দর্শন বলা যায়। অথচ এ দর্শন সমানভাবে গ্রহণ করা সব সাঁওতালের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যেমন, মোরগ, শুয়োর ইত্যাদি নিঃশেষে মেরে ফেলার নির্দেশ বহু সাঁওতালের পক্ষে একটা অবাস্তব দাবী বলে মনে হয়েছে, কারণ এদের প্রতিপালন সাঁওতাল অর্থনীতির একটা বিশিষ্ট দিক। তাছাড়া, দীর্ঘদিনের ধর্মবিশ্বাস হঠাৎ সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া অনেকের পক্ষে কঠিন ছিল। তাই দীক্ষিত এবং সক্রিয় খেরওয়ারদের সংখ্যা খুবই সীমিত ছিল। বস্তুত, এ কারণে তারা বৃহত্তর সাঁওতাল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন একটা গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল।

(ঘ) এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, হিন্দুসংস্কৃতির কথা মনে রেখেই (reference point) সাঁওতালরা নিজের "সমাজ ও সংস্কৃতির ত্রুটি, অপূর্ণতার কথা বলেছে। যেমন শুদ্ধতার (purity) এবং শুদ্ধির (purification) নূতন ধারণা, যার নানা দিক সমসাময়িক বিবরণে বার বার উল্লেখিত হয়েছে, প্রধানত হিন্দু ধারণার আদলে গড়া। ব্রাহ্মণত্বের সূচক উপবীত-ধারণের মানসিকতাও সম্পূর্ণ নূতন। তবে এসব বিবরণে এও বলা হয়েছে যে, কেউ কেউ মাত্র পৈতে পরত। তাছাড়া হিন্দুপ্রভাবের অর্থ মোটেই এ নয় যে সাঁওতালরা তাদের দীর্ঘদিনের সব দেব-দেবীর পূজা পরিত্যাগ করেছে। মহাদেব, মাকালী, দুর্গা ইত্যাদির পাশাপাশি ঠাকুর জিউ, চান্দো (সূর্য বা চন্দ্র), মারাঙ্ বুরু'র উপাসনাও বজায় ছিল। (তবে দুর্গাপূজা সাঁওতাল অঞ্চলে মোটেই নূতন নয়)।

(ঙ) সমাজ ও ধর্মসংস্কারের মূল ধারণাগুলির উৎস হিসাবে 'বৈষ্ণবগুরু'দের সংগে সংযোগের কথা বলা হয়েছে। সরকারি আমলার প্রতিবেদনানুযায়ী, এরা সবাই 'অত্যন্ত নীচু জাতের হিন্দু'। এসব অঞ্চলে বৈষ্ণবগুরুদের আনাগোনা মোটেই নূতন ঘটনা নয়। আসলে বৈষ্ণবদের একটা অংশ সাঁওতাল সম্প্রদায় এভাবে জায়গায় জায়গায় ঘুরে বেড়াত; কোনও নির্দিষ্ট গ্রামে না লোকালয়ে তাদের প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল না। 'গৃহী বৈষ্ণব'দের প্রভাবের ধারা ছিল ভিন্ন[৩১]। সংস্কারের মূল প্রেরণা সাঁওতাল সমাজের মধ্য থেকেই এসেছে; বৈষ্ণবগুরুরা এ নূতন ধারণাগুলির মাধ্যম মাত্র।

(চ) এ জন্যই সাঁওতাল সমাজ বৈষ্ণব প্রচারকদের 'গুরু' বলে ডাকত; কিন্তু বৃহত্তর খেরওয়ার আন্দোলনের নেতৃত্বের ভূমিকায় কখনও তাদের দেখি না। ভগীরথ যে অর্থে নেতা, দুবিয়া গোঁসাই সে অর্থে নয়। নেতারা স্বেচ্ছায় আন্দোলনের সংগে বৈষ্ণবগুরুদের সংযুক্ত করতে চেয়েছিল। যেমন বাউসীর হিন্দু-মন্দিরে ভগীরথের 'অভিষেকে' এক বৈষ্ণবগুরুর প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল।

(৪.২)

আমরা আগে উল্লেখ করেছি, 'হিন্দু'-প্রভাব বলতে আরও ব্যাপক পরিবর্তনের কথাও বলা হয়েছে। যেমন, নানাভাবে

আদিবাসীরা বর্ণাশ্রম ও জাতিপ্রথার কাঠামোয় গড়ে উঠা হিন্দুসমাজে অঙ্গীভূত হয়ে যাচ্ছে। বিশিষ্ট এক সরকারী আমলা রিজলী তার The Tribes and Castes of Bengal (১৮৯১) গ্রন্থে হিন্দুপ্রভাবের সেসব দৃষ্টান্তই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, যেখানে আদিবাসীদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বই প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে।[৩২] ১৯১৫ সালে প্রকাশিত একটা লেখায় তিনি আরও স্পষ্টভাষায় এ কথা বলেছেন: 'বর্তমান সময়ে গোটা ভারতবর্ষে আদিবাসীরা আস্তে আস্তে এবং তাদের অজ্ঞাতসারে 'জাতি'তে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে'।[৩৩] নৃতত্ত্ববিদরা এ পরিবর্তনের প্রবণতা স্বীকার করেছেন। তবে পরিবর্তনের ব্যাপকতা এবং অন্তিম পরিণতি সম্পর্কে ভিন্ন মত আছে। যেমন Ghurye আদিবাসীদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বই অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে "তথা-কথিত" আদিবাসীরা আসলে হিন্দু 'উপজাতি' ('Sub-castes'), 'অনগ্রসর হিন্দু' ('backward Hindus')। অর্থাৎ, তার ধারণায় আদিবাসীরা নিশ্চিতভাবে হিন্দু-জাতিপ্রথার অবিচ্ছেদ্য অংগে পরিণত হয়েছে।[৩৪] নৃতত্ত্ববিদদের মধ্যে অনেকেই এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ মানেন না। তাদের মতে, হিন্দুমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকলেও হিন্দুপ্রভাবের ফলে আদিবাসী সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। নির্মলকুমার বসু মনে করেন এর কারণ, হিন্দুসমাজ এক বিশিষ্ট পদ্ধতিতে আদিবাসীদের স্বাঙ্গীকৃত করে নিয়েছে; তার সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ জোর করে আদিবাসীদের উপর চাপিয়ে দেয়নি।[৩৫] মার্টিন ওরান্স, সুরজিৎ সিংহ এবং আরও কেউ কেউ বলেছেন, দীর্ঘদিনের সংযোগের ফলে আদিবাসীরা হিন্দু সংস্কৃতির অনেক কিছু গ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু নিজেদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন রাখার জন্যও তারা নানাভাবে প্রয়াসী হয়েছে।[৩৬]

॥ ৫ ॥

আদিবাসী সমাজের উপর হিন্দুপ্রভাব সম্পর্কিত আলোচনায় দুটি বিশেষ প্রবণতার কথা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। এ প্রবণতাগুলির বিশ্লেষণ প্রসংগে হিন্দুপ্রভাবের চরিত্র এবং তাৎপর্য সম্পর্কে কয়েকটা ধারণা গড়ে উঠেছে। এ নিবন্ধের পরবর্তী অংশগুলিতে আমরা এ রকম কয়েকটা ধারণার সারবত্তা বিচার করব।

এ ধারণাগুলির তথ্যগত ভিত্তি বিশ্লেষণের আগে আমরা সংক্ষেপে আমাদের বিচারের পদ্ধতি নির্দেশ করব।

দীর্ঘকাল পাশাপাশি থাকার ফলে আদিবাসী সমাজে হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব অস্বাভাবিক কোনও ঘটনা নয়। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয়, এ ঘটনা যেন স্বয়ংক্রিয়, স্বতঃসিদ্ধ এবং অনিবার্য। এ ঘটনার বিশ্লেষণে একটা কথা প্রায়ই অনুল্লেখিত থাকে। তা হল, হিন্দু সংস্কৃতির কোনও কোনও উপাদান গ্রহণে আদিবাসীদের এক সচেতন মানসিকতা (subjectivity, will) সক্রিয় ছিল। তাই আমরা দেখি, হিন্দু সংস্কৃতির সব দিক গ্রহণ করা হয়নি; আদিবাসী জগতের সব গোষ্ঠী একইভাবে এ গ্রহণে আগ্রহীও ছিল না[৩৭]; বিশেষ কোনও কোনও ঐতিহাসিক এবং পরিবর্তিত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এ প্রবণতা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হয়ে গেছে। একই কারণে হিন্দু-প্রভাবের তাৎপর্য এটা ছিল না যে, এর ফলে সবক্ষেত্রে আদিবাসীরা অনির্বাযভাবে হিন্দু জাতি ও বর্ণপ্রথায় অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। এমনও হয়েছে, এ প্রভাব সত্ত্বেও আদিবাসীদের স্বাতন্ত্র্য ও সংহতি চেতনা আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে।

॥ ৬ ॥

আমরা প্রশাসনিক আমলা ও পেশাদার নৃতত্ত্ববিদদের ধারণা ও সিদ্ধান্ত আলাদাভাবে আলোচনা করব।

ধরতে গেলে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত (এবং তার পরেও) আদিবাসী সমাজে হিন্দু-প্রভাবের রূপ-সংক্রান্ত প্রাসংগিক তথ্যের একটা প্রধান উৎস সরকারি আমলাদের বিবরণ। সব বিবরণীর উপলক্ষ এক নয়, যদিও সবগুলি প্রশাসনিক প্রয়োজনে লেখা। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এ প্রয়োজন আশু এবং প্রত্যক্ষ। যেমন আদিবাসী জগতে নানা সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলনকে বোঝার চেষ্টা হিসাবে ওখানকার সমাজ ও সংস্কৃতি ও আমলাদের নজরে আসে। অন্যান্য ক্ষেত্রে এ প্রয়োজন এরকম প্রত্যক্ষ নয়। সংগঠিত আন্দোলন না থাকলেও নানা কারণে আদিবাসী সমাজের নানা দিক বোঝা প্রশাসনের পক্ষে জরুরী ছিল।

কালানুক্রমে সাজালে আমলাদের বিবরণী থেকে ঔপনিবেশিক আমলে আদিবাসী সমাজে হিন্দুপ্রভাব বিস্তারের চরিত্র সম্পর্কে কয়েকটা সিদ্ধান্ত লক্ষ করা যায়।

(ক) ভূমিজ আন্দোলন (১৮৩২-৩৩)[৩৮] সংক্রান্ত সরকারি দলিল থেকে ভূমিজ সমাজে হিন্দুপ্রভাবের তাৎপর্য সম্পর্কে স্থানীয় আমলাদের একটা ধারণা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। তা হল, এ প্রভাব এত ব্যাপক এবং গভীর যে আদিবাসী হিসাবে ভূমিজদের স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রায় লোপ পেয়েছিল। এ প্রভাবের ইতিহাস সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি; তবে মনে হয়, আমলাদের ধারণা ছিল এর প্রক্রিয়া বহু আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। ভূমিজ সংস্কৃতি সম্পর্কিত পরবর্তী সব সরকারি রিপোর্টে হিন্দু প্রভাবের ব্যাপকতার কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে।

(খ) তুলনায় মুণ্ডা সমাজে হিন্দু-প্রভাবকে সরকারি আমলারা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করেনি; অন্তত মুণ্ডা ('কোল') বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত (১৮৩১-৩২)। তাদের মতে, এ প্রভাব প্রধানত নাগবংশী মুণ্ডারাজপরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। (সরকারি মহলে, একটা প্রচলিত ধারণা ছিল, নাগবংশী পরিবার আসলে মুণ্ডাজগতের এক প্রভাবশালী 'মানকি'-পদাধিকারী পরিবার)।[৩৯]

(গ) প্রথম সাঁওতাল-বিদ্রোহের (১৮৫৫-৫৬) সরকারি বিবরণে সাঁওতাল সমাজে হিন্দু-প্রভাবের কোনও কোনও নিদর্শনের উল্লেখ আছে। কিন্তু এ প্রভাবের চরিত্র বা তাৎপর্য সম্পর্ক কোন সুস্পষ্ট মন্তব্য নেই। বস্তুত, আমলাদের নানা ধরনের লেখা থেকে মনে হয়, ১৮৬০-এর দশকের শেষ পর্যন্ত সাঁওতাল অঞ্চলে হিন্দু-প্রভাবের প্রসার সম্পর্কে তারা মোটেই ওয়াকিবহাল ছিল না।

(ঘ) পরবর্তী সাঁওতাল এবং অন্যান্য আদিবাসী আন্দোলন (১৮৭০-১৯৩২)[৪০] সম্পর্কিত আমলাদের বিশ্লেষণ থেকে আমরা প্রথম বুঝতে পারি, এ অঞ্চলে, সমাজের নানা স্তরে, হিন্দু-প্রভাব গভীর এবং ব্যাপক হয়ে গেছে।

(ঙ) আমরা আগেই বলেছি, আদিবাসী সমাজ সম্পর্কে আমলাদের অনুসন্ধিৎসার কারণ শুধুমাত্র ওখানকার সংগঠিত প্রতিরোধ আন্দোলনকে বোঝার প্রয়াস নয়; প্রশাসনিক প্রয়োজনের অন্যান্য দিকও ছিল। তাছাড়া একান্ত প্রত্যক্ষ এ প্রয়োজনের চৌহদ্দির মধ্যেই এ অনুসন্ধান সীমিত ছিল না। ১৮৭০ এর দশক থেকে আমলাদের নানা রচনায় এর প্রমাণ মেলে। এটাও উল্লেখযোগ্য যে, সমসাময়িক নৃতত্ত্ববিদ্যার তাত্ত্বিক এবং পদ্ধতিগত দিকের সংগে তাদের কেউ কেউ সম্যক পরিচিত ছিল। তাই হিন্দু আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে তারা ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পেরেছে। অবশ্য তাদের অনুসন্ধানের পদ্ধতি পরবর্তী পেশাদার নৃতত্ত্ববিদদের মতো নয়। কোনও নির্দিষ্ট আদিবাসী এলাকায় গিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তারা সেখানকার সমাজ ও সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে খোঁজ করেনি। তাদের অধস্তন রাজপুরুষদের কাছে নানা বিষয় জানতে চেয়ে তারা প্রশ্নাবলী পাঠিয়েছিল। এ সম্পর্কিত উত্তরই ছিল তাদের আলোচনার প্রধান উপকরণ।

॥ ৭ ॥

ভূমিজ সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রথম সরকারি বিবরণ মেলে ১৮৩৩ সালে। এটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলব্যাপী ভূমিজ বিদ্রোহের (১৮৩২-৩৩) উপর স্থানীয় প্রশাসনিক প্রতিবেদনের অংশ।[৪১] বিদ্রোহের গতি প্রকৃতির সংগে ভূমিজ সংস্কৃতির কোনও প্রত্যক্ষ যোগের কথা এতে বলা হয়নি। বিদ্রোহের মূলকারণগুলি অনুসন্ধানের ব্যাপারে প্রশাসন অনেক বেশি যত্নশীল ছিল। ভূমিজ সংস্কৃতি সম্পর্কে উল্লেখ সংক্ষিপ্ত।

সরকারি বিবরণ থেকে মনে হয়, ভূমিজ-সমাজে হিন্দুপ্রভাব সর্বত্র একরকম ছিল না। কয়েকটা অঞ্চলে তার ব্যাপকতা লক্ষণীয় যেমন— বড়ভূম, ধলভূম এবং বড়ভূমের পূর্বপ্রান্তস্থিত মানভূমে। হিন্দুপ্রভাবের চরিত্র সম্পর্কে ১৮৩৩ সালের বিবরণীতে কী বলা হয়েছিল তা পরিষ্কার বোঝা দরকার। কারণ, ভূমিজদের সম্পর্কে পরবর্তী কয়েকটা সরকারি রিপোর্টে এর উল্লেখ আছে। হিন্দু প্রভাবের ব্যাপকতা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার ভিত্তি বিচারযোগ্য।

আমরা তাই সরকারি বিবরণীর প্রাসংগিক অংশ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি। "বড়ভূমের অধিবাসীরা প্রধানত ভূমিজ, কুর্মি, সাঁওতাল এবং অন্যান্য নীচু জাতের লোকেরাও আছে, তবে সংখ্যায় কম। তাছাড়া আছে স্বল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বানিয়া (Bania Traders) এবং মুসলমান...শারীরিক গঠনের দিক থেকে কোলদের সংগে তাদের মিল আছে; কোলদের সংগে তাদের বৈবাহিক সম্পর্কও আছে। এর থেকে মনে হয়, তাদের আদিপুরুষ এক। ভূমিজ ধর্ম সম্পর্কে সঠিক বলার মত প্রয়োজনীয় জ্ঞান আমার নেই। তারা বলে, তারা হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাদের কোনও ধর্মানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণেরা পুরোহিতের কাজ করে না। ধর্মকর্মের জন্য তাদের মন্দির জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠান নেই। তাদের পুজোর জায়গা গ্রামের কাছাকাছি বড় কোন গাছ বা ঝোপের তলা। সেখানে আছে বিশাল পাথরের এক চাই। লাল রঙ-মাখানো এ পাথরকে তারা বলে বুরু-কা-থান। [বুরু=সর্বশক্তিমান ভগবান, মারাং বুরু; থান=স্থান। 'বুরু-কা-থানে'র অর্থ তাই ভগবানের উপাসনার জায়গা]। তাদের নানা পালে-পার্বণে পুরোহিতের কাজ করে নায়া (Nya)। [সাঁওতাল অঞ্চলে এ পূজারী পুরোহিতের নাম নায়েক: [Naek, Naike] বছরে তিনটি প্রধান পার্বণ। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হল সুরুলপূজা। সময় বৈশাখ মাস, চাষবাসের কাজ শুরু হবার আগে। এ উপলক্ষে ঢালাও খাওয়া-দাওয়া আর নাচের আয়োজন করা হয়। পুরুষ নারী একসংগে এতে যোগ দেয়। সাধারণত গরুর মাংস খাওয়া তারা ছেড়ে দিয়েছে। কোলদের সংগে তাদের এ বিষয়ে পার্থক্য। কিন্তু মোরগ-মুরগী আর ভেড়ার মাংস তারা বাদ দেয়নি। তারা মড়া পোড়ায়, কিন্তু শ্মশান থেকে হাড় কুড়িয়ে এনে আবার মাটিতে পোঁতে; একটা পাথর দিয়ে এ জায়গায় নিশানা চিহ্নিত করে। তাদের ভাষা বাঙ্গলা; আমি কিন্তু বড়ভূমে এমন কোনও ভূমিজ দেখিনি, যে বাঙ্গলা পড়তে ও লিখতে পারে। পশ্চিম দিকে সিংভূমের কাছাকাছি অঞ্চলে তাদের ভাষা হল 'তার' (Tar), যা আসলে কোলদের ভাষা।"[৪২]

সংক্ষিপ্ত হলেও আমাদের আলোচনা প্রসংগে এ বিবরণ গুরুত্বপূর্ণ। বড়ভূম এবং কাছাকাছি অঞ্চলে হিন্দু-প্রভাবের ব্যাপকতা অনস্বীকার্য; কিন্তু এ প্রভাবের সীমাবদ্ধতাও লক্ষণীয়।

তারা হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অংশ—ভূমিজদের এ ঘোষণা তাৎপর্যপূর্ণ। তারা নির্দ্বিধায় নিজেদের হিন্দু বলেছে; অর্থাৎ ধরে নেওয়া যায়, আদিবাসী হিসাবে তাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রায় মুছে গেছে। যদিও তারা বাঙ্গলা পড়তে ও লিখতে পারে না, তারা এ ভাষায় কথা বলে। তাদের আদিভাষার প্রায়-সম্পূর্ণ বিলোপ অন্য সংস্কৃতির গভীর প্রভাবের নিশ্চিত প্রমাণ।

কিন্তু নিজেদের হিন্দু বললেও এবং অন্য ভাষা গ্রহণ করলেও

নানা মৌলিক বিশ্বাসে ও আচারে বর্ণাশ্রমশাসিত হিন্দু-সমাজ থেকে তাদের ব্যবধান এবং দূরত্ব লক্ষণীয়। যেমন, কোনও 'সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবার' তাদের ধর্মানুষ্ঠান ইত্যাদিতে পুরোহিতের কাজ করবে না। কোনও কোনও নিম্নবর্ণ হিন্দুদের ক্ষেত্রেও এটা দেখা গেছে। তাই পৌরোহিত্যের জন্য তারা বিশেষ কাউকে নিযুক্ত করত, যাদের পরিচয় সর্বত্র 'ব্রাহ্মণ' বলে। এটা আসলে ব্রাহ্মণ্য-প্রাধান্যের স্বীকৃতি। ভূমিজদের ক্ষেত্রে কিন্তু তা ঘটেনি। 'সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ'কে তারা পুরোহিত হিসাবে পায়নি বলে, ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়ে অন্য কাউকেও তারা এ কাজের জন্য ডাকেনি। তাদের ধর্মানুষ্ঠানের জন্য 'পূজারী পুরোহিত' তাদের আদি গ্রাম্যসমাজ-সংগঠনের অংশে—যেমন 'নায়া'। অনেক ক্ষেত্রে এরা ভূমিজ গ্রামপ্রধানও। এ সমাজ-সংগঠন দুর্বল হলেও 'নায়া'র বিশিষ্ট ভূমিকা অপরিবর্তিত থেকে গেছে। এটা লক্ষণীয় যে এ 'পূজারী'—যেমন মুণ্ডা পাহান, বা সাঁওতাল নায়েক—আদিবাসীদের স্বীকৃত অনুষ্ঠান ছাড়া অন্য কিছুতে পৌরোহিত্য করত না। যেখানে আদিবাসী গ্রাম-সংগঠন অটুট ছিল, যেখানে এটাই ছিল প্রচলিত প্রথা। ভূমিজ গ্রামসংগঠন অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে গেলেও 'পূজারী'র জন্য বাইরের কাউকেও নিয়োগ করার কথা ভাবা হয়নি।

হিন্দু মন্দিরের মতো ভূমিজদের কোনও উপাসনাগার ছিল না। কিন্তু নিজেদের হিন্দু বলে দাবী করলেও মন্দিরের মতো কোনও ইমারত বানায়নি। তাদের উপাসনার রীতি সম্পূর্ণ আদি ঐতিহ্যসম্মত। বড় কোন 'পবিত্র' গাছের তলায় বিশাল পাথর বসিয়ে লাল রঙের প্রলেপ লাগিয়ে 'বুরু-কা-থান' বানিয়েছে। তাদের সর্বশক্তিমান ভগবানও তাদের দীর্ঘকালের 'বুরু'। তাছাড়া, মৃত্যু যেখানেই ঘটুক না কেন, পরিবারের মৃতজনের অস্থি নিজ গ্রামে এনে কোন নির্দিষ্ট স্থানে পুঁতে রাখা আদিবাসী জগতের নানা অঞ্চলে বহুল প্রচলিত একটা প্রথা। পোঁতার জায়গাকে পাথর রেখে দিয়ে চিহ্নিত করা, এবং এ পাথরের টুকরোকে অতি পবিত্র জ্ঞান করাও এক বিশিষ্ট আদিবাসী রীতি"[৪২]।

ভূমিজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে আমলাদের পরবর্তী গবেষণাধর্মী রচনায়—যেমন ডাল্টন ও রিজলীর—[৪৩] ১৮৩৩-এর বিবরণীর কোন কোন সিদ্ধান্তের সমর্থন মেলে। তাছাড়া ভূমিজ সমাজে হিন্দু প্রভাবের সীমাবদ্ধতার অন্য কয়েকটা দিকের কথাও আমরা তা থেকে জানতে পারি। বিশেষ করে রিজলীর লেখা থেকে। ডাল্টনও মনে করেন, আদিতে ভূমিজ এবং মুণ্ডা স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী ছিল না। স্বাতন্ত্র্য গড়ে ওঠে পরে, বিশেষ করে যখন একই গোষ্ঠীর নানা দল ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। "ছোটনাগপুরের সীমানাবর্তী অঞ্চলে কোলরা সংখ্যাগরিষ্ঠ; তারা মুণ্ডা বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। আরও পূর্বদিকে যারা গিয়ে থেকেছে, তাদের নাম ভূমিজ...ছোটনাগপুরের কাছাকাছি জায়গায় যাদের বাস, তারা মুণ্ডাদের সংগে কোনও পার্থক্যের কথা বলে না। তাদের মধ্যে বিবাহ সিদ্ধ; অন্যান্য নানা ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে যোগ এত নিবিড় যে, মনে হয় তারা আসলে এক জাতির লোক। আরও পূর্বাঞ্চলে হিন্দু-প্রভাব এত বেশি যে ভূমিজরা এ ধরনের সম্পর্ক অস্বীকার করে। ধলভূমের ভূমিজরা মনে করে তারা এখানকারই আদি লোক'; মুণ্ডা, হো বা সাঁওতালদের সংগে কোনওরকম সংযোগের অস্তিত্ব তরা মানে না। এটা নিশ্চিত বলা যায়, এ এলাকার নানা মহলের জমিদার ও ভূমিজরা একই জাতির লোক'। ধলভূমের ভূমিজরা হিন্দুদের বেশ কয়েকটা উৎসব, পার্বণ গ্রহণ করেছে; 'কিন্তু তাদের ধর্মানুষ্ঠানের জায়গা এখনো আগেকার মতো, 'পবিত্র কুঞ্জ' [গাছের ঝোপ]; সেখানেই দেবতার উদ্দেশে বলি দেয়' ডাল্টনের মতো রিজলীরও বিশ্বাস, 'ভূমিজরা আসলে মুণ্ডাদেরই একটা শাখা'। কিন্তু পূবদিকে ছড়িয়ে পড়ার ফলে সেখানকার হিন্দুদের সংগে তাদের সংমিশ্রণ ঘটে, তাই আদিগোষ্ঠীর সংগে তাদের যোগসূত্র হারিয়ে যায়। 'ভূমিজরা যত পূবদিকে এগিয়েছে, হিন্দুপ্রভাবও ক্রমেই বেড়েছে'। অযোধ্যা পাহাড় পর্যন্ত সুবর্ণরেখা নদীর উভয়তীরস্থ এলাকায় পশ্চিম মানভূমে যে সব ভূমিজদের বাস, তারা 'নিঃসন্দেহে খাঁটি মুণ্ডা'। এ অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে বিশেষ ধরনের অসংখ্য কবর, যাদের অস্তিত্ব মুণ্ডাগ্রামের বৈশিষ্ট্য। এর থেকে বোঝা যায়, মুণ্ডাদের আদিমতম বাসস্থানগুলির মধ্যে একটা ছিল এ অঞ্চল। 'অযোধ্যা পাহাড়ের পূবদিকে অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।' বিস্তৃত পাহাড় থাকায় আনাগোনা স্বভাবতই কম ছিল। সে সব জায়গায় মুণ্ডাভাষা, এমনকি মুণ্ডানামও প্রায় হারিয়ে গেছে। 'এখানকার আদিবাসীরা নিজেদের ভূমিজ বা সর্দার বলে; বাঙ্গলা ভাষায় কথা বলে'।

রিজলীর একটা সিদ্ধান্ত আমাদের বর্তমান আলোচনা প্রসংগে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তা হল, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ভেদে ভূমিজ জগতে হিন্দুপ্রভাব বিস্তারের প্রকৃতিতে তারতম্য ঘটেছে। সামাজিক পদমর্যাদা বা ভূসম্পত্তির অধিকার যাদের বেশি, হিন্দুপ্রভাবও তাদের মধ্যে বেশি ব্যাপক।[৪৪] "জমিদার এবং তাদের অধস্তন বিভিন্ন স্তরের স্বচ্ছল ভূস্বত্বাধিকারী[৪৫] নিজেদের পরিবারের ধর্মানুষ্ঠানে পুরোহিত হিসাবে ব্রাহ্মণদের ডাকে। তারা কালী এবং মহামায়ার উদ্দেশে বলি দেয়"। কিন্তু সাধারণ অবস্থার ভূমিজরা আগের মতোই নানা নামে সূর্যের উপাসনা করে—যেমন সিং বোঙ্গা বা ধর্মঠাকুর। কারণ সূর্যদেবতাই তো তাদের ফসল নিশ্চিত করে, আর নিয়ন্ত্রণ করে ঋতু পরিবর্তন, যার সংগে সফল কৃষিকাজ অঙ্গাঙ্গীভাবে গড়িত। নানা ধরনের আঞ্চলিক দেবদেবীর পুজোও তারা করে। 'উচ্চবর্গের লোকেরা নিজেদের কাজের জন্য নিজেরাই ব্রাহ্মণ নিয়োগ করে'; আঞ্চলিক লৌকিক দেবদেবীকে স্বীকার করে না। অন্যান্য ভূমিজ পরিবারের ধর্মানুষ্ঠানের রীতি আলাদা। ব্রাহ্মণ এখানে পুরোহিতের কাজ করত না। তাদের পুরোহিত

('লায়া', Laya) আসলে 'অরণ্যের দেবদেবী'র পুজোয় পূজারী। সাধারণ ভূমিজ পরিবারের ধর্মকর্ম এদের নির্দেশমতো হত। মাঝে মাঝে তারাও ব্রাহ্মণদের ডাকত—যদি অবশ্য কোনও প্রচলিত হিন্দু দেবদেবীর পুজো হয়। কিন্তু স্থানীয় ব্রাহ্মণ মহলে এ দুই জাতের ব্রাহ্মণদের মর্যাদা সমান ছিল না। জমিদার বা অন্যান্য ভূস্বামী পরিবারের কাজে নিযুক্ত ব্রাহ্মণদের পদমর্যাদা ছিল অনেক বেশি। তারা নিজেদের 'রাঢ়ী কুলিন' বলে পরিচয় দিত; আর এ অঞ্চলের ব্রাহ্মণকুলের সবাই তাদের সমান মর্যাদাসম্পন্ন বলে স্বীকার করত। কিন্তু সাধারণ ভূমিজ পরিবারের কাজে নিযুক্ত ব্রাহ্মণদের 'পতিত ব্রাহ্মণ' বলে গণ্য করা হত; 'তারা ছিল কুর্মি বা ধোপাদের ব্রাহ্মণ'।

সামাজিক শ্রেণীভেদে হিন্দু প্রভাবের এ রকমফের রিজলী কিন্তু তার বইয়ের দীর্ঘভূমিকায়[৪৬] স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। এখানে বরং নানা হিন্দু প্রভাবকে তিনি ভূমিজদের 'হিন্দুজাতিতে' অনিবার্য রূপান্তরের অপরিহার্য নানা ক্রম বলে ধরে নিয়েছেন। রিজলীর এ বিশ্লেষণ উদ্ধৃতিযোগ্য: 'এখানকার এক খাঁটি দ্রাবিড় গোষ্ঠী তাদের আদিভাষা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে; এখন তারা শুধু বাঙ্গলা ভাষায় কথা বলে। নিজেদের দেবদেবী ছাড়া তারা হিন্দু দেবদেবীর পুজোও করে। একটা লক্ষণীয় প্রবণতা হল এই যে, আদিবাসী দেবদেবীর পুজোর ভার নারীদের উপর ন্যস্ত। সাঁওতাল ও মুণ্ডাসমাজের মতো এখানেও 'টোটেম'-বিশ্বাস-নিয়ন্ত্রিত গোত্র বিভাগের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কিন্তু, এসব নানা টোটেমের নাম ভূমিজরা ভুলতে বসেছে। সম্ভবত টোটেমের এ নামগুলি হারিয়ে যাবে, আর তাদের বদলে এখানকার অভিজাত গোষ্ঠীর সংগে সম্পৃক্ত নূতন নামের প্রচলন হবে। ফলে অতি প্রাচীন আদিবাসী জনগোষ্ঠী প্রকৃত অর্থে 'জাতি'তে রূপান্তরিত হবে। আর তাদের উৎপত্তি ও আদি ইতিহাসের পরিচায়ক নানা রীতি আচার তারা সম্পূর্ণ বর্জন করবে।'[৪৭]

(আগামী সংখ্যায়)

টীকা

১) সুরজিৎ সিংহের মন্তব্য: 'I initially conceptualized the category 'tribe' ideally, as an archaic pre-civilizational formation'. **Tribes and Indian Civilization** (বারানসী, ১৯৮১); 'Foreword'। 'সভ্যতা' (civilization) কথাটাকে বোঝাতে অধ্যাপক সিংহ Robert Redfield-এর (**Human Nature and the Study of Society**, Chicago, 1962) সংজ্ঞা গ্রহণ করেছেন। এতে প্রধানত 'সংস্কৃতি' (culture) এবং 'অবয়ব', 'বিন্যাস' (structure)-এর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সংস্কৃতির দিক থেকে সভ্যতার ধারণা "assumes the existence of critically systematized thought formulated by specialists (literati) above the level of the unsystematized local oral tradition"। 'অবয়ব'-এর দিক থেকে সভ্যতার একটা বিশিষ্ট লক্ষণ হল: "the existence of hierarchies of urban centres for the cultivation of material and ideational excellence"। নাগরিক এ কেন্দ্রগুলির সংগে গ্রামীণ এবং অন্যান্য অঞ্চলের ব্যাপক যোগসূত্র রয়েছে—সুরজিৎ সিংহ; পূর্বোল্লেখিত, পৃ: ৩।

২) এ নূতনভাবে গড়ে ওঠা সমাজ ও অর্থনীতিকে সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন 'Secondary Formation'.

৩) Kumar Suresh Singh, **Tribal Society in India** (Manohar, New Delhi, 1985), পঞ্চম অধ্যায়: 'Tribalization'

৪) নীহাররঞ্জন রায়, **বাঙ্গালীর ইতিহাস** (তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮০); দ্বাদশ অধ্যায়: Kumar Suresh Singh, পূর্বোল্লেখিত

৫) **বাঙ্গালীর ইতিহাস**, পৃ: ৬০৬।

৬) সম্ভবত এ ব্যাপকতার কথা মনে রেখেই সুরেশ সিং এ প্রক্রিয়াকে Tribalization বলেছেন। তার মতে এর একটা আদি রূপ লক্ষণ ('traditional aspect') হল: "acceptance of tribal mores, rituals and beliefs by in-coming communities". **Tribal Society in India**, পৃ: ৮৭।

৭) বিস্তারিত আলোচনার জন্য, **বাঙ্গালীর ইতিহাস**; দ্বাদশ অধ্যায়।

৮) তাঁর অনবদ্য ভাষা আমরা উদ্ধৃত করছি: 'আজিকার দিনে কিংবা আদি ও মধ্যযুগে ভদ্র, উচ্চস্তরের বাঙ্গালী জীবনে যে ধর্মকর্মানুষ্ঠানের প্রচলন আমরা দেখি ও যাহাকে আমরা বাঙ্গালীর ধর্মকর্মজীবনের বিশিষ্টতম ও প্রধানতম রূপ বলিয়া জানি, অর্থাৎ বিষ্ণু, শিব, সূর্য, দেবী, গণেশ, অসংখ্য বৌদ্ধ, জৈন, শৈব ও তান্ত্রিক বিচিত্র দেবদেবী লইয়া আমাদের যে ধর্মকর্মের জীবন তাহা একান্তই আর্য-ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ-জৈন-তান্ত্রিক ধর্মকর্মের চন্দনানুলেপ মাত্র এবং তাহা সংস্কৃতির গভীরতা ও ব্যাপকতার দিক্ হইতে একান্তই মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যে ধর্মকর্মময় সাংস্কৃতিক জীবন বাঙ্গালীর জীবনের গভীরে বিস্তৃত..., সেই ধর্মকর্মময় সংস্কৃতি আর্য-মনের, আর্য-ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন-তান্ত্রিক ধর্মকর্মের সাধনা ও অনুষ্ঠানের নীচে চাপা পড়িয়া আছে।' পৃ: ৬০৮-৬০৯

৯) E. Lister, **Hazaribagh District Gazetteer**, (1917), পৃ ৭৬-৭৭

১০) **বাঙ্গালীর ইতিহাস,** ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ ৩১৬-৩২১

১১) Buchanan Hamilton, **Bhagalpur Journal,** 1810-11, (Patna, 1930) ১৮০৭-১৮১৪, এ সময়কালের মধ্যে বুকানন হ্যামিলটন বাংলা ও বিহারের কয়েকটা জেলায় ঘুরে ঘুরে নানা বিষয়ে অনুসন্ধান করেন।

১২) এম্.এন্. শ্রীনিবাস এ প্রসংগে এস্.এল্. কলিয়ার (S.L. Kalia) গবেষণার কথা উল্লেখ করেছেন। 'Kalia's examples illustrate the radical changes which may come about in the style of life and values of people when they move away from their reference groups. The case with which the high-caste Hindus took over the new culture was perhaps due to the temporary nature of their stay, and some of them were at least aware of this. Thus Uttar Pradesh Brahmins who ate meat, drank liquor, and consorted with hill women in the Jaunsar-Bawar area [of Uttar pradesh] told Kalia: 'We have to do it because of the climate. There is nothing available here except meat. We will purify ourselves the day we cross the Jumna and return to our homes in Dehradun'. (M.N. Srinivas, **Social change in Modern India** (Allied Publishers, New Delhi, 1966), অধ্যায় 'Sanskrijization', পৃ: ১৯।

১৩) Bengal Judicial Proceedings, November, 1874; Nos 1-3; G.N. Barlow, Officiating Commissioner of Bhagalpur to Govt. of Bengal, Political Department, dt. 7 Oct, 1874.

১৪) প্রাগুক্ত; John Boxwell, Officiating Deputy Commissioner of the Sonthal Pergunnahs to the Commissioner of the Sonthal Pergunnahs, 1st Oct, 1874.

১৫) Bengal General Miscellaneous Proceedings, September, 1875; File No 133-1/4; Annual General Report, Bhagalpur Division, 1874-75.

১৬) Bengal Judicial Proceedings, March 1875; G.N. Barlow, Officiating Commissioner of Bhagalpur Division, to the Deputy Comissioner of the Sonthal Pergunnahs, 25 Feb. 1875.

১৭) প্রাগুক্ত; File No 40-88; 'Note' by G.N. Barlow, Bhagalpur Commissioner, 'upon the course of events occurring in the Sonthal Pergunnahs subsequent to 1872, which have led to the state of affairs existing at the present time', dated 9 march 1875.

১৮) প্রাগুক্ত; File No 40-89; 'Note' By Richard Temple, the Lieutenant Governor of Bengal, 9 March 1875.

১৯) Bengal Judicial Proceedings; August 1881; Nos 39-40 Appendix 'A' of Bhagalpur Commissioneer's letter of 5 June 1881 to the Govt. of Bengal, Judicial Department. 'Note' by W. Oldham, Deputy Commissioner of the Sonthal Pergunnahs, (dated 16 March, 1881) on 'the state of Affairs in the Sonthal Pergunnahs'.

২০) প্রাগুক্ত; Appendix 'C'. Reply to Bhagalpur Commissioner's Questionaire.

২১) প্রাগুক্ত। Appendix 'B'.

২২) প্রাগুক্ত; Appendix 'C'.

২৩) একই।

২৪) একই; 'Reports received subsequent to the preparation of previous papers'.

২৫) প্রাগুক্ত; Appendix 'B'; খেরওয়ার আন্দোলন সম্পর্কিত বারোটা প্রশ্ন পাঠানো হয়েছিল।

২৬) প্রাগুক্ত; Appendix 'C'; Reply to Question No. 7: 'What is the true origin to the Kherwar Movement ?'

২৭) একই। ২৮) একই। ২৯) একই। ৩০) একই।

৩১) উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শ্রীহট্টের বৈষ্ণব সমাজের এ দুই সম্প্রদায়ের এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন বিপিনচন্দ্র পাল তার **Memoirs of My Life and Times,** (Calcutta, 1932), Chapter 6-এ। "There are two kinds of Vaishnavas, the householder and the mendicant....The mendicant Vaishnavas take the vow to celibacy and poverty like the other religious mendicants and take up the staff and the bowl and affect the loin cloth or **Kaupin** of the general body of our Sannyasins....these Vaishnava mendicants, unlike those of the other orthodox Hindu Sannyasins, generally come from

the lower castes of Bengalee Society...". আদিবাসী এলাকায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে বৈষ্ণব গোঁসাইদের আন্তরিক প্রয়াসের কথা আচার্য যদুনাথ সরকার খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। "The Vaishanva Gosains set themselves to converting the aboriginal tribes..." (**The History of Bengal,** Vol. II, University of Dacca, 1972 impression, Ch. XII). বাংলায় বৈষ্ণব আন্দোলনের বিখ্যাত ইতিহাসকার রমাকান্ত চক্রবর্তীর মতে ঐ এলাকায় বৈষ্ণব আদর্শপ্রচারে অগ্রণী গোঁসাইরা মূল বৈষ্ণব সংগঠনের সংগে যুক্ত ছিলেন না। তারা ছিলেন 'deviant orders'এর অনুগামী। **Vaisnavism in Bengal, 1486-1900,** (Calcutta, 1985), পৃ: ৩২৭-২৮।

৩২) H.H. Risley, **The Tribes and Castes of Bengal** (1891, Calcutta); 'Introductory Essay'। রিজলীর সিদ্ধান্তের বিচার প্রসংগে আমরা এ বিলোপের চরিত্র আলোচনা করব।

৩৩) H.H.Risley, **The People of India** (London 1915, পৃ. "All over India at the present moment tribes are gradually and insensibly being transformed into castes'.

৩৪) G.S. Ghurye, **The Aborigines 'So-Called' and their Future** (Poona, 1943)

৩৫) আদিবাসী সমাজের পক্ষে হিন্দুপ্রভাবের তাৎপর্য সম্বন্ধে নির্মলকুমার বসুর বক্তব্য আমরা পরে বিচার করব। এ 'পদ্ধতি'কে বসু "The Hindu Method of Tribal Absorption' বলেছেন।

৩৬) এ দুটো দিককে তারা নাম দিয়েছেন 'Emulation এবং Solidarity'. Martin Orans, **The Santal: A Tribe in search of a Great Tradition** (Detroit, 1965)। পরবর্তী এক পরিচ্ছেদে এ বিষয়েও আমরা বিশদ আলোচনা করব।

৩৭) যেমন, মুণ্ডাজগতে এ আগ্রহ বিশেষভাবে দেখা গিয়েছিল নাগরবংশী রাজপরিবারে। পরে (Section ৭.১) আমরা দেখব, একান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য ছোটনাগপুরের অনেক বিত্তশালী ভূস্বামী পরিবার নিজেদের কোন না কোন রাজপুত রাজপরিবারভুক্ত বলে দাবী করে।

৩৮) ভূমিজ বিদ্রোহের শুরু দুটি জঙ্গলমহল এলাকায়—বরাভূম ও ধলভূম। কিন্তু জঙ্গলমহলের প্রায় সব 'জমিদারী'তে তা বিস্তৃত হয়। (১৮০৫ সালের ১৮ নম্বর Regulation-এ 'জঙ্গলমহল'কে এক আলাদা ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তৃত্বাধীন নূতন জেলা হিসাবে ঘোষণা করা হয়)।

৩৯) একটা গ্রামের 'প্রধান'কে বলা হত মুণ্ডা। 'মানকি' ছিল গ্রামসমষ্টির প্রধান। গ্রাম-'প্রধান' হিসাবে 'মুণ্ডা'র দায়িত্ব ছিল খুবই ব্যাপক; আদিবাসী অঞ্চলের বাইরে গ্রাম-প্রধান 'মণ্ডল'-এর দায়িত্বের সংগে তা মোটেই তুলনীয় নয়। গ্রামের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মানকিদের সচরাচর কোন কর্তৃত্ব ছিল না।

৪০) যেমন মুণ্ডা, ওরাঁও এবং হো'দের আন্দোলন।

৪১) Bengal Judicial Criminal Proceedings, 31 March 1834; No 51; Joint Commissioners of Jungle Mehals to the Secretary to the Government, Judicial Department, dated 4 September 1833.

৪২) **Ibid;** paras 3-5 of the 'Report' (4 Sept. 1833)

(৪২.ক) এ প্রস্তরখণ্ডকে মুণ্ডারী ভাষায় বলা হত Sasan-diri. Sasan হলো মুণ্ডাদের আদিগ্রাম পত্তনকারী পরিবারের (খুঁৎকাটিদার) বংশধরদের ব্যবহৃত শ্মশান। Sasan-diri-র সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে: "a stone slab brought to the sasan"। নির্মলকুমার বসু'র **'হিন্দু সমাজের গড়ন'** (কলিকাতা ১৩৫৬)-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে এর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। বিস্তৃত আলোচনার জন্য: John Hoffmann: **Encyclopaedia Mundarica** (পৃ: ৩৮৬-৩৮৭৩)

৪৩) E.T. Dalton, **Descriptive Ethnology of Bengal** (1st Edn. 1872, Calcutta); (Reprint, Calcutta 1980); পৃ: ('Reprint')—১৭১-৭৫

(৪৩.ক) H.H. Risley—**The Tribes and Castes of Bengal** (Calcutta 1891), vol I.

—**The People of India** (London 1915)

৪৪) রিজলীর মন্তব্য: 'The religion of the Bhumij varies, within certain limits, according to the social position and territorial status of the individuals concerned'. **Tribes and Castes...,** পৃ: ১২৪-২৫

৪৫) 'Well-to-do tenure-holders'.

৪৬) **Tribes and Castes...,** 'Introductory Essay', পৃ: xvii-xviii.

৪৭. **Ibid.**

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর তিনটি কবিতা

সে আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে

সে আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে, আমি বুঝতে পারি।
মাঝে-মাঝে ঘরে আসে, টেবিলের ধারে এসে বিষন্ন দাঁড়ায়।
কিন্তু সে থাকে না বেশিক্ষণ।
আমি তাকে বসতে বলি, কিন্তু সে বসে না।
এমনকি আমার দিকে তাকায় না অবধি।
ঘরের মেঝের দিকে চক্ষু রেখে নিস্পৃহ গলায়
বলে বটে দুটি-চারটি কথা।
কিন্তু তা মামুলি সবই, কুশল জিজ্ঞাসা মাত্র, তার
বেশি কিছু নয়।
সে আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে, আমি বুঝতে পারি।

আমি বলি, আকাশে জমেছে বড় মেঘ।
এখুনি যাওয়া কি ভাল, পথে কিন্তু ঝড় উঠতে পারে।
এসেছ যখন, একটু বসে যাও।
সে কিন্তু বসে না।
মনে হয় না সে আমার কোনো কথা শুনতে পেয়েছে।
সে দাঁড়িয়ে থাকে আরও কিছুক্ষণ।
যেন কিছু ভাবে।
তারপর নতমুখে ঘরের বাইরে চলে যায়।

আকাশে জমেনি মেঘ। যা জমেছে, সবই অন্তরালে।
সে আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে, আমি বুঝতে পারি।

নদীর ধারে

বিশ্বভুবন থমকে আছে, অন্ধকারে
গাছগাছালি কয় না কথা,
মধ্যরাতের স্তব্ধ বিশাল নদীর ধারে
আজ সমূহ নির্জনতা।
জলের কাছে যে তার পায়ের চিহ্ন রাখে,
জল তারই প্রতীক্ষারত।
শূন্যপথে জোনাকগুলো ঘুরতে থাকে
অপার্থিব চোখের মতো।

নয়নতারা

পাঁচজনে পাঁচ কথা এসে কানে তুলে দিয়ে চলে যায়।
কিন্তু এই সমস্যা হয়েছে:
যা দেখি, তার সঙ্গে আমি কোনো কথা মেলাতে পারি না।
রাজারা কান দিয়ে দ্যাখে, এইরকম জানি।
(সম্ভবত চক্ষু দিয়ে অন্য কোনো কাজ তাঁদের হয়।)
কিন্তু আমি রাজা নই, যৎসামান্য প্রজা।
আর তা ছাড়া ভাগ্যক্রমে দুই চোখে পড়েনি আজও ছানি।
তাই যে যতই এসে বিষ ঢালুক কানে,
আর তাতে যতই শাক মজা,
সম্মুখে তাকিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি, অমল প্রভায়
আজকেও নয়নতারা ফুটেছে বাগানে।

মুকুটের ব্যাসকূট

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

যে পরে মুকুট তাকেই ভেবেছো তুমি রাজা!
জন্ম থেকেই তোমার অভ্যাস ছিল হাত তোলা কুর্নিশ,
তুমি কুর্নিশ করার সময়ে কেবল মুকুটই দেখেছো
ওই শিরোপোশের নিচের মানুষটিকে লক্ষ্যই করোনি!
ঠিক এভাবেই নিশান দেখলেই
ভেবেছো ওখানে বিপ্লব নিশ্চিত লেগে আছে,
আমিও গিয়েছি ছুটে জনতাবিশ্বাসী, কেননা আমারো ছিল
সাম্যবাদের স্বাধীনতা, যা আজও যথেষ্ট করে শেখাই হলোনা
তাই মুকুটিকে ভাবা হলো রক্ষার নিতান্ত এক বোকা শিরস্ত্রাণ,
এই যে আসুন রাজা, রাজা পা তুলে বসুন
ও রাজা ময়লা লাগবে যে! শুধু পথ রাস্তাঘাট নয়
খুঁজলে মুকুটের নিজেরও কিছু নোংরা পাওয়া যাবে!

আমি নানা ধান বাবধানের মুকুট দেখেছি।
পাহাড় মুকুট পরে সূর্যার্ঘ ভোরে
ঐ যে বনানী, তার সবুজ মুকুট আছে
সেখানে কে যেন শিশির স্থাপন করে বলে
তুমি কবির মুকুট হয়ে যাও!
মানুষ এবং দেশ সব শেষ করেও যে কবি এখন
নদীর সান্ত্বনা খোঁজে, পাহাড়ের পাথরে বিশ্রাম চায়
চায় ধরিত্রীর ধনা ধান, তার কাছে নারীও এখন শুধু
বয়সের নিঃস্ব বাবধান—দেশই তার কাছে ছিল
প্রধান বিশ্বাস বিশ্ব, এখন সে অবিশ্বাসী, মুকুট দেখলেই তার
করোটির চারপাশে জ্বলে ওঠে অদৃশ্য আগুন,
সে আগুনে পুড়তে পুড়তে সে এখন আর
যথেষ্ট মানুষ নেই! বিপ্লবের শূন্য স্থান
পূরণ হয় না তার, সে শুধু কাগজ খোঁজে
খোঁজে যৎসামান্য আক্ষরিক কালি
যে কালিতে লিখবে সে নিজের ফুসফুস

দূষণবাতাস ছাড়া আজ যার সবখানি খালি!

মিলির সঙ্গে কথাবার্তা / ৪

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

শীত এসে পড়ল মিলি। আমাদের জঞ্জালকাদার শহরে এই ক্ষণস্থায়ী সুখের দিন, শুকনোপাতার লালহলুদ কার্পেটে ঢাকা রাস্তা,—এই হাঁটার দিন এল। বরফের দেশ থেকে অতিথিরা এসে ভিড় জমিয়েছে ইন্‌নিস্টাটে, নন্দনে, জোড়াসাঁকোয়—ওরা কিছু যেন সাইবেরিয়ার পাখি!

মিলি, এতদিন গ্রীষ্ম ছিল আমার ঋতু। এখন দেখছি, শীতও আমাকে কিছু দিয়ে যায়। রাত জেগে মিউজিক কনফারন্‌স—কতকাল পরে, বলো তো! ত্রিপলধেরা মাঠে এক দঙ্গল পরিপাটি মানুষ, কিছু পরিচিত, বন্ধু দুএকজন,—কষ্ট করে দুঃখ ভুলতে গেছে। অন্ধকার কাটতে-না-কাটতেই ওমমাখা ঘাসের ওপর দিয়ে বাড়ি ফিরতে থাকি আমি—ভোরের শুরুটা দেখব বলে। যেন নেশায় টলমল মাথা, যেন ফেটে যাবে। শেছনে, ক্ষীণ হতে থাকা যশরাজের ভৈরবী,—সামনে, ডিম ভেঙে বেরিয়ে আসা ভরাট পরের দিনটা।

শীত শেষ হওয়ার আগে বেড়াতে যাবে মিলি—যেদিকে পশ্চিমঘাট, যেদিকে আরব সাগর? চলো বালিতে যাই, নোনাজলে হাঁটি। এসব ইচ্ছের কথা। আসলে তো কোথাও যাব না,—নির্জনতা এক আকাশফুল—ধুলোমাখা চকমকি পাথর। জঙ্গলে নিয়ে যাবে—বলেছিল লালা। সে এক বড়মানুষের খেয়ালকথা, সে কি সত্যি হয়? চা বাগানে নিমন্ত্রণ ছিল, ছিল অযোধ্যা পাহাড়ে। সঙ্গী নেই, সঙ্গীর সময় নেই, আমারই সময় শুধু বয়ে যায়।

কেটে যেতে থাকে ঠাণ্ডা রোদ-ঝলমল দিন, আমনধানের দিন, বৃদ্ধমানুষের শেষ দিন, ফৌজি ছেলেটার ঘরে ফেরার দিন।

এখন তোমার থেকে

আশিস সান্যাল

ক্রমশ তোমার থেকে দূরে
বহুদূরে
অন্য এক পৃথিবীর নিসর্গে এখন
দেখছি আরেক দৃশ্য—
চারদিকে আলোড়িত গন্ধরাজ বন।

বিগত জন্মের সব ভুলে গেছি আজ।
ভুলে গেছি
ছিলে কাছে অনুগত—
চারদিকে ছিলো আর বিস্তীর্ণ বিরাজ
স্বচ্ছল নদীর মতো
বিশ্বাসের অনুরূপ রঙিল প্রাচীর।
ভুলে গেছি সেই সব—
কোথায় ছিলাম স্নিগ্ধ সেই পৃথিবীর।

পৃথিবীর মৌল আবর্তনে
এখন আরেক দিন—
চারদিকে প্রসারিত অন্য রণভূমি।
আরেক বোধের কাছে
প্রত্যাশায় নতজানু রক্তাক্ত হৃদয়।
নতুন দিগন্তে যেন
অন্য এক বেদনায় নব সূর্যোদয়।
তবুও তৃষ্ণার্ত পাখি
ডানা মেলে যেতে চায় দুর্গম সাগরে।
এখন তোমার থেকে
বহুদূরে—
অন্য এক পৃথিবীর ঘনিষ্ঠ আসরে।

শান্তিকুমার ঘোষের দুটি কবিতা

একটা শুধু স্থলপদ্ম গাছ

সারা জীবন কেটে গেল রেলস্টেশনে অপেক্ষা ক'রে।
দূর-পাল্লার ট্রেন ঝড়ের বেগে যায় উড়ে।
দেখা যায় না মুখের সারি জানালায়-জানালায়।
একটা শুধু স্থলপদ্ম গাছ প্ল্যাটফর্মের ধারে
ভেদ করেছে সব রুক্ষতা :
যেন তন্বী যাত্রীনী প্রতীক্ষামাণা,
অফুরান স্বপ্ন দুচোখ জুড়ে।
যেমন নিঝুম ছিল, স্টেশন তেমনই থাকে ;
চেনা যায় প্রতিটি বর্ণ শব্দ ঘ্রাণ।

আমার স্বপ্নের উল্টো দিকে

সারা বছর সব চেয়ে কম
সূর্যের আলো পড়ে—
এই ডিঙুগড়ে।
বসন্তেও আবার বৃষ্টি...
শ্রাবণের ফুলঝুরি :
মুষলধারা না হোক—ইলশেগুঁড়ি।
ইচ্ছা করে এখানেই থেকে যাই
বাদবাকী জীবন,
কেন্দ্রাতিগ শক্তি কষে প্রাণপণ।

আমি ও আমার স্বপ্নের উল্টো দিকে কুটীরে
কী যে আনন্দ সারাক্ষণ।
যে-শিশুরা খেলছে নিকানো উঠানে
ফুল-ঝড়ের মাঝখানে,
খেলছে তারা চিরকাল।

কুটীরের ভেতর থেকে জাগে যে সব কণ্ঠস্বর
নিঃসন্দেহে গাইছে তারা গান পরস্পর—
সর্বদা ঝরছে নির্ঝর।
এখানে বাইরে যখন ছুটি, নিশ্চয় অবকাশ ওখানে
অই ভিতরে।
হ'তেই হবে, কেননা, জোড়া লেগে যায় সব কিছুর সঙ্গে সব কিছু—
মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি, যেমন শহর ডিঙুগড়ে।

অজাতক

অমলেন্দু ভট্টাচার্য

আমার দৃঢ় বিশ্বাস
তুমি জন্ম নিতে চলেছো
তাপ থেকে কান্না থেকে শক্তি থেকে।
ঝড়ের উৎস থেকে রক্তমাংসের ব্লোক থেকে
সরাসরি জন্ম নেবে তুমি।
তোমার চোখ মুখ ঠোঁট আর হাতের আঙুল
পৃথিবীকে শেখাবে নতুন অক্ষর।
আকাশ উড়বে তোমার চুলে বর্ণপরিচয়ের পাতার মতো।

নদী দেখবে ব'লে সমুদ্র দেখবে ব'লে
পাথর ও জলের জ্যোৎস্না দেখবে ব'লে
তোমার জন্ম অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে উঠছে—
আন্দোলনে তোমার শ্লোগান গ্রহণযোগ্য
হ'য়ে উঠতে পারে এই ভেবে চমকে উঠছে শ্রাবণের রোদ—
শ্রদ্ধেয় বৃক্ষের পাশে ব'সে আছে কালের রাখাল,
তোমাকে সঙ্গে নেবে...

নির্বাসন থেকে অজ্ঞাতবাস থেকে
মাছরাঙা নিয়তির অনুভব থেকে
তোমার জন্ম আসন্ন ;
মাটি চিনবে ব'লে তুমি স্থির ক'রে নিয়েছো
তোমার রণকৌশল—
তোমার সামাজিক পদবী এইখানে নিরূপিত হবে...

আমার দৃঢ় বিশ্বাস তোমার জন্ম ছাড়া
পৃথিবীর নেই কোনো আগামী জন্মদিন

টক্কর

রূপা দাশগুপ্ত

গৃহভুক তোমার হাত
গৃহভুক তোমার পা
তুমি জানতেও পারছো না

একটা মাছি কখন থেকে ঘুরঘুর শাদা নখের ডগায়
একবার হাওয়া এসে দমকা হামায় চিকণ বুকে
দরজা পার হতে ভয় পাচ্ছে জ্যোৎস্নার দানাগুলি
তুমি জানতেও পারছো না

তুমি লক্ষ্যস্থির একটি জালের দিকে
জালের কেন্দ্রটান কিভাবে ফুলে উঠছে বৃত্ত সংগমে
আর শেষ প্যাচটুকু অপেক্ষায় অপেক্ষায় তোমার দুর্দিনের জন্য
তুমি রোমকূপ দাঁড়াশ করতে করতে
হেসে উঠছো একা একাই

তোমার কোন কোন কথাগুলি কবিতা হচ্ছে
কোনগুলি বা নিছক কমলপেখা অভ্যাস
তুমি জানতেও পারছো না

মধ্যলয়ের সানাই বেছে তুলছে সব পোকা
তোমার একটি হাত কোণাভাঁজ চোখের পাতায়
আর, দেওয়ালদেরও খুব শীত শীত করে আজকাল
তুমি জানতেও পারছো না।

তুমি লক্ষ্যস্থির নিজের জ্বরে,
বিকারহীন পারদ ফাটিয়ে দিচ্ছে থার্মোমিটারের সীমা
পারদ ছড়িয়ে পড়ছে গৃহবিবাদের টেবিলক্লথে
আর, চতুরহাতে ছোটাচ্ছুটি গ্রহ রাশি কাগজনামার
তুমি শিরাপথ গন্‌গনে রেখে
ঘুমিয়ে পড়ছো একা একাই.....

গৃহভুক তোমার হাত
গৃহভুক তোমার পা
তুমি জানতেও পারছো না।

নিঃসঙ্গ নির্মাণ

সুকুমার চৌধুরী

বিজন সমুদ্রে ছিলো সন্তপ্ত ঝিনুক
বর্জনের বালিয়াড়ি থেকে তাকে আজ কুড়িয়ে এনেছি
নিঃসঙ্গ ঘুমের দেশে লগ্ন ছিলো এতদিন-নির্জনতা, মনি।

তাকে কী দেবো? হৃদকম্প, স্বেদের লবণ
বুকের বর্তুল মায়া, দোলাচল, বিভা।

বেঁধে দেবো হারের সন্ধিতে, জড়োয়ায়
এভাবে কি ক্ষয়ে যাবে সমূহ সন্তাপ তার, নিঃসঙ্গতা, বিষ

বাক্‌সংস্কৃতি এবং ভারতীয় সাহিত্য

বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য

সাহিত্যের স্বরূপ কী, কবিতা কী—এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে জীবনের অনেক সময় ব্যয় করেছি। সঠিক বা সম্যক উত্তর দেওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। বড় কবিদের মতো রবীন্দ্রনাথকেও সাহিত্যের সম্বন্ধে অনেক কিছু বলতে হয়েছে কিন্তু সেই সব বলার চেয়ে মূল্যবান তার সৃষ্টি। বিশ্লেষণ দ্বারা তার পূর্ণ রূপ ধরা যায় না। জ্ঞানপীঠের গুণী পরিচালকদের তরফ থেকে আজকের আলোচনা-সভার জন্য যে বিষয় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে : বাক্‌-সংস্কৃতি এবং ভারতীয় সাহিত্য। বাক্‌, সংস্কৃতি, ভারতীয়, সাহিত্য—এই চার শব্দের অর্থ যদি পৃথকভাবে অথবা সংযুক্ত রূপে (যেমন দেখা যায় বিষয়-বস্তুর নামকরণে) অনুসন্ধান করা যায় তবে শব্দের অরণ্যে প্রবেশ করে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। সেই জন্য আমি নিজের উপলব্ধি অনুসারে যা প্রাসঙ্গিক এবং সঙ্গত মনে করছি তার সম্বন্ধে দু চারটি কথা বলব। সেমিনারগুলো যদি সাহিত্য-সৃষ্টি অথবা রস-উপভোগের সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে আমরা সাহিত্যিকরা আলোচনা থেকে অনেক বিষয়ে পথের সন্ধান পেতে পারি। কিন্তু জীবনে অনেক সেমিনারে অংশগ্রহণ করে আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে লেখক হিসাবে উৎসাহিত হবার কারণ দেখছি না। আমার ধারণা বাক্‌-সংস্কৃতির অর্থ **Word-culture, language-culture, speech-culture** আর **talk-culture** আদি বিবিধ অর্থ করা যায়। বাক্‌ শব্দের অর্থ **expression**ও হয়। **voice**ও হয়। বাগ্‌দেবী বললে সরস্বতীকেও বুঝায়। ভারতীয় সাহিত্যের অর্থ স্পষ্ট, কিন্তু খণ্ড বাক্যটির পরিসর বাইশ থেকে অধিক ভাষার ক্ষেত্রে বিস্তৃত। বহুভাষিক ভারতীয় সাহিত্যের বিবিধ ভাষা-ক্ষেত্রের শব্দ, ভাষা, বচন বা কথার বিবিধ সমস্যা বর্তমান। আজকের বিষয়-বস্তু থেকে দেখছি কোনও একটা বিষয় নির্বাচন করবার মতো স্বাধীনতা আমার হয়ত আছে। কিন্তু সেই স্বাধীনতা প্রয়োগ করা সহজসাধ্য কাজ নয়।

বাচো মনুষ্যা বদন্তি। আর তিন ধরনের বাক্‌ আছে, সেইসব প্রকাশিত হয় না। এই কথা ঋগ্বেদে বলেছে। 'বাক্‌' শব্দের বিস্তৃত এবং গভীর ব্যাখ্যা গতকাল দিয়েছেন সুপ্রসিদ্ধ গুজরাটী লেখক ডাবেজী। সেই ব্যাখ্যায় শব্দ বা বাক্যের পরা পশ্যন্তী মধ্যমা আদি রূপের কথাও বলেছেন। এই তিনটি রূপ গুহায় নিহিত অপ্রকাশ্য এই কথাও বলা হয়েছে। পরে শাস্ত্রজ্ঞরাও বাকের এই অপ্রকাশ্য রূপসমূহের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে সেইসবের বাস্তবিক তাৎপর্য প্রকাশ করেছেন। ধ্বনি হল পরা। পশ্যন্তী হল বর্ণ। মধ্যমা হল প্রকাশিত আর অপ্রকাশিতের মাঝের স্তর। বাক্য হল প্রকাশিত রূপ। এইটাই হল সেই বাক্‌ যাকে আমরা বলি বাক্য। কাব্য হলেন—বাক্য রসাত্মক কাব্যম্‌। কবিতা চিত্রময় কবিতা ধ্বনিময় কবিতা রহস্যময় প্রাচীন ঋষিরা বাচের যে অশরীরী রূপের কল্পনা করেছিল সেই রূপ মনস্তত্ত্বসম্মত। বাক্যের বা শব্দের পূর্ব রূপগুলো কী তা প্রত্যেক কবি এবং সাহিত্যিক স্পষ্ট করে না জানলেও অনুভব করে। ওগুলো **gestation stage**-এর প্রক্রিয়া। আমার মনে হয় বাক্যের মধ্যেই অপ্রকাশ্য রূপে, প্রতীক রূপে ঐগুলো থেকে যায়। একটা অনুভূতি, একটা পরিস্থিতি, একটা উপলব্ধি, একটা চরিত্র সর্বপ্রথম মনের গহন স্তরে উদয় হয়। তখন তার অবস্থা, অশরীরী। ঐ স্তরে নাদ অনাহিত, দৃশ্য অপ্রকাশিত। তাকে প্রকাশ করতে হয়। ঐ অচিহ্নিত অবস্থাতে যেসব ধ্বনি, দৃশ্য আর অর্থ উহ্য থাকে সেইগুলিকে প্রকাশিত এবং সামাজিক রূপ দিতে হলে মধ্যবর্তী স্তরগুলি অতিক্রম করতে হয়। আমার মনে হয় এই সবের আধুনিক যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা সম্ভবপর। এই ব্যাখ্যাটা মনে হয় ভাববাদী ব্যাখ্যা।

এখন বাক্যের প্রকাশিত রূপের কথা বলি। বাক্‌ মানুষের মুখে বিরাজ করছে কখনও সংবাদ রূপে কখনও সাহিত্য রূপে। সাহিত্য সম্পর্কীয় চিন্তা ভারতবর্ষে পুরাকাল থেকে হয়ে এসেছে। রাজশেখর একটা কাহিনীকে আলম্ব করে সাহিত্যের এবং সাহিত্য চিন্তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। ব্রহ্মার

প্রখ্যাত অসমিয়া সাহিত্যিক বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯২৪ সালে। 'মৃত্যুঞ্জয়' উপন্যাসের জন্য তিনি জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯৭৯ সালে। সম্প্রতি ভারতীয় জ্ঞানপীঠের 'সুবর্ণজয়ন্তী ১৯৯৪' উপলক্ষে ভারতীয় ভাষা পরিষদে আয়োজিত আলোচনা সভায় শ্রীভট্টাচার্য এই নিবন্ধটি পাঠ করেন। নিবন্ধ পাঠের শুরুতেই তিনি জানান, তাঁর জীবনের এটাই প্রথম বাংলা লেখা। নিবন্ধটি ভারতীয় ভাষা পরিষদের ডিরেক্টর ড. প্রভাকর শ্রোত্রিয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

বরে সরস্বতীর এক পুত্র হল, নাম কাব্যপুরুষ। জন্মেই এ বাঙ্ময়। মা তাকে বলল,

> শব্দার্থৌ তে শরীরম্‌, সংস্কৃতম্‌ মুখম্‌, প্রাকৃতম বাহুঃ জঘনম অপভ্রংশ। পৈশাচম্‌ পাদৌ, উরু মিশ্রম্‌...উক্তিচণম্‌ চ তে বাচঃ, রস আত্মা রোমানি ছন্দাংসি, প্রশ্নোত্তরাপ্ররহিল্লকাদিকন্‌ চ বাক্কেলি : অনুপ্রাসো পমা দয়শ্চ ত্বামলম্‌ কুর্বন্তি। **(KM-1, p6)**

শ্লোকের ভাব এই : শব্দ আর অর্থ কাব্যের শরীর, সংস্কৃত ভাষা মুখ, প্রাকৃত বাহু, অপভ্রংশ জঘন, পৈশাচ পা, মিশ্র প্রাকৃত উরু, সুনির্মিত অভিব্যক্তি বচন, রস আত্মা, ছন্দ লোম, প্রবচন ক্রীড়া আর অলঙ্কার শোভার পদার্থ। উশান ঋষি ছিলেন প্রথম কবি যিনি কবিতা লিখে কাব্যপুরুষকে বন্দনা করেছিলেন। তার পরে বাল্মিকী যিনি ছন্দ পেলেন ব্যাধের দ্বারা নিহত ক্রৌঞ্চ পাখীর শোকে মর্মাহত হওয়া অবস্থায়। তাকে বিষয়বস্তুর সন্ধান দিলেন নারদ মুনি। পরে এই বাল্মিকীর হাতেই সৃষ্টি হল আদি কাব্য রামায়ণ। এই সব কাহিনীর মধ্যে কাব্য তত্ত্ব এবং সাহিত্য তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে।

ভারতবর্ষে আমাদের পূর্বপুরুষেরা সমস্ত মানবীয় জ্ঞান কাহিনীতে আবদ্ধ করে রেখেছেন। তবু এটা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি যে কাব্যের একটা বহুভাষিক পরম্পরার ধারা পুরাকাল থেকে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। সম্ভবত মহাকাব্যসমূহ বা লোক কাব্যসমূহের মারফত এই প্রবাহ সম্ভব হয়েছে। শুরুতে মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ এই সব লোক কাব্যকে আমরা পেয়েছি মৌখিক সাহিত্যের রূপে। সূত, কুশীলব—এরা সমস্ত পাঠটা মুখস্থ করে সুর বাঁধিয়ে তাকে গাইতে শুরু করেছিল নিরক্ষর শ্রোতাদের সম্মুখে কোনও উৎসব বা যজ্ঞের উপলক্ষে। এই পরম্পরাও বেদ থেকেই শুরু হয়েছিল। এখানে কাহিনী কথন রীতি ছিল অভিনব। এক কাহিনীর মধ্যে আর এক কাহিনী। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছিলেন এই ছিল প্রাচীন ভারতীয় কাহিনী-বর্ণনার রীতি। চীনের বাক্সের মতো। সূত বা কুশীলবের একটা দল ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন নাম পরিচিত হয়ে অতীত যুগেও ছিল, এখনও আছে। আমাদের (সময় রাজ্যে) এখনও জীবন্ত হয়ে আছে ওজা-পালি অনুষ্ঠান। ওরা যে পাঠ গায়, সেই পাঠ শিষ্য ওজারা গুরু ওজা থেকে পায়। মুখে মুখেই এই পাঠ অনেক যুগ ধরেই ওজাদের মাধ্যমে চলে এসেছে—বেদের মন্ত্রের মতো। ভারতীয় সাহিত্যে লিপির যুগ শুরু হয়েছে সুদূর অতীতে। মহাকাব্য, লোককাব্য এবং পুরাণ আদির পাঠ লিপিকারেরা তালপাতায় অথবা সাঁচীপাতায় (পরে তুলাপাতায়) লিপিবদ্ধ করে পুথি প্রস্তুত করে ওই সব সংরক্ষণ করেছে পৃষ্ঠপোষকদের সাহায্য নিয়ে। একটা পুথির পাঠ আর একটা পুথির পাঠের সঙ্গে কখনও কখনও অমিল হয়—পাঠের দূর গমনের জন্য অথবা দেশ-কাল-সংস্কৃতির প্রভাবের জন্য। ধরুন রামায়ণের পাঠটা। কৃত্তিবাসী রামায়ণ আর মাধব কন্দলির রামায়ণ এক নয়। কাহিনীতে কিছু প্রভেদ হয়েছে। ব্যাসের মহাভারত আর রাম সরস্বতীর মহাভারতের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত পুরাণের আদির রূপান্তরের প্রক্রিয়া অনেক যুগ আগে আরম্ভ হয়েছে। এখন এই সব মহাকাব্য বা লোককাব্যের লিখিত রূপের সঙ্গে সঙ্গে গীত বা অভিনীত রূপসমূহের এক সঙ্গে সহ অবস্থান করে থাকা দেখতে পাই। এই সব জনপ্রিয় কাব্য ভারতবর্ষে জনগণের মনে গভীর ছাপ ফেলেছে। রামায়ণ এবং মহাভারত যখন টিভিতে ধারাবাহিকভাবে দৃশ্য কাব্য রূপে প্রদর্শিত হয়েছিল তখন সাক্ষর-নিরক্ষর ভেদে জনতা এই দুই লোক-মহাকাব্যের চরিত্রসমূহের সঙ্গে আত্মীয়তা বোধ করেছিল আর ওদের কার্য ও ব্যবহারের মাধ্যমে অনেক সহৃদয় শ্রোতা হয়ত করুণ অথবা শান্ত রসসিন্ধুতে স্নান করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু খণ্ড খণ্ড করে দেখা দৃশ্যসমূহে এমন অনেক কিছু ছিল যেসব আধুনিক জ্ঞান অথবা সাহিত্য-রুচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিবেশিত হচ্ছিল না। এসব কাব্য একসঙ্গে পড়ার যে আনন্দ তা টেলি-সিরিয়ালের দৃশ্যসমূহ হয়ত দিতে অসমর্থ হয়েছিল।

এসব কাব্যের আধুনিক ব্যাখ্যাও হয়েছে; এই সব কাব্যের কাহিনী, ঘটনা এবং চরিত্র নিয়ে আধুনিককালে নতুন সাহিত্যও রচিত হয়েছে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের **মেঘনাদ বধ** থেকে ধরমবীর ভারতীর **'অন্ধযুগ'** পর্যন্ত চলবৎ ধারার এই সাহিত্য পাঠ এবং অভিনয়ের মাধ্যমে অনেক পাঠক এবং দর্শকের হৃদয়ে রস সঞ্চার করেছে। আধুনিক জ্ঞান প্রাচীন জ্ঞান থেকে ভিন্ন হয়েছে মুখ্যত বিজ্ঞান এবং টেকনলজির প্রভাবে। মানবদেহ, মন, প্রকৃতি, সমাজ, ধর্ম, কাল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, পৃথিবী, যোগাযোগ, যান-বাহন, শিক্ষা আর শাসন আদি সম্বন্ধে আমাদের ধারণার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। অধিক কি হিংসার মাধ্যমে মতভেদ এবং বিবাদ নিষ্পত্তি করার পরম্পরাগত প্রচেষ্টা যে মূলত নিষ্ফল হতে বাধ্য এই সত্যও গুণীরা ক্রমাগত উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন। অনেক মানুষ আজকে উপলব্ধি করতে পেরেছে জাত, শ্রেণী, বর্ণ, প্রজাতি নিয়ে যে সব বিভেদ সভ্যতার মধ্যে বর্তমান সে সবের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। অনেক অসত্য আর অর্ধসত্যকে মানুষ এখনও আঁকড়িয়ে ধরে আছে। একমাত্র সত্যিকার আধ্যাত্মিকতা এবং নৈতিকতার আধার রূপে ধর্মের একটা মূল্য হয়ত আছে, কিন্তু ধর্মের এমন এটা নিকৃষ্ট এবং আফিংধর্মী রূপ আছে যেটা

হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি করে, নারীকে পুরুষের দাসী হয়ে থাকতে বাধ্য করে, সামাজিক অসমতা-অন্যায়কে ভগবানের দোহাই দিয়ে দীর্ঘ জীবন দিতে প্রয়াস করে। আমাদের দেশে ব্যক্তির দেশে ব্যক্তির মুক্তিও পূর্ণ রূপে হয়নি। দর্শনের ক্ষেত্রে সেই জন্য অস্তিত্ববাদের মতো সম্পূর্ণ ব্যক্তিবাদী দর্শন জনপ্রিয় নয় আমার দেশে। আমরা যাকে সংস্কৃতি বলি, তার অনেক ধারণাগত আধার চিরকালের জন্য নষ্ট হয়ে গেছে। এখন একটা অনিয়ন্ত্রিত রূপ নিয়ে পশ্চিমের আধুনিকতম পুঁজিবাদী অর্থনীতি আমাদের দেশে এসে উপস্থিত হয়েছে। আমার মনে ভয় হয়েছে এর ফলে সমাজে অর্থনৈতিক অসমতা এত বেড়ে যাবে যে জাতীয় সংহতি রক্ষা করা হয়ত মুস্কিল হয়ে উঠবে এবং আমাদের মতো দরিদ্র নিম্নমধ্যবিত্ত এবং আরও নিচের তলার লোকের জীবনধারণ ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে পড়বে। সংস্কৃতির এরকম অবস্থায় আমাদের সাহিত্যিকদের লেখার বিষয়ে-বস্তু এবং ফর্ম কী রকম হবে তা এখন বলা মুস্কিল হবে না।

এখন আমি দেখছি আমাদের সাহিত্য চিন্তায় ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটেছে। আমি শুরুতেই কাব্যপুরুষের কথা উল্লেখ করেছি। এই **কাব্যপুরুষের সঙ্গে সাহিত্যবিদ্যাবধূর** বিবাহ হয়েছিল বলে কথিত আছে। প্রকৃতার্থে এই বিবাহ সাহিত্য এবং সাহিত্য সমালোচনার। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের ইতিহাস পড়লে দেখা যায় সাহিত্য এবং সাহিত্য সমালোচনা সহগামী। কখনও স্বামী আগে চলে, স্ত্রী চলে পিছে। কখনও বা স্ত্রী চলে আগে, স্বামী পিছে। কখনও দেখা যায় রাস্তায় পায়ে পা মিলিয়ে স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে চলেছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে চারটি বিদ্যার নাম পাওয়া যায়: আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা এবং দণ্ডনীতি। দর্শন, বেদ, কৃষিবিজ্ঞান এবং রাজনীতি। রাজশেখর একটি পঞ্চম বিদ্যার কথা বলেছে। সেটি হল সাহিত্যবিদ্যা। (পঞ্চমী সাহিত্যবিদ্যা ইতি যাযাবরীয়। সা হি চতসৃনামপি বিদ্যানাম্ নিস্যন্দ। শব্দার্থয়ো অথবা সহভাবেন বিদ্যা সাহিত্যবিদ্যা। —**KM** pp 4-5) প্রাচীন আলঙ্কারিকরা সাহিত্যবিদ্যাকে প্রমুখ বিদ্যা বলে অভিহিত করেছে। সাহিত্যিকের প্রতিভা অত্যাবশ্যকীয় গুণ, কিন্তু এর অতিরিক্ত তার ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ মানবীয় জ্ঞান থাকারও প্রয়োজন। প্রতিভার স্পর্শে বাক্যের সাহায্যে কবিসৃষ্টি অপূর্ব জগত গড়ে তোলে কার্য-কারণের সঙ্গতিকে উত্তরণ করে এবং এই নীরস জগতকে রসের সাহায্যে করে তোলে সুস্বাদপূর্ণ। এই অবস্থাতে কবি এবং সহৃদয় একীভূত হয়ে যায়। (অপূর্বম্ যদ্ বস্তু প্রথয়তি বিনা কারণকলাম্ জগদ্‌গ্রাবপ্রখ্যাম্ নিজরসভরাৎ সারয়তি চ ক্রমাৎ প্রখ্যো পাখ্যা-প্রসরসুভগম্ ভাসয়তি তৎ সরস্বত্যাস্তত্ত্বম কবিসহৃদয়াখ্যাম বিজয়তে—10.1.p1) অভিনব গুপ্তের এই সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাখ্যা প্রাক্-বিজ্ঞান বিশেষ করে প্রাক্-ফ্রয়েড যুগের। কিন্তু অভিনব গুপ্তের প্রতিভার ধারণা এবং কোলরিজের imagination-এর ধারণার মধ্যে অদ্ভুত মিল দেখা যায়। সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ববিদের অপূর্ব জগৎ সৃষ্টির ধারণাটার এক প্রকার revealiction-এর ধারণার সঙ্গে মিল আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনন্দবাদের মূলেও এমন একটি রসমূলক উত্তরণের প্রেরণা আছে। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক সাহিত্যে পশ্চিমের সেই প্রভাব নিশ্চয় পড়েছিল; যে প্রভাব একদিন কীটসকে একটি গ্রীক পাত্রের মধ্যে অনন্তের খেলা দেখতে প্রেরণা দিয়েছিল Thou silent Form, dost lease us out of thought as doth eternity. কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে উপনিষদীয় অসীম এবং আনন্দ রসকেও উপলব্ধি করেছিলেন। নিজের দেশের লোকসাহিত্যও তার একান্ত আপন ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ছিল সকল কলার মিলনের এক সাধনা। সেইজন্য তার সাহিত্যে পাই সাহিত্য রূপের বিবিধতা, ছন্দের অপূর্বতা, প্রতিভার স্ফুরণ এবং উপলব্ধির বৈচিত্র্য।

আধুনিকতার এক নতুন পর্যায় শুরু রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষের দিকে। এই যুগে বাস্তবের অন্বেষণ চলেছিল সমাজের বিভিন্ন স্তরে, এবং মনের গহনেও। এই বাস্তবের অন্বেষণে ছিল কখনও দারিদ্র্যমুক্তি এবং মনমুক্তির কামনা। কুৎসিত, মন্দ এবং তুচ্ছ সবাই স্থান পেল তখন সাহিত্যের আসনে। ত্রিশ এবং চল্লিশ দশকের ভারতবর্ষে সমাজ, রাজনীতি, দর্শন, কলাতে যে মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল সেই দ্বন্দ্ব লেখকদের একদিকে টেনেছিল আধুনিকতার দিকে যেটার মূল সুর ছিল ব্যক্তিমুখীনতা। আর একদিকে ছিল প্রগতিশীলতার টান: এখানে সমষ্টির এসব বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা করা অসম্ভব। কিন্তু একটা কথা বলা ভাল হবে। এই যুগের যেসব সাহিত্য ধারা, সেইসব ছিল বিশ্ব সাহিত্যের যুগে আমাদের দেশের দ্বন্দ্বময় পরিবেশে সৃষ্ট। আমরা যারা এ যুগের সাহিত্য সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করেছি তাদের মনে নতুন নতুন সাহিত্য দৃষ্টির উদয় হয়েছিল। একটা ছিল রোমান্টিকতার পরের যুগের symbolist, imagist এবং অন্যান্য সাহিত্য চিন্তার ধারা। সঙ্গে সঙ্গে ছিল বাস্তবতা এবং সমাজবাদী বাস্তবতার ধারা। এইসব ধারার প্রভাবে গল্পে, কবিতায়, উপন্যাসে, প্রবন্ধ সাহিত্যে যেসব ভাব এবং ফর্মের পরিবর্তন হয়েছে তার রূপ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার সাহিত্যে ভিন্ন ভিন্ন। কোনও কোনও ভাষায় এইসব পরিবর্তনের ধারা পৌঁছেছে স্বাধীনতার পরে। কোনও কোনও ভাষায় তেমন কোনও ফর্মের পরিবর্তন হয়নি।

ষাটের দশক থেকে লেখকদের মধ্যে দেখেছি

উত্তর-আধুনিকতার যুগে প্রবেশ করার **একটি** সাহিত্যিক চেতনাবোধ। এই চেতনাবোধ ইউরোপের লেখক-দের উত্তর আধুনিকতার সম পর্যায়ের নয়। কেউ নিজের সাহিত্যের পরম্পরার মধ্যেই খুঁজেছে সৃষ্টির নতুন আলম। কেউ খুঁজেছে দীর্ঘ কবিতায় বা মহাকাব্যে। কেউ খুঁজেছে magic realism-এর মতো একটা স্বকীয় ভারতীয় realism-এর ধারা যার মাধ্যমে ভারতের বর্তমান কুৎসিত জটিল সামগ্রিক বাস্তবতাকে চিত্রিত করা সম্ভব হয়। কবিতায় কোনও নতুন ফর্মের উদ্ভব হয়নি এ যুগে। বরং the narrative এবং the descriptive এসব ফিরে এসেছে কবিতায়। নাটকেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনেক হয়েছে। নাটকের ক্ষেত্রে একটা তাৎপর্যপূর্ণ দ্বন্দ্ব হল: প্রসেনিয়াম স্টেজ থাকবে না ভারতের পরম্পরাগত নাট্য-রীতির পুনর্প্রয়োগ চলবে? ব্রেখ্‌টের প্রভাবে একটা নব্য নাটক রীতিও প্রচলিত হয়েছে। তবু বলতে হবে: নাটকের মধ্যে সবচেয়ে বড় দ্বন্দ্ব হল একটাই। **নাটক মূলত সাহিত্য না অভিনীত বস্তু?** সাহিত্যের ক্ষেত্রে আর দুটি সমস্যা জটিল হয়েছে। আজকে সাংবাদিকের লেখা সাহিত্যের কৌশল ধার করে সাহিত্যের পোশাক পড়ে আমাদের কাছে অভিনব রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছে। সাহিত্যিক পুরস্কারগুলোও একটা মূল্যবোধের সংকট সৃষ্টি করেছে। পুরস্কারগুলোর যারা বিচারক তারা কী ধরনের সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করেছে? এই বিচারে তুলনামূলক সাহিত্যের অনুসন্ধান পদ্ধতির যেমন একান্ত প্রয়োজন, তেমন প্রয়োজন সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা। আর একটা সমস্যা ধীরে ধীরে আমাদের সামনে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতবর্ষের সাহিত্যে সনাতন মৌখিক সাহিত্যের ধারাটা এখনও প্রবহমান। আধুনিক গণমাধ্যম টিভি আদির মাধ্যমে এই ধারাটা অধিক শক্তিশালী হবে কি মৌখিক সাহিত্য লিখিত সাহিত্যের প্রাধান্য মেনে নেবে? এইসব সমস্যা আধুনিক কালের সমস্যা। এইসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়।

বহুভাষীয় একটি ভারতীয় সাহিত্যের রূপ স্পষ্ট করবার জন্য একটি সাধনা আরম্ভ হয়েছে স্বাধীনতার পরে। একটি সামগ্রিক ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস রচনার কাজ সাহিত্য অকাদেমি হাতে তুলে নিয়েছে। অন্য প্রতিষ্ঠান আর লেখকরাও এই কাজে অংশ গ্রহণ করেছে। এই জাতীয় কাজের অংশবিশেষ রূপে Whos Who of Indian Literature, The Makers of Indian Literature Series আদি অনেক গ্রন্থ বেরিয়েছে। তবু একটা কথা বলতেই হবে। একটি বৃহৎ এবং অত্যন্ত জরুরী ক্ষেত্রে ভাল করে কাজ হয়নি। সেটা হচ্ছে অনুবাদের ক্ষেত্র। একটি ভারতীয় ভাষায় যেসব মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সেই সব গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অন্য সব ভারতীয় ভাষায় যখন সার্থকভাবে অনুদিত হবে তখন প্রত্যেক ভাষার সাহিত্য প্রকৃতার্থে ভারতীয় হয়ে দাঁড়াবে। এটা আমার স্বপ্ন।

আপনারা হয়ত বলবেন এই সব সাহিত্যিকের কাজ নয়, সাহিত্যসেবীদের কাজ এবং সমালোচকদের কাজ। একদিক থেকে তা ঠিক। কিন্তু আমি অন্নদাবাবুর একটা কথা এখানে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। জাপানীরা নিজ ভাষায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অনুবাদ করে নেয়। ফলে ওরা সেক্সপীয়র এবং টলস্টয়-রবীন্দ্রনাথকেও আপনার করে নিয়েছে। ইংরাজি ভাষা-ভাষীরাও তাই করেছে। সাহিত্য শব্দটার অর্থই হচ্ছে নৈকট্য, সম্মিলন। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন: মানুষকে মিলতে হয় নানা প্রয়োজনে, আবার মানুষকে মিলতে হয় কেবল মেলবারই জন্যে অর্থাৎ সাহিত্যেরই উদ্দেশ্যে। অনুবাদের মাধ্যমেও এই মিলন ঘটে।

বাক্-সংস্কৃতির অর্থ তাই ব্যাপক। একদিক দিয়ে দেখলে তাকে মৌখিক সাহিত্য বা কলা রূপে দেখতে পারি। এই সাহিত্যের পটভূমিতে যেহেতু সমস্ত মানবীয় জ্ঞান বা ব্যুৎপত্তি থাকে তাই সাহিত্যিকদের সৃষ্টি প্রতিভার প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির জ্ঞানও লাভ করতে হয়। আর এক দিক থেকে দেখলে সাহিত্য হল সংস্কৃত জিনিস। বিশেষ করে লিখিত সাহিত্য। সংস্কৃতি শব্দটার অর্থটাই হল সংস্কার করা, সংস্কৃত করা। আত্মানং সংস্কুরুতে। ভারতীয় সাহিত্যে বাক্ সংস্কৃতি কখনও ঐতিহ্য রূপে, কখনও আধুনিকতা অথবা সমসাময়িকতা বা তুলনামূলকভাবে স্থায়ী রূপ নিয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়। ইহার একটা রূপ দ্বৈত Tradition এবং modernity-র সমন্বয়। ওখানে বিচ্ছেদও হয়, মিলনও হয়। আমাদের যুগে আমরা তার কী করে সমন্বয় সাধন করি সেটাই হচ্ছে আমাদের একটা প্রধান জিজ্ঞাসার সমস্যা।

সংস্কৃতি এবং সাহিত্য উভয়েই প্রবহমান নদীর মতো। এই প্রবাহ যত দিন পর্যন্ত মানব সভ্যতা থাকে তত দিন পর্যন্ত চলতেই থাকবে। আজকাল ভারতীয় সাহিত্যের যে ধারণা আমরা গ্রহণ করেছি তাতে সকল ভারতীয় ভাষার সামগ্রিক লোক সাহিত্যকেও ধরতে হয়। এখানে আমার কিছু বলবার আছে। অসম এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের জনগোষ্ঠীদের মধ্যে অনেক অপূর্ব জন বা লোক সাহিত্য এখনও জীবন্ত রূপে বিদ্যমান। এইসব লোক সাহিত্য এখনও প্রধানত মৌখিক সাহিত্যের রূপেই বর্তমান। এসব লোকসাহিত্যের সংগ্রহ, এবং প্রকাশ করার জন্য প্রভূত মানব এবং বস্তুগত সম্পদের প্রয়োজন। বিষয়টা প্রত্যেক ভারতীয়র কাছেই একটা কাজের প্রত্যাহ্বান। যতদিন পর্যন্ত এসব লোকসাহিত্য যথার্থরূপে ভারতীয় সাহিত্যের অঙ্গীভূত না হয়, তত দিন পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব ভারতের জনতার মনে alienation-র ভাব সজীব হয়ে থাকবে।

পাপের অভিজ্ঞান

মীনাক্ষী ঘোষ

"You are too good to be an artist"—আমার চেয়ে অন্তত পনেরো বছরের ছোট ছেলেটির মুখে এ সংলাপ শুনে আমি অবোধ চোখে চেয়ে রইলাম।

প্রায় আড়াইমাস আগে আর্ট গ্যালারিতে আমার ছবির একজিবিশন-এ পরিচয় হয়েছিল। আমার মামাতো ভাই সবুজ বলেছিল—"মরমীদি, এ আমার সাহিত্যিক বন্ধু দেবরঞ্জন।" আমি প্রশ্ন করেছিলাম, "ছবি কেমন লাগল?" একটু ভাবনার পর তার উত্তর — "সুন্দর। কিন্তু বিষয়বস্তুগুলো একপেশে। সব ছবির চরিত্রই নারী, কোথাও পুরুষ নেই কেন?" মনে মনে ছেলেটির পর্যবেক্ষণকে তারিফ করলাম, বললাম, "এইবার আঁকব।"

কিছুদিন ধরে ভাবছি এবার পুরুষ মানুষকে আঁকবার মতো বয়েস হয়েছে আমার। মধ্য বয়েসের নিরাপদ গণ্ডিতে পৌঁছে বর্তমানে বেশ মনোযোগ দিয়ে পুরুষদের লক্ষ করতে শুরু করেছি। দৃষ্টিতে আর চুরি-চামারির প্রয়োজন বোধ করি না। দেবরঞ্জনকেও সেদিন মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে ভাবছিলাম—যেমন সুন্দর চোখের সেপ্ তেমনই এক্সপ্রেশনের বৈশিষ্ট্য। একখানা ছবি আঁকতে পারলে বেশ হয়। ছেলেমানুষ একেবারে, একে তো অনায়াসে বলা যায়—'একখানা ছবি আঁকব তোমার'।

আজ অবধি কথাটা বলা হয়ে ওঠেনি, যদিও সেই আর্ট-গ্যালারির পরিচয় গড়িয়ে এসেছে আমার ঘরের ভিতর। দেবরঞ্জন আমার চেয়ে অনেকটা ছোট হলেও ওর সাথে গল্প চলে ঘন্টার পর ঘন্টা। তখন মনে হয় বয়স সব সময় মানুষকে তরুণ বা প্রৌঢ় করে না। শরীরটা যে পরিমাণে সময়ের দাস মনটা সে পরিমাণে নয়। বয়েসের হিসাবে গোলমাল হওয়াতেই বারে বারে থমকে যাচ্ছে কি আমার ভিতরের ছবি আঁকবার ইচ্ছেটা?

পুরুষমানুষের ছবি আঁকার ইচ্ছে প্রকাশ করাতে একবার আমার স্বামী বলেছিলেন, "আমিই তো রয়েছি তোমার সামনে, আমাকে আঁক।" আমার শিক্ষাগুরু প্রস্তাবটা শুনে সস্নেহে হেসে বলেছিলেন, "বানাতে পার। তবে সে সবই তোমার শওহর-এর তসবীর হয়ে উঠতে চাইবে। দুসরা কুছ বনানা মুস্কিল। পুরুষ চরিত্রের গহরাইকে তুমি শায়দ ঐ তরিকাতে ছুঁতে পারবে না। শওহর, আওলাদ, আশিক—সভী মোহবন্ধনের বাহর থাকতে হয় শিল্পীকে। তভীতো মিলবে সৃষ্টির রাস্তা আউর আনন্দ্।"

গুরুজীর কথাটা ঠিকমতো অনুভব করতে পারিনি। তবে স্বামীর ছবিও আঁকা হয়নি।

সকালে অফিস যাবার আগে স্বামীকে বলে রেখেছি "পুরুষ চরিত্র নিয়ে একটা ছবি প্লট মাথায় এসেছে। আজ দেবরঞ্জন আসবে। ভেবেছি ওকে—"

—"ওকে বলে রেখেছ তো? ও রাজী হয়েছে তোমার সামনে মূর্তি হয়ে বসে থাকতে? যা বিরক্তিকর কাজ।" আমি নিশ্চিন্ত ভাবে বলেছি, "আগে থাকতে আর বলিনি। ঐটুকু ছেলে আমার মুখের ওপর না করতে পারবে না।"

দেবরঞ্জন যথাসময়ে এসেছে। কিন্তু ওকে আজও বলা গেল না 'আমার স্টুডিও ঘরে এস, তোমাকে আজ ছবি হতে হবে।' তার কারণ চা-এর কাপ হাতে নিয়েই দেবরঞ্জন ঐ পাপ প্রসঙ্গের অবতারণা করল—"শিল্পী হবার পক্ষে বড় বেশি কলুষশূন্য আপনি। Too good to be an ....!" আমি দেখছি ভুবনভুলানো দুই চোখে রহস্যের তাঁবু। সে তাঁবুতে ঢুকতে না পেরে অসহায় ভাবে প্রশ্ন করলাম, "তার মানে কী হে ইয়ং রাইটার? শিল্পী হতে হলে বদ চরিত্র হতে হয় বুঝি?" দৃষ্টির নিবিড় ছায়া আমার সমস্ত শরীরে বিছিয়ে দিতে দিতে সে বলল, "শিল্পীকে পাপী হতে হয়; নইলে জীবনকে দেখা যায় না, তার বৈচিত্র্যকে জানা যায় না।"

এ আবার কেমন থিয়োরি? আমার বৃদ্ধ গুরুর নির্বেদ মুখ মনে পড়ল। বলতেন, শিল্পীকে নাকি পাপপুণ্যের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। পাপপুণ্যের বাইরে দাঁড়াবার শক্তি মানুষের আছে কিনা আজও আমি জানি না কিন্তু ব্যাপারটাকে তত্ত্বগতভাবে বুঝতে পারি। শিল্পী হয়ে ওঠার জন্য এ কোন্ ধরনের পাপের

শর্ত আমার সামনে আজ রাখতে চাইছে দেবরঞ্জন যা আমি গুরুর কাছ থেকে শিখিনি? একজন পুরুষ (তা সে যে বয়েসেরই হোক) একজন নারীকে যখন পাপের পাঠ দেয় তখন সেই পাপের একটা বিশেষ চরিত্র থাকে কি? ঐ বিশেষ ধরনের পাপের আশঙ্কায় আজ পর্যন্ত পুরুষকে ক্যানভাসে তুলতে পারিনি আমি। পুরুষ আমার বড় প্রিয়। বড় সহজে মোহ জাগায় তারা আমার প্রাণে। কতবার কত পুরুষ মানুষকে দেখে ইচ্ছে হয়েছে বলি—'আমার সামনে বস, তোমায় আঁকি'। কিন্তু এই মধ্য বয়েস পর্যন্ত সে-কথা উচ্চারণ করবার সাহসই হয়নি। ছেলেবেলা থেকে শুচিতার যে সংস্কার আমার সামাজিক রক্তে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে তারই জন্য কেবল ভয় পেয়েছি—পাছে পাপ ঘটে যায় সাধনার তপোবনে।

সে-রাত্রে আমার স্বামী অফিস থেকে ফিরে আমার স্টুডিওতে এসে বললেন, "কই, কতদূর আঁকলে দেখি। দেবরঞ্জন কতক্ষণ সময় দিতে পারল?" দেবরঞ্জনের জন্য রেডি করে রাখা ক্যানভাসটার খালি বুকে হাত বোলাতে বোলাতে অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলাম, "আজ আঁকা শুরু করা যায়নি।"

॥ ২ ॥

ক্যানভাসটা খালিই এখনও। আমার স্বভাব এইরকমই। কোন একটা বিশেষ পরিকল্পনার জন্য রেডি করা ক্যানভাসে আমি অন্য কোন ছবি এঁকে ফেলতে পারি না। কতবার কোন নির্দিষ্ট ছবির জন্য চিহ্নিত ক্যানভাস খালি পড়ে থেকে অপেক্ষা করে গেছে বছরভোর।

আজকাল স্টুডিওরুমে ঢুকলেই শূন্য ক্যানভাসটা আমার হৃদ্‌পিণ্ডে যেন চিন্তার বোর্ডপিন ঠুকতে থাকে। নিঝুম রাতে তুলি হাতে কতবার বসে থেকেছি আমি ওটার সামনে। যন্ত্রণার জ্বলন্ত শিখায় সময় গলে গলে পড়েছে। আঁকা হয়নি এক বিন্দু।

ভর দুপুরে ঘুম ভাঙিয়ে, বিনা খবরে দেবরঞ্জন এসে হাজির। ও এইরকমই আসে আজকাল, বলে, "আপনাকে সারপ্রাইজ দিতে ইচ্ছা করে।" আমিও প্রত্যেকবার ওকে দেখে অবাক হয়ে বলি, "ওমা, তুমি যে! এস এস।" তারপর আরও অনেকটা বেশি অবাক হই নিজের ভিতরের খুশির পরিমাপ দেখে।

দেবরঞ্জন একলা নয় আজ। ওর সঙ্গে সবুজ। সবুজের মধ্যে সব সময় ছটফটানি। ঘরে ঢুকেই বলল, "চা খাওয়াও মরমীদি। বেশিক্ষণ বসব না। গার্লফ্রেন্ডের বাড়ি যাওয়া আছে।"

সবুজের গার্লফ্রেন্ড একজন বিবাহিতা মহিলা। সবুজের চেয়ে বয়েসে বেশ খানিকটা বড়। বাড়ির লোকজন শত চেষ্টাতেও ছাদনা তলায় ঢোকাতে পারেনি সবুজকে। ওর একটাই জবাব 'বিয়ে ফিয়ে বড্ড ঝামেলার ব্যাপার, ওর মধ্যে আমি নেই।' আমি এতদিন ওকে যে-কথা বলিনি আজ ফস্ করে তাই বলে বসলাম, "হ্যাঁরে সবুজ, তোর গার্লফ্রেন্ড ম্যারেড কেন? এ তো পাপ।" তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে জবাব দিল সবুজ, "ধুস্। পাপ কেন? ও-ও তো স্টেডি বয়ফ্রেন্ড খুঁজছিল। একই স্বামীর সাথে অনেককাল থেকে থেকে ওর বোর লাগছিল। আজকাল এরকম ধরনের রিলেশনশিপ এ অনেকেই আগ্রহী।"

সবুজের শেষ সংলাপ আমার মাথার মধ্যে একটা নতুন চিন্তার স্কেচ তৈরি করতে লাগল। আজকাল তাহলে এরকম একটা কাঠামোতে এসে দাঁড়িয়েছে নারী এবং পুরুষের প্রেম সম্পর্ক! অথবা প্রেম শব্দটাই এখন ব্যাকডেটেড? আমি চুপ করে বুঝবার চেষ্টা করতে থাকি 'আজকাল এরকম ধরনের রিলেশনশিপ'-এর গভীরতা, বিস্তৃতি এবং ফলাফল সম্পর্কে। দেবরঞ্জন বলে ওঠে, "একটি মনের মত নারী এই পৃথিবীতে দুর্লভ। সেখানে ম্যারেজ নামক আইনটা অত্যন্ত খেলো।"

আমি চা বানাতে উঠে গেলাম। রান্নাঘরে ওদের আলাপ আলোচনার প্রতিটি শব্দ ভেসে আসছে। সবুজ একটা নামী কাগজের ফোটোগ্রাফার। পাক্কা বোহেমিয়ান। দেবরঞ্জনের সাথে ওর গল্পের সুর সহজেই মিলে গেছে। ফোটোগ্রাফি, সাহিত্য এবং শিল্পাঙ্কন সম্পর্কে কথা বলতে বলতে ভ্যানগগ, গগ্যাঁ প্রভৃতির অনিয়মিত জীবন বৃত্তান্তে চলে গেছে ওরা। শুনতে পাচ্ছি দেবরঞ্জনের মন্তব্য "বড় বড় শিল্পীরা ভ্রষ্টাচারী, আসলে কিন্তু তাঁরা স্বেচ্ছাচারী। ক্রমাগত নিয়মকানুনে জীবনকে জড়িয়ে রাখতে চাইলে জীবনের স্বাভাবিক গতিবেগ নষ্ট হয়ে যায়।" কথাটা প্রায় লুফে নিয়ে সবুজ বলে, "একজ্যাক্টলি। শিল্পীরা, সাহিত্যিকরা হবে বোহেমিয়ান। বাঁধা গতে চলতে চাইলে তাদের সৃষ্টির ধার ভোঁতা হয়ে যায়। গতানুগতিকতার বেড়া ভাঙতে হয় আর্টিস্টকে।"

আমি কাপে চা ঢালতে ঢালতে ভাবি শিল্পীরা অধিকাংশই তো পুরুষ। তার কারণ কি পুরুষেরা স্বভাবতই বোহেমিয়ান—শিব ঠাকুরের জাত? ঘর-গেরস্থালি-সমাজ প্রভৃতিকে বাঁধতে বাঁধতে নারী তবে কি নিজের আত্মাকেও বদ্ধ করে ফেলেছে! কিন্তু আমি যে সৃষ্টি করতে চাই। কারাগার যদি তৈরি করে থাকি, তবে তাকে তো ভাঙতেই হবে।

পরিপাটি রান্নাঘরের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি—এ যেন সযত্নে আঁকা একখানা ছবি। এতটুকু অবহেলায় কোথাও পড়ে নেই একছিটে বেমানান রঙ। ঐ যে তাকের ওপর সাজানো রয়েছে একরঙা শিশিদের সারি, ঐ লাইনটুকুতে পর্যন্ত এতটুকু ভাঙচুর আমাকে পীড়া দেয়। তবে কোন্‌খানে আমাকে ভাঙতে হবে। কোথায় আমার কারাগারের দেওয়াল তাইতো বুঝতে পারছি না।

আমার মা বলতেন "ভাঙা খুব সহজ। গড়াই কঠিন।"

'ভাঙা' শব্দটা পাপের মতই অস্পৃশ্য ছিল আমার কাছে এতদিন। আজ দুই তরুণ স্রষ্টা আমার বিশ্বাসের দেওয়ালে মস্ত একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন খোদাই করে দিল। "গড়তে গেলে ভাঙতে হয়। ইমারত তুলবার সময় ভিত্তি স্থাপনের জন্য ভূমির বুক ভাঙতে ভয় করলে চলে না।"—ভেসে আসছে তরুণ সাহিত্যিকের সংলাপ। আমি কাতর হয়ে ভাবি কে আমায় চিনিয়ে দেবে আমার নিজস্ব ভাঙনের ভূমি।

চা খাওয়া শেষ হতেই উঠে পড়ল সবুজ, "তুই বস। গার্লফ্রেন্ডকে দক্ষিণাপণে নিয়ে যাব বলেছি। সামনেই ওর জন্মদিন। আমি এখন আসি।" সবুজ চলে যাবার পরে দেবরঞ্জনকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার গার্লফ্রেন্ড নেই?" ও বলল, "এতদিন দরকার মনে করিনি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমারও চাই কাউকে।" আমি চমকে উঠলাম। দেবরঞ্জনও কি সবুজের মতোই মনে করে বিবাহিতা গার্লফ্রেন্ডই সবচেয়ে সেফ, সঙ্গ সুখ আছে অথচ দায় ঝামেলা নেই? গম্ভীর মুখে বললাম, "তোমার বন্ধু বিয়ে করেনি কারণ ও দায়িত্ব এড়াতে চায়। এতে কোন মহত্ব নেই।" দেবরঞ্জন আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল, "আপনি হাসালেন। দায়িত্বের চেহারা কি চিরকাল একই ধরনের থাকবে নাকি মানুষের সমাজে? গ্যাস, ফ্রীজ, ইনফ্রা-ওভেন পেয়ে এ যুগের মহিলারা সব ফাঁকিবাজ হয়ে গেছেন কি? আপনারা কি সব ভীষণ অলস হয়েছেন? অথবা আপনারা অন্যতর দায়িত্বের মধ্যে নিজেকে বিকশিত করবার সুযোগ পাচ্ছেন, যা আপনার মা ঠাকুমারা পাননি, পারেননি। বিয়ের ডেফিনেশন যদি বদলে না নেওয়া যায় তবে ওটা অচল পয়সার মতো হতে থাকবে ক্রমশ, হতে শুরুও করেছে। স্ত্রীপুরুষের সম্পর্কটাকে যে স্টেপ-এ পাপ মনে করা হত, এখন আর সেই স্টেপ পাপ নয়। এটা আপনি মানেন তো?" ইয়ং রাইটার আমার ভিতরের কংক্রিট কঠিন বাঁধটার গায়ে ডায়নামাইট চার্জ করছে বুঝতে পেরে সতর্ক হলাম—"বুঝলে সাহিত্যিক, পাপ বড় বেশি সুখ দেয় মানুষকে। এইজন্য সকলেই নিজস্ব যুক্তি খাড়া করে পাপের পক্ষে। যারা ভীতু বা বোকা, যারা পাপকে রঙচঙ লাগিয়ে ফোকাস লাইটের সামনে আনতে পারে না, তারাও কষে পাপ করে। তারপর গীর্জায় যায় কনফেশনে, মন্দিরে যায় দান করতে, যাতে পাপের ফলকে ভোগ করতে না হয়, অথচ পাপকে উপভোগ করা যায়। পাপের ফল ভয়াবহ বলে তো আর পাপের আপাত সুখকে এড়িয়ে যাওয়া সহজ নয়।" আমার কথা দেবরঞ্জনকে স্পর্শ করল না; সে বলল, "যে সুখ হাতের কাছে তাকে এড়িয়ে যাওয়া বোকামি। আমি নগদ কারবারে বিশ্বাসী। আমার কাছে আজকের দিনটাই সবচেয়ে দামী, আগামী দিনে যখন জীবনেরই কোন গ্যারান্টি নেই। আপনার ঐ বস্তাপচা থটস্‌গুলো থেকে বেরিয়ে আসুন ম্যাডাম।"

॥ ৩ ॥

শূন্য ক্যানভাসটা যেন আমার মৃত গুরুজির নীরব, নির-অবয়ব আত্মার মতন। আমি তার সামনে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করি—'কোন্‌খানে বাজছে অদৃশ্য শৃঙ্খল দেখিয়ে দাও হে। আমি যে কেবলই বদ্ধ হয়ে পড়ছি। অপেক্ষায় অপেক্ষায় বিবর্ণ হতে থাকা ক্যানভাসের জমিতে একটি আঁচড়ও সৃষ্টি করতে পারছি না। এক ফোঁটা রঙ উপহার দিতে পারিনি ব্যাকুল অঞ্জলিতে তার। আরও কতকাল আমার এই অন্ধকার কারাগারে বাস? আমি সইতে পারছি না এ যন্ত্রণা। মুক্তি দাও হে। মুক্তি দাও....'

দেবরঞ্জন মাঝে মধ্যে আসে, বলে, "আপনার আকর্ষণ বড় দুর্বার"। অমনি আমার সমস্ত চেতনা ভ্যানগগ-এর আঁকা দারুণ সোনালি রোদে লুটোপুটি খেতে থাকে। ও বলে, "যখন এসে বসি আপনার কাছে তখন মনে হয়, কোন নারীর সঙ্গ আমাকে এতখানি আরাম দেয়নি" — শুনতে শুনতে সিজনের আঁকা স্নিগ্ধ সুন্দর ল্যান্ডস্কেপের ছায়ায় হেঁটে হেঁটে যেন বহুদূর চলে যেতে থাকি আমি। তারপর একসময় হঠাৎই মনে পড়ে যায়, যে কোন নারীই কতকগুলো বিশেষ সংলাপ পুরুষের মুখ থেকে শুনতে ভালোবাসে, কিন্তু অতি অল্প পুরুষ মানুষেরই সে-সব সংলাপ আয়ত্তে থাকে। আমি হেসে দেবরঞ্জনকে বলি, "ইয়ং রাইটার, ইউ আর এ্য লেডি কিলর।" দেবরঞ্জন প্রসঙ্গ বদলে বলে, "নতুন কী ছবি আঁকলেন?"

অমনি আমার মাথা থেকে মুছে যায় ভ্যানগগের উজ্জ্বল সূর্যমুখী আলো। সিজানের আঁকা বিদেশি গাঁয়ের নরম সবুজ পথ ছেড়ে ফিরে আসি ভয়ঙ্কর ফাঁকা ক্যানভাসের গুহায়। মনে মনে আর্তনাদ করতে থাকি, 'আমায় মুক্তি দাও হে....'

এক একদিন আমি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এ চলে যাই। কখনো পাথর বাঁধানো রাস্তার পাশে বলশালী গাছের মাথায় মৃত্যুর মতো শকুনের ঝাঁকের দিকে চেয়ে, কখনো বা সমাধি সৌধের চূড়ায় বেগবতী জীবনের ছন্দে ডানা উড়িয়ে দেওয়া পরীমূর্তির পানে দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে আমি নতুন ছবির বিষয়বস্তু খুঁজে বেড়াই।

এক মেঘ-মিঠে দুপুরে এমন একটি অভিযানের সঙ্গী হল দেবরঞ্জন। বের হবার মুখে ওর সাথে দেখা। ডেকে নিলাম আমি—"যাবে নাকি হে আমার আমার সঙ্গে?"

মেঘলা-ছাতা মাথায় নিয়ে দুজনে বসেছি জলাশয়ের বাঁধানো পাড়ে রুমাল বিছিয়ে। গল্পের গাড়ি চলেছে স্টেশন বদলে বদলে — শিল্প, সাহিত্য, পরী, শকুন। বর্ষার অপেক্ষায় থেকে থেকে জলের উপবাসী শরীর শীর্ণ হয়ে গেছে। আমাদের পায়ের বেশ খানিকটা নীচে, ঢালু পাড়ের প্রান্ত রেখায় এতটুকুন একটা গাছ। সেই একরতি গাছে আবার আকাশের শুকতারার

চেয়েও একাকী-সুন্দর একটি হলুদ ফুল। লেবেল নেমে যাওয়া জলটা বাতাসের দম ভরে নিয়ে অল্প অল্প ঢেউ-এর আঙুল তুলছে বটে কিন্তু কিছুতে ছুঁয়ে যেতে পারছে না বৃক্ষাণুর তৃষিত শরীর। এমন বিস্ময়কর একটি ফুল প্রসব করেছে ও আজকে; সদ্য প্রসূতির দেহ এক ফোঁটা জলের স্নিগ্ধতা পাবার জন্য একেবারে হা-হা করছে। আহারে!

ঢালু পাড় বেয়ে নীচে নামতে থাকি আমি। দেবরঞ্জন বিস্মিত হয়—"কোথায় নামছেন? পড়ে যাবেন যে!" আমি জবাব দেবার চেষ্টা মাত্র করি না। গাছেদের কান্না সবাই তো শুনতে পায় না। জলাশয়ের প্রান্তে পৌঁছে, শরীর নুইয়ে ফোঁটা ফোঁটা জলে খুব সাবধানে নাইয়ে দিতে থাকি ফুলবতীর উত্তপ্ত দেহ। সেই সময়ে ইঞ্চি দুয়েক লম্বা অস্তিত্বটুকুর জন্য আমার একবুক মমত্ব। অল্প কয়েকটা মিনিট শুধু আমি আর গাছ; গাছ আর আমি। ওর তৃষিত ডাল-পাতা ক্রমশ সজল, শীতল, সুখী হয়ে উঠছে, নাকছাবির মত ছোট্ট ফুলটা খুশিতে উজ্জ্বলতর — এসবই আমি অপার বিস্ময় আর অগাধ মুগ্ধতায় নিরীক্ষণ করছিলাম, উপভোগ করছিলাম। হঠাৎই চোখ পড়ল দেবরঞ্জনের দিকে। দেখলাম তার দুচোখ জুড়েও ঘনিয়েছে মধুর মুগ্ধতা, তার দৃষ্টিতেও গভীর উপভোগ। গাছকে নয়—গাছের সাথে জড়ানো একটি মুগ্ধ, মগ্ন নারীকে সে ভালোবাসছে সেই মুহূর্তে। তারপরেই সে উচ্চারণ করে বসল এতদিনের অনাহত সংলাপ—"আপনাকে আদর করতে ইচ্ছা করছে। ভীষণ এই মুহূর্তে।"

দলছুট হরিণের মতো আমি থমকে গেলাম। দেবরঞ্জনের কথা শুনে নয়, নিজেরই ভিতরের আওয়াজে। ভিক্টোরিয়ার জলের দোলনা আমার হৃদ্‌পিণ্ডে ঢুকে পড়েছে। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি জোরদার শব্দে রক্তের ঢেউ ভাঙছে—ছলাৎ, ছল্। এই কি তবে পাপের শব্দ? এই কি আমার ভাঙনের কিনারা? মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললাম, "দেবরঞ্জন, এবার বাড়ী যাব।" আমার ফেরানো মুখ দেবরঞ্জনকে সাহসী করে তুলছে। সে উঠল না। অসাবধানে উল্টে যাওয়া প্যালেটের রঙের মতো সে লেপটে রইল সিমেন্টের ওপর। বলল, "স্পর্শ ছাড়া ভালোবাসার মহল গড়া যায় না। প্লেটোর প্রেম তত্ত্ব যে মানে সে হয় পাগল, না হলে নপুংসক।"

আমি শ্বেত পাথরের নিথর সমাধি-সৌধের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবি, পাপ মানে কি কিছু বে-আইনী স্পর্শ? ছেলেবেলায় ব্যাডমিন্টন খেলতাম ভাই-এর বন্ধুদের সাথে। একদিন কী নিয়ে যেন খেলুড়েদের মধ্যে ভারি গোলমাল বেঁধে গেল। সেই কাক-চিল ঝগড়া সামাল দিতে না পেরে আমি 'খেলব না যা' বলে যেই ঘরমুখো হাঁটা দিয়েছি অমনি সোমনাথ আমার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলেছিল, "বা-রে, খেলব না বললেই হল।"

সেই এক লহমার পুরুষস্পর্শের প্রায়শ্চিত্ত বড় সহজে মেটেনি। লনের কাছেই মস্ত বারান্দায় জগদ্দল ডেকচেয়ারে বসে রোজ বিকেলে বড় জ্যেঠি আমাকে পাহারা দিতেন। সোমনাথের কাণ্ড দেখে লাল, খর্‌খরে মুরামের মত চোখ করে বললেন, "মরমী, ঘরে এস।" বিস্তর ধমকধামক এবং অসহায় অশ্রুধারায় বিক্ষত সেই সন্ধ্যা আজও স্মৃতিতে উজ্জ্বল রয়েছে। সে সময়ে সেই ঘোর অপরাধী, দারুণ লম্পট, নারী ধর্ষণকারী পুরুষসিংহটির বয়েস ছিল বারো এবং অবৈধ পুরুষ স্পর্শে কলুষিতা নারীর বয়েস এগারো। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত মেনে এসেছি স্পর্শের গণ্ডি।

"স্পর্শের প্রয়োজন যদি একেবারেই কম তবে জল দেবার সময়ে গাছটার গায়ে আপনি আঙুল বোলালেন কেন?" দেবরঞ্জন দৃষ্টির কম্পাসে আমাকে বিঁধে বিঁধে চলেছে—"ভেবে দেখুন, আপনি এক পলকের জন্য শুধু ভালোবেসেছিলেন ওকে, কয়েকটা সেকেন্ড কেবল মুগ্ধ হয়েছিলেন ওর ফুল পাতার বাহার দেখে। সেই এক পলকের ভালোলাগার মধ্যেও স্পর্শের আকাঙ্ক্ষা কত গভীর! সেই জন্যই তো আপনি পালকের মত হাল্কা হাতে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ওকে আদর করছিলেন। স্পর্শ-ইচ্ছা খুবই স্বাভাবিক। আপনি যাকে পাপ মনে করছেন তা আসলে পাপ নয়, প্রকৃতি।"

প্রজন্মে প্রজন্মে পাপের সংজ্ঞা কত বদলে যায়। কিন্তু একই নারী কি এক জীবনে বার বার জন্ম নিতে পারে? তাই আমি নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টায় হস্টেল-প্রবাসী সন্তানের মুখ মনে করার সাধনা করি। সে-মুখ ওয়াশ-পেন্টিং এর মতো বড় সুদূর এবং বড়ই অস্পষ্ট দেখায়। মাতৃগামী রাজা ঈদিপাস-এর মা-এর কথা মনে পড়ে যায়। কী ছিল তার বুকে—কেউ কি জানে সে কথা? আমার প্রতি অঙ্গ ঘামছে, কাঁপছে। আমি কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করে বলি, "একমাত্র মানুষই পারে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে। সেখানেই সে অন্য সব প্রাণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।"

ভিক্টোরিয়া থেকে বাড়ীতে ফিরে সোজা ঢুকি স্টুডিওতে। সেই ক্যানভাস খানা স্ট্যান্ড থেকে খুলে খবরের কাগজে মুড়ে তুলে রাখি। বিড় বিড় করে বলি, 'দয়া করো, দয়া করো গুরুজি। পুরুষকে আঁকার সময় আজও আসেনি। এখনও যে বুঝে উঠতে পারলাম না শিল্পীকে কী ভাঙতে হয়।'

॥ ৪ ॥

অনেকগুলো দিন দ্বন্দ্ব আর প্রতীক্ষায় থেঁতলে গেছে। দেবরঞ্জন আসেনি, আসে না। মনে মনে ভাবি দেবরঞ্জনের না আসাই মঙ্গল। তবু মাঝে মাঝে জমাট বৃষ্টির শব্দে মনে হয় বুঝি ঈপ্সিত কোন হাত আমার দোর ঠেলছে। আর তখনই ঈদিপাসের মায়ের আত্মার সাথে দেখা হয়ে যায়। কী ছিল তার মনে? শুধুই পাপবোধ? ঘৃণা? অথবা ফুলের বুকে

জমে ওঠা সুগন্ধি মধুর মত তারও বুকে ঘনিয়েছিল থির থির—প্যাসন? কেউ জানেনা তার প্রায়শ্চিত্তের শিকড় জন্ম নিয়েছিল কোন্ ভূমিতে। ঈদিপাসের মা আমার সমস্ত কাজে ভ্রান্তি আনছে কেবলই। তাই দেখে দেখে আমার স্বামী বলেন "আজকাল তোমার কী হয়েছে বল তো?"

দুপুরবেলা বর্ষার রিমঝিম সুরে ঘুমের তানপুরা বাঁধা ছিল; তার মধ্যে ডোরবেল ডাক দিল অনা স্বরে। এমন অ-সময়ে একজনই আসতে পারে। আলস্যের লেপ মুহূর্তে ঠেলে ফেলে ছুটে গেলাম দরজা খুলতে। খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে সবুজ বলল, "মরমীদি ভিতরে ডাকবে না?" হতাশার স্তূপ সরিয়ে সবুজের জন্য পথ বানাবার চেষ্টা করতে লাগলাম আমি, "ওঃ তুই! আসলে ঘুম চোখে ঠিক বুঝতে পারিনি। আয়, আয়।" আমি সরে দাঁড়াতে সবুজ ঘরে ঢুকতে পারল।

সোফায় বসে সবুজ একেবারে অবাক, "একী মরমীদি তোমার ঘরের ছবিটা এমন বদলে গেল কি করে? এ যেন ঘর নয়, ভাঙা হাট একখানা।" সবুজের কথাটা আমার জিভের ওপর বুঝি একদলা বিষ রেখে গেল। কষ্টে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া মুখ লক্ষ করে সবুজ আবার বলল, "তোমার এমন দশা কেন মরমীদি?" ব্যাপারটাকে হাল্কা করার জন্য বললাম, "তোরাই তো বলিস শিল্পীর জীবনযাত্রা এলোমেলো, ভাঙাচোরা সৃষ্টিছাড়া হওয়া প্রয়োজন।" সবুজ খানিকক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইল আমার দিকে। এই প্রথম মনে হল সবুজের জীবনবোধকে আমি নিতান্ত হাল্কা ভাবতাম এতদিন কিন্তু সেটা ঠিক নয়। সবুজ বলল, "মরমীদি এই ভাঙচুরের মধ্যে দিয়ে তুমি সৃষ্টির সূত্র খুঁজে পেয়েছ তো? এসব তোমাকে আনন্দ দিচ্ছে কি?" আমি জবাব দিতে পারলাম না। কিছুক্ষণ নীরবতার পর সবুজই আবার কথা বলল—"নতুন কী কী ছবি আঁকলে? তেমন কিছুই নয়, তাই না?" আমি চোখ নীচু করে বললাম, "সবুজ চা খাবি তো?" ও বলল, "আজ থাক। অন্যদিন। এখন আসি।"

রাত্রে স্বামীকে বললাম, "কাল রবিবার। চল দক্ষিণেশ্বরে গুরুজির বাড়ীটা ঘুরে আসি। অনেকদিন দেখিনি গুরুজির ঘরখানা।"

—"ও বাড়িতে কেন যে আর যেতে চাও মরমী। গুরুজির নাতি নাতবৌ তো তোমাকে পাত্তাই দেয় না।"

—"ভাবছিলাম গুরুজির আঁকা একআধখান ছবি যদি থাকে তো কিনে আনব।" আমার বিমর্ষ, ক্লান্ত মুখের দিকে চেয়ে আমার স্বামী রাজী হলেন বটে, তবে বারে বারেই বলতে লাগলেন, "এই ঘোর বর্ষার মধ্যে...."

গুরুজির সব ছবিই বিক্রী হয়ে গেছে অথবা নষ্ট হয়ে গেছে। নাতি সাহেব জানাল কেবল একটিই বাকি পড়ে আছে। সেটা নানা-র জমার ট্রাঙ্কে থেকে গেছে, ছবি বিক্রীর সময় কেউ খেয়াল করেনি। ভালো দাম পাবার লোভে গুরুজির নাতবৌ চটপট টেনে বার করল সেখানা।

ছবির দিকে চেয়ে আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে থাকি। এ যে সেই বর্ষা রাতে ভেঙে পড়া বকুল গাছের ছবি। এ তো শুধু রঙের কারুকার্য নয়, বহু পুরানো বৃষ্টি-ভেজা, ঝোড়ো হাওয়ায় উথাল-পাথাল, ঝর ঝর সুরে উদাস একটা আস্ত অনুভবকে অনেক বর্ষা পার করে এনে যেন ফ্রেমে বাঁধিয়ে আমার কালের ওপর ফেলে দিয়ে গেছে গুরুজির নাত বৌ।

একটা মস্ত বকুল গাছ ছিল গুরুজির ঘরের জানলার কাছে। ছবি আঁকায় যে বছর প্রথম হাতে খড়ি হল আমার, সেবারের গরমের দুপুরগুলোয় ঐ বকুল গাছের বেদীতে বসে বসে স্কেচ আঁকা শিখতাম আমি। বকুল গাছটা খুব বেশি রকম সঙ্গী হয়ে উঠেছিল আমার, গুরুজিরও। শীতের মায়াবী বিকেলে কতবার ঐ গাছটার নিঝুম ছায়ায় দাঁড়িয়ে গুরুজির সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছি বেলা ফুরানোর বিষন্নতাকে। শরৎ সকালের সোনালী রোদে, বৃষ্টি ধোওয়া সবুজ চিকন পাতায় ভরাপুর গাছটাকে এমন রূপবতী দেখাত যে চোখ ফেরাতে পারতাম না। আর বর্ষা? সে তো বকুলের প্রিয়তম। সহস্র ফুলের বিন্দুতে সাজানো সেই প্রেমিকা রূপ আমায় কেবলই মাতাল করত।

সেবার গুরুজির জন্মদিনে একটা কাট্ মাসের রেকাবি উপহার দিয়েছিলাম। গুরুজি বললেন, "এটা দিয়ে আমি কী করব রে বেটী?" আমি জবাব না দিয়ে এক মুঠো বকুল ফুল তুলে এনে রেকাবি ভরে গুরুজির ইজেলের পাশটিতে রেখে দিলাম। এখনও শ্রাবণী পূর্ণিমাতে আমার কলকাতার বদ্ধ ঘরে বসে সেই রেকাবি পচানো বকুল ফুলের ভিজে সুগন্ধ আমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।

প্রাণ ভরে বকুল ফুলের আঘ্রাণ নিয়ে গুরুজি বলেছিলেন, "বেটী বকুল বড়া আনোখা ফুল, লা জবাব এর মহেক। এই গাছটা আমার দাদাজির জমানার। এ আমার বাচপন-এর দোস্ত। মৌতকে বাদ এর নীচে যেন গোর দেওয়া হয় আমাকে।" আমি ব্যথিতভাবে বলেছিলাম "গুরুজি জন্মদিনে মৃত্যুর কথা বলবেন না।"

গুরুজির জন্মতিথির রাতে শ্রাবণী পূর্ণিমার আলো পেল না পৃথিবী। আকাশ, বাতাস, গাছ, মাটি—সবখানে গলে একাকার হয়ে যাবার জন্য যেন একটা দুরন্ত আবেগ। সকালে মা বললেন, "এই সাইক্লোনের মধ্যে ছবি আঁকতে যাস না মরমী।" আমি শুনিনি মায়ের নিষেধ। সারারাত বকুল গাছটা ঝড় বৃষ্টির মদে মাতাল হয়ে তাণ্ডব নেচেছে আমার মাথা জুড়ে। মাকড়শার জালের মত পল্‌কা ঘুমের মধ্যেও আমি

তুলির খোঁজে হাতড়াচ্ছিলাম এধারে-ওধারে। মা বলেছিলেন, "আঃ। এত ছটফট করছিস কেন।"

এমন একটা আশ্চর্য রাতের প্রতীক্ষাকে অনন্ত প্রতীক্ষা মনে হয়েছিল সকাল বেলায় উঠে। প্রসব যন্ত্রণার মতোই সৃষ্টির বেদনাও তর সয় না, একথা মাকে বোঝাতে পারিনি।

ছাতা মাথায় দিয়েও ভিজে সপ্‌সপে অবস্থায় গুরুজির বাড়ি পৌঁছে দেখি বকুল গাছটা ভেঙে পড়ে আছে। গাছের মৃত্যুর দিকে চেয়ে গুরুজি বসে আছেন খোলা জানলার পাশে। আকাশের অশ্রুতে ভিজে গেছে তার স্তব্ধ শরীর। আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। একটা দীর্ঘ নিশ্বাসে শোককে বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে গুরুজি টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "বেটী রো মত্। সচ্চা শিল্পীকে বেবশ হতে নেই। মৌত এর রৌনক জিন্দেগীর থেকে কমতি নয় বেটী। কেমন খুবসুরত কায়দায় গাছটা ভেঙে পড়েছে নজর করেছ? আঁশুর পর্দা থাকলে এসব দেখবে কেমন করে? রঙ তুলি ওঠাও। ওর তসবীর বানাও। বেবশীই শিল্পীর জিন্দেগীতে সব চেয়ে বড় গুণাহ্।"

বলতে বলতে নিজেই এগিয়ে গিয়েছিলেন ইজেলের দিকে। আমি তবু চোখের জল মুছিনি। ভাবছিলাম, মানুষ কি সত্যিই মোহশূন্য হতে পারে। আমার দ্বন্দ্বের কথা শুনে প্যালেট থেকে চোখ তোলেননি গুরুজি। রঙ মেশাতে মেশাতে বলেছিলেন, "ইনসান কোশিশ করতে পারে।"

কি আশ্চর্য! কেমন করে এত দিন ভুলে ছিলাম বকুল গাছের মৃত্যুকে? ছবির মধ্যে ভারি অদ্ভুত ভঙ্গিতে গাছটা ভেঙে ঝুলে পড়ে যেন মুক্তি চাইছে নিজেরই গুঁড়ি থেকে। মাটিতে লেগে থাকা গোড়ার অংশটুকুতে রঙের যে লম্বা স্ট্রাইপগুলো আঁকা হয়েছে তাতে গারদের ইঙ্গিত খুবই স্পষ্ট। এমন চমৎকার একটা ইমপ্রেশন সৃষ্টি করেছেন গুরুজি অথচ আমি এতদিন জানতেই পারিনি। ছবিটা তিনি আমার সামনে আরম্ভ করেছিলেন শুধু। শেষটা দেখবার জন্য আমাকে কত কতদিন অপেক্ষা করতে হল ভেবে অবাক লাগছে।

বেলা একটা নাগাদ বাড়ীতে ফিরে সোজা হাঁটা দিলাম স্টুডিওর দিকে। অধৈর্য স্বরে আমার স্বামী বললেন, "এখন খেতে দেবে না?" অভয় দিলাম, "শুধু পাঁচ মিনিট।" স্টুডিও রুমে ঢুকে দেরাজ থেকে টেনে বার করলাম সেই ক্যানভাসখানা। রঙ তুলি রেডি করে রেখে খেতে বসবার আগে টেলিফোন করলাম দেবরঞ্জনকে — "আজ দুপুরে সোজা চলে এস আমার স্টুডিও রুমে। তোমাকে আঁকব।"

সংস্কৃতির অবক্ষয়, সাম্প্রদায়িকতা ও বাঙালির সম্প্রীতি ভাবনা

আহমদ রফিক

দীর্ঘ সংগ্রামের পর সাতচল্লিশে বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি পেয়ে উপ-মহাদেশের মানুষ গণতান্ত্রিক স্বদেশী শাসন ব্যবস্থার সুফল ভোগ করার স্বপ্নে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। ধারণা হয়েছিল এবার সাম্প্রদায়িকতার রক্তাক্ত অধ্যায়ের এখানেই ইতি। কিন্তু সে ধারণা সত্য হয়নি। এরপর দুই দশকের লড়াই-শেষে একাত্তরের ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলে সেখানকার মানুষ আরেকবার অনুরূপ প্রত্যাশায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এবারও আকাঙ্ক্ষিতকে পুরোপুরি পাওয়া যায়নি। স্বভাবতই সচেতন মানুষের প্রশ্ন, কেন বারবার যাত্রারম্ভের বিন্দুতে ফিরে যাওয়া ? কেন সাম্প্রদায়িকতার অবাঞ্ছিত ধারাটি এখনও নিশ্চিহ্ন হল না।

এর জবাব পাওয়া আমাদের জন্য জরুরী। ইতিহাসের ছাত্র সবাই জানেন, চল্লিশের দশকে পৌঁছে মুসলিম লীগের পাকিস্তান-দাবীর ভিত্ তৈরি করেছিল ধর্ম-নির্ভর দ্বিজাতিতত্ত্ব। ধর্মের সঙ্গে জাতি-সত্তাকে একাকার করে ফেলার সেই অবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পেছনে ছিল সাম্প্রদায়িক চেতনা। তাসত্ত্বেও, এ সত্য অস্বীকার করা যাবে না যে, পাকিস্তান আন্দোলনে পশ্চাদপদ বাঙালি মুসলমানের আত্ম-উন্নয়ন ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন প্রতিফলিত হয়ছিল। সে কারণেই, উঠ্তি মধ্যবিত্ত থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক সমাজ এতে ব্যাপক সমর্থন জোগায়।

অন্যদিকে পাকিস্তান-দাবীর পাশাপাশি জাতীয় কংগ্রেসের অখণ্ড ভারত-রাজ্য দাবীর তাত্ত্বিক ভিত্তি ছিল অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তা যার কোন বস্তুভিত্তি ছিল না। কারণ বহুজাতি-অধ্যুষিত ভারতীয় উপমহাদেশ কখনোই 'একজাতি এক প্রাণ একতা'র প্রকাশ ঘটিয়ে একক নেশন-স্টেটের বাস্তবতাকে তুলে ধরতে পারেনি। তবু ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ বিভক্ত উপমহাদেশের দুই রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের জনগণের কাঁধে চেপে বসে।

এমন একটি জটিল কূটদ্বন্দ্বের দেশবিভাগে নৃতত্ত্ব-ভাষা-সংস্কৃতি নির্ভর জাতিসত্তাগুলোর অস্তিত্ব স্রেফ অস্বীকার করা হয়েছিল। ধর্মের বিবেচনা সেখানে প্রাধান্য পায় এবং সাম্প্রদায়িকতাকে প্রকারান্তরে মেনে নেওয়া হয়। এই অস্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে মার্কসবাদীরাও জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিয়ে লড়াইয়ে নামেননি। বিষয়টি অজানা ছিল না যে, সাম্প্রদায়িকতা-ভিত্তিক দেশবিভাগের পক্ষে কলকাঠি নাড়ছে সাম্রাজ্যবাদী শাসকের স্বার্থপর কূটনীতি। এর সঙ্গে ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর রক্ষণশীল চিন্তা। কিন্তু এই নাটকের প্রধান অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছিল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষজনিত ভ্রাতৃহত্যার রক্তস্রোত যা পেশোয়ার থেকে বাংলার পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত প্লাবিত করেছিল। সাম্প্রদায়িকতার সেই প্রকাশ ছিল ভয়াবহ।

দেশবিভাগ আসলে ছিল এক অস্বাভাবিক রাজনৈতিক মানসিকতার অস্বাভাবিক ফসল। সাম্প্রদায়িক চেতনায় সেই অস্বাভাবিকতার প্রতিফলন। এর চরম প্রকাশ ঘটেছে বাংলাকে, একটি জাতিসত্তাকে রাজনৈতিক তরবারিতে দ্বিখণ্ডিত করার উদ্ভটাচারে। তখনকার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পক্ষে অন্তত একটি তাৎক্ষণিক যুক্তি দেখানো হয়েছিল যে, এতে করে সাম্প্রদায়িক হানাহানি, রক্তপাত বন্ধ হবে। কিন্তু ভারত-পাকিস্তানে তা হয়নি। না-হওয়ার কারণ, এই সমাধানে ধর্মীয় দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেনি। বরং উভয় রাষ্ট্রেরই শাসনযন্ত্র নিজ নিজ স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করেছে, সাম্প্রদায়িক চেতনাকে উস্‌কে দিয়েছে। এক কথায় ধর্ম ক্ষমতাসীন বা ক্ষমতাহীন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রয়োজনীয় হাতিয়ারে পরিণত, অবশ্য এর কিছু ব্যতিক্রমও আমরা দেখতে পাই।ক

পাকিস্তানে ধর্মের লেবেল-আঁটা মুৎসুদ্দি-ধনিক শাসকদের শোষণ প্রক্রিয়ায় জাতিসত্তা-ভাষা-সংস্কৃতি ভিত্তিক দ্বন্দ্বটি শুরু থেকেই তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। তাই ধর্মীয় বাধা অতিক্রম করে পূর্ববঙ্গে ভাষা আন্দোলন, একাধিক গণআন্দোলন এবং সবশেষে একাত্তরে স্বাধীনতার লড়াইয়ের মাধ্যমে বাঙালি জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ পাকিস্তানের অখণ্ড জাতীয়তাকে মিথ্যা প্রমাণ করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর অভ্যুদয় ঘটায়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই পাকিস্তানী জাতীয়তার সঙ্গে

পাকিস্তান-ভিত্তির দ্বিজাতিতত্ত্বের আত্মঘাতী দ্বন্দ্ব ছিল অন্তর্নিহিত দুর্বলতার প্রতীক।

কিন্তু গণতন্ত্রী বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িকতার পরিপূর্ণ কলুষ-মুক্ত জীবন যাপন করতে পারেনি। রাজনৈতিক স্বার্থ বারবার রাজনীতিতে, রাষ্ট্রনীতিতে ধর্ম ও ধর্মীয় সংকীর্ণতাকে টেনে এনেছে। এর সঙ্গে সাম্প্রদায়িক চেতনা যুক্ত না হয়ে পারে না। শাসককুলের অর্থনৈতিক ব্যর্থতা-প্রসূত জনঅসন্তোষ চাপা দিতেও এর প্রয়োজন পড়েছে। এই পথেই স্বৈরতন্ত্রী সরকারের হাতে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের প্রতিষ্ঠা (যার প্রতিবাদ রাজনীতিকদের কণ্ঠে শোনা যায়নি) এবং ধর্মাচারের বাড়াবাড়ি মোল্লাতন্ত্র ও ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তির বিস্তার সহজ করে তুলেছে। এক কথায় এ সবই দলীয় স্বার্থ-নির্ভর দূষিত রাজনীতির কল্যাণে। গণতন্ত্রীদের মৌলবাদের সঙ্গে সহযাত্রার কল্যাণে।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিদেশাগত উন্নত প্রযুক্তির সূত্রপথে বিজাতীয় সংস্কৃতির কুপ্রভাব, যা আমাদের দেশে অপসংস্কৃতি নামে পরিচিত, ক্রমশ বিস্তার লাভ করেছে। ফলে ঐতিহ্যবাহী সুস্থ মূল্যবোধের অবক্ষয় তো বটেই, কোন কোন ক্ষেত্রে এর মৃত্যু সামাজিক পরিবেশ বিষিয়ে তুলেছে। সব কিছুতেই অনাস্থা— একমাত্র সত্য বিত্ত, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা এবং যে কোন মূল্যে এগুলো অর্জনই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সামাজিক অস্থিরতা নানা অনাচারের রূপ নিয়ে, যেমন তরুণ সমাজে ব্যাপক মাদকাসক্তি, সন্ত্রাসী ক্রিয়াকর্ম ও অন্যান্য অপরাধমূলক তৎপরতা, আত্মপ্রকাশ করে চলেছে।

রাজনৈতিক অপশাসন ও অনাচারের ফলে সমাজে ক্ষোভ, হতাশা ও নৈরাজ্য বড় হয়ে ওঠে। ক্ষুধা, দারিদ্র, বর্ধমান বেকারত্ব মানুষকে যেমন আদর্শের টানে সংগ্রামী করে তুলতে পারে, তেমনি পারে ভ্রষ্টাদর্শের টানে অনাচারের পথ ধরাতে, অন্ধকার গহ্বরের দিকে টেনে নিতে, নামমাত্র মূল্যে বিকিয়ে যাবার পথ ধরাতে। বিরাজমান রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবেশ এই দুই পথের একটিকে বেছে নিতে সাহায্য করে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সমাজে এখন নেতির টানই প্রবল। রাজনীতিতে নষ্ট-ভ্রষ্টদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। তাই গণতন্ত্রী নামে পরিচিত রাজনীতির এখন আর মৌলবাদের সঙ্গে আপোষে পথ চলতে নীতিতে বাধে না। মৌলবাদ সে সুযোগ পুরোপুরি নিয়েছে এবং নিচ্ছে।

আমরা লক্ষ করেছি রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের মুখে ধর্মাচারের দিকে মানুষের ঝোঁক বাড়ে। মৌলবাদী শক্তি সে সুযোগে মানুষকে বিভ্রান্ত করে তার পায়ের নিচে ভিত্ গড়তে থাকে। আমাদের দেশে এই প্রক্রিয়ার নিশানা দেখা যাচ্ছে। শিক্ষিত সমাজেই যেন এই প্রভাবটা বেশি। এমনকি আধুনিক মানুষের একাংশে দেখা যায় সংকীর্ণ চিন্তার আত্মসর্বস্ব মানুষ যেখানে সামান্য ঝাঁকুনিতে আধুনিকতা-গণতান্ত্রিকতার লেবেল খসে পড়ে, বেরিয়ে আসে অনাধুনিক, ধর্মীয় রক্ষণশীলতার ছকে আবদ্ধ ব্যক্তির চেহারা, যে মানুষ নিজ ধর্মের বাইরে অন্যকে প্রতিপক্ষ হিসাবে চেনে, তাই সামান্য উপলক্ষ্যে অথবা বিনা উপলক্ষ্যে প্রতিপক্ষকে আঘাত করতে তার মানবিক বোধ আহত হয় না, ধর্মীয় বোধ রক্ষী হিসাবে কাজ করে। অন্যদিকে সংখ্যালঘুত্বের অসহায়তা ও হীনমন্যতা প্রতিরোধের সাহস ও শক্তি নষ্ট করে পরিস্থিতি আর অস্বাভাবিক করে তোলে। এ অবস্থা সম্ভবত দুই দেশের জন্যই কম বেশি সত্য।

সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও সংঘাত উপমহাদেশে এমন এক ঐতিহাসিক বিষয় হয়ে উঠেছে যে, সাম্প্রদায়িক চেতনার ইতিহাসবদ্ধ উৎস ও চরিত্র না জেনে এর বিরুদ্ধে লড়াই সম্ভব নয়। কারণ বিবেচনা করতে গেলে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব সংঘাতের মূলে রয়েছে ব্যক্তিস্বার্থ, আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থ, ধর্মীয় অহম্-বোধের তৃপ্তি বিধান, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত গোঁড়ামি ও অনুরূপ একাধিক বিষয়। উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ঐতিহাসিক ঘটনা (যা দাঙ্গা নামে পরিচিত) স্পষ্টভাবে উনিশ শতক থেকে দেখা গেলেও আঠারো শতকের গোড়ার দিকে, এমন কি তারও আগে দুই একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনার কথা জানা যায়। বঙ্গদেশে প্রথম ঘটনা সম্ভবত হুগলিতে ১৮৫৭ সালে এবং কলকাতায় ১৮৯১ সালে, একটি মসজিদ ভাঙার বিষয় নিয়ে (দীপেশ চক্রবর্তী)। এরপর থেকে বিশেষ করে বিশ শতকে এসে হিন্দু-মুসলমান সংঘাত একটি নিয়মিত বিষয় হয়ে ওঠে, একটি ঐতিহাসিক অভ্যাসে পরিণত হয়।

এই ঐতিহাসিক অভ্যাসের প্রেক্ষাপট বুঝতে দূর অতীতের দিকেও ফিরে তাকানোর প্রয়োজন ঘটে। কারণ এর বিচার ব্যাখ্যা নিয়ে ভ্রান্তির শেষ নেই। এমন অনৈতিহাসিক কথাবার্তাও শোনা যায় যে, আর্যরা, সেই সুবাদে হিন্দুরাই এদেশের আদি বাসিন্দা, বহিরাগত মুসলমান লুণ্ঠন, অত্যাচার ও মন্দির ধ্বংস করে জবরদস্তির সঙ্গে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে।

কিন্তু ইতিহাস বলে বহিরাগত আর্যভাষী জনগোষ্ঠী নেহাত দ্রুতগামী অশ্বশক্তি ও অস্ত্রের জোরে তাদের চেয়ে বহুগুণ উন্নত সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস করেছে। এর পর স্থানিক দ্রাবিড়ভাষী ও ততোধিক প্রাচীন (সম্ভবত এদেশের আদি বাসিন্দা) অস্ট্রিকভাষী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। আর্য-অনার্যের এই সংঘাত যেমন সত্য, তেমনি সত্য ধীরে ধীরে গড়ে-ওঠা সমন্বয়ের প্রক্রিয়াও। ঐতিহাসিক কালে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব, তার সহিষ্ণু বিস্তার মৌর্যযুগে ঘটলেও গুপ্তযুগে এসে তা ব্যাহত হয়।

গৌড়বঙ্গে রাজা শশাংকের হিন্দু-রক্ষণশীলতার পর দেশের চরম রাষ্ট্রনৈতিক অরাজকতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত পাল রাজত্বের চারশো বছরে বাংলায় ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সমন্বয় ধারার প্রকাশ ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, পাল রাজাদের প্রধানগণ ধর্মাচারকে রাষ্ট্রনীতির বাইরে রাখাই সঠিক মনে করেছিলেন। এই ধারায় ছেদ পড়ে বাংলায় কর্ণাটকী সেনী রাজাদের গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদী, বর্ণবিভক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায়, যা স্থানীয় বৌদ্ধ জনগণের উপর অত্যাচারেই শেষ হয়নি, বর্ণাশ্রমপীড়িত নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজও ছিল এই পীড়নের অন্তর্ভুক্ত।

এমন এক পরিস্থিতিতে বখ্‌তিয়ার খলজির বঙ্গবিজয়। পরবর্তীকালে ইসলামের সামাজিক সমতাবোধ নিপীড়িত হিন্দু বৌদ্ধ জনসাধারণকে আকর্ষণ করেছে এবং তা শুধু রাজধর্মের কারণেই নয়, যেজন্য শাসন-কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী বঙ্গ, কেরল, সিন্ধু, পাঞ্জাবে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য লক্ষ করা যায়। স্বামী বিবেকানন্দের মতে "জমিদার ও পুরোহিতদের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভের জন্য তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। এরই পরিণামে বঙ্গদেশে কৃষকদের মধ্যে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য।"

ইতিহাসের দৃষ্টিতে বহিরাগত মুসলমান অভিযানকারীদের মন্দির লুণ্ঠনের নামে ধনরত্ন লুণ্ঠন কিংবা পরবর্তী কালে কোন কোন মুসলমান শাসকের মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ নির্মাণ যেমন সত্য তেমনি সত্য কোন কোন হিন্দু রাজন্যের বৌদ্ধপীড়ন এবং বৌদ্ধবিহার ধ্বংস করে মন্দির নির্মাণের ঘটনা (শৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়)। এক সময় এটা এত প্রবল হয় যে, অসহায় বৌদ্ধ ধর্মকে জন্মস্থান ছেড়ে আশ পাশের দেশে আশ্রয় নিতে হয়।

আসলে প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে এইসব সংঘাত ছিল রাজায় রাজায় যুদ্ধ—রাজ্যস্থাপন ও রাজ্য বিস্তারের লোভে। কুরু-পাণ্ডবের ভ্রাতৃ যুদ্ধ থেকে শুরু করে ঐতিহাসিককালে হিন্দু-রাজনাদের পরস্পরের সঙ্গে যেমন যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছে, তেমনি হয়েছে পাঠান-মুঘলদের পরস্পরের মধ্যে। হয়েছে হিন্দু-মুসলমান শাসকদের মধ্যে। এই ঐতিহাসিক সত্যকে ইংরেজশাসক ও তাদের নিযুক্ত ইতিহাসবিদগণ সাম্রাজ্যের স্বার্থে সত্য-মিথ্যায় হিন্দুমুসলমানের বিরোধ হিসাবে চিত্রিত করে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিরূপতা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছেন। উদ্দেশ্য বিবদমান দুইপক্ষের মধ্যে শান্তিরক্ষায় তৃতীয়পক্ষের উপস্থিতি যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলা অথচ এই সব যুদ্ধ বিগ্রহ সাধারণ মানুষকে সামান্যই স্পর্শ করেছে।

মনে রাখা দরকার, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্মগত মৌল প্রভেদ ও বিরোধের পাশাপাশি সমন্বয়ের প্রক্রিয়াও ঐতিহাসিক সত্য, যা সাধু-সন্ত-সুফি সাধকদের লোকায়ত ধর্মের উদারতায় প্রকাশ পেয়েছে। হিন্দু-মুসলমান উভয়ই এর আশ্রয় নিয়েছে। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সমন্বয়ের ধারা আরও ব্যাপক। সাহিত্য-শিল্পকলা স্থাপত্যে এই বিচিত্র সংমিশ্রণ প্রকাশ পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে বাংলায় সুলতানী শাসনের আনুকূল্য স্মরণযোগ্য। অন্যদিকে একেবারে জনস্তরে লোকগীতির মরমী গভীরতায় কিংবা কবি গানের নানামুখী উপস্থাপনায় সাংস্কৃতিক সাংকর্যের উদাহরণ স্পষ্ট। এই সাংকর্য নৃতাত্ত্বিক অর্থাৎ জাতিসত্তার ক্ষেত্রেও সত্য। অষ্ট্রিকভাষী আদিঅস্ট্রেলীয় ভিতের উপর অন্য দুই একটি জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাঙালি জাতিসত্তার পরিচয় হিন্দু-মুসলমান উভয়ের জন্য সমান সত্য (ড. নীহাররঞ্জন রায়)। এই প্রসঙ্গে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর একটি চিত্তাকর্ষক উক্তি উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙ্গালী।...মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙ্গালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে তা ঢাকবার জো-টি নেই।"

এদেশে হিন্দু-মুসলমানের এই আচরণ থেকে বহিরাগত ইংরেজের আচরণ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অবদান রাখা সত্ত্বেও ইংরেজ তার স্বদেশের সমৃদ্ধির লক্ষ্যেই এদেশ শাসন-শোষণ করেছে। এদেশের মাটি ওরা আপন বলে গ্রহণ করেনি। হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ-বিন্দুগুলোকে সত্য-মিথ্যায় সাজিয়ে ইংরেজ শাসন প্রথমে হিন্দুতোষণ পরে মুসলমান তোষণের 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল' নীতির সফল অনুসরণের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক তিক্ত করে তুলেছে। মর্লি-মিন্টো সংস্কার থেকে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার মতো নানা পথে উভয়ের যাত্রাপথ পৃথক করে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এখানে আমাদের নিজেদের দায়ও কম ছিল না। একদিকে উনিশ শতকে হিন্দু রিভাইভ্যালিজম এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুজাতীয়তাবাদ ও সনাতন হিন্দু ধর্মের পুনরুদ্ধার চিন্তা, অনাদিকে জঙ্গী ইসলামী সংস্কারবাদিতা, স্বদেশ হিসাবে আরব-তুরস্কের স্বপ্ন দেখা, এমন কি উচ্চ শ্রেণীতে বাংলাকে মাতৃভাষা হিসাবে অস্বীকার দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন রেখাটিকে গভীরতর করেছে। বাউলের গানে এই সত্যেরই প্রকাশ: 'আমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজিদে'।

তাই দেখি অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে অগ্রসর হিন্দু মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত শ্রেণীর স্বাদেশিকতায় বাঙালিত্ব-হিন্দুত্বের সমীকরণ ঘটে, স্বদেশপ্রীতি ধর্মপ্রীতিতে একাকার হয়ে যায়। অন্যদিকে উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান নিজেদের ভিনদেশী ভেবে নিয়ে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যের পথে আত্মপরিচয়ের ঠিকানা খোঁজে এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে, আর পশ্চাদপদ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানকে তা

কম-বেশি প্রভাবিতও করে। এইসব কারণে ধর্মীয় চেতনা-ঋদ্ধ সন্ত্রাসবাদ তো বটেই, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও উভয় সম্প্রদায়ের দাক্ষিণ্যে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে না। ধর্মসিক্ত এই সম্প্রদায়-চেতনা বাঙালি জনমানসকে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ছকে বিভক্ত করে রাখে।

ধর্ম, সামাজিক সংকীর্ণতা, সম্প্রদায়গত বিরোধ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক কথা বলেছেন। আমরা কয়েকটি উক্তি উদ্ধার করছি। হিন্দু সমাজের আচারগত সংকীর্ণতা যে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে 'কালাপানির' দূরত্ব সৃষ্টি করে রেখেছে সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য : "আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেছে।...হিন্দুযুগ হচ্ছে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ—এই যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে আচারের প্রাচীর তুলে দুষ্প্রবেশ্য করে তোলা হয়েছিল।....আত্মীয়তার দিক থেকে মুসলমান হিন্দুকে চায়না, কাফের বলে ঠেকিয়ে রাখে; হিন্দুও মুসলমানকে চায়না, ম্লেচ্ছ বলে ঠেকিয়ে রাখে। ধর্মই তাদের মানববিশ্বকে সাদা কালো ছক কেটে বিভক্ত করেছে—আত্ম ও পর।...ধর্ম আমাদের মেলাতে পারেনি।" আর পারেনি বলেই "বাংলাদেশে আমরা আছি জতুগৃহে, আগুন লাগতে সময় লাগে না।"

রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমান সমস্যার গোড়ায় হাত দিয়েছিলেন। চেয়েছিলেন দুই সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক স্তরে সমতা এনে মিলনের পথ তৈরি করতে। সে সমস্যা অবশ্য এখন নেই। তবে একথা ঠিক যে তৎকালীন রাজনীতিকগণ রবীন্দ্রনাথের প্রাজ্ঞ বিবেচনা গ্রহণ করলে হয়ত বা রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দেশবিভাগের অঘটন এড়ানো যেত, সম্প্রদায়গত সম্পর্ক এমন তিক্ত হত না।

রবীন্দ্রনাথ-কথিত জতুগৃহে বাসের আশংকাই অবশেষে সত্যে পরিণত হয়েছে। বিভক্ত ভারতে বিদেশি শাসনের অবসান এবং সংঘাতের পটভূমি পরিবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের অবসান ঘটেনি। যতদূর দেখা যায় স্বার্থান্ধ দলীয় রাজনীতির কুশাসন, ভোটের রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার, জনস্তরে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ব্যর্থতা ঢাকতে সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার, বিভেদ-মানসিকতার প্রশাসন ইত্যাদি বিষয় উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক চেতনা জিইয়ে রেখেছে। এ হল রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'ধর্মের সহায়তায় জনসাধারণকে অন্ধ করে রাখার চেষ্টা'।

এ সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি আমরা নজরে আনি না তা হল সাম্প্রদায়িক মানসিকতা। উনিশ শতক থেকে শুরু করে বিশ শতকের আধুনিকতায় পৌঁছেও ধর্মীয় রক্ষণশীলতার ভ্রান্তি এবং ইংরেজের সচেতন প্রয়াসে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার যে অন্ধতা আমাদের চেতনায় স্থান করে নিয়েছে সেই মানসিক সাম্প্রদায়িকতা আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। আধুনিক সংস্কৃতির শিক্ষিত মানুষের আচরণেও যখন এই সংকীর্ণতার প্রকাশ ঘটে তখন দুঃখ, বেদনাই বড় হয়ে ওঠে। এই অন্ধতা দূর করতে না পারলে সাম্প্রদায়িকতার সমূল বিনাশ ঘটবে না। এজন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, হিন্দু-মুসলমানের মনের পরিবর্তন ঘটানোর কথা। বলেছিলেন, "হিন্দু-মুসলমানের মিলন যুগ পরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে।" এই পরিবর্তনের সাধনাই আমাদের করতে হবে।

এ পর্যন্ত আলোচনায় ছবিটা বড় হতাশার। মেনে নিতে কষ্ট হয়। প্রশ্ন ওঠে, জাতি হিসাবে আমরা কি এতই নিকৃষ্ট যে অত্যাধুনিক শিক্ষা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িকতার অন্ধতাকে চেতনা থেকে মুছে ফেলতে পারি না? 'আমি ভালো, তুমি মন্দ, সব দোষ তোমার'—এই অযৌক্তিক ধারণার অবসান ঘটাতে পারি না?

হিন্দু আর মুসলমান দুই পৃথক ধর্মবিশ্বাসে বাঁধা বলে আচারগত, বিশ্বাসগত, বিশ্বাসগত পার্থক্য তাদের মধ্যে থাকতে পারে, একই ধর্মের একাধিক শাখায়, যেমন শিয়া-সুন্নিতে, থাকে। তাই বলে 'মানবিক সৌহার্দ্যের সহাবস্থান' অসম্ভব হবে কেন? নিজেকে ধর্মীয় ছকের বাইরে মানুষ ভাবতে পারব না কেন?

এতসব সত্ত্বেও বিষয়টাকে যদি এভাবে দেখি যে, দুই বঙ্গেই জনসংখ্যার কত শতাংশ সাম্প্রদায়িক চেতনায় দুষ্ট, তাহলে অস্বীকার করা যাবে না যে, সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা সংখ্যালঘু। তাদের সক্রিয় অংশ আরও ছোট এবং প্রধানত শিক্ষিত শ্রেণীর অন্তর্গত। বিশাল গ্রামীণ জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মূলত অসাম্প্রদায়িক; তা না হলে কোন না কোন সময় জতুগৃহ পুড়ে ছাই হয়ে যেত। ধর্মীয় বা রাজনৈতিক প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে এদের কেউ কেউ সাম্প্রদায়িকতায় প্রভাবিত হয়ে থাকে। সক্রিয় সাম্প্রদায়িকতাবাদী সংখ্যায় অল্প হলেও শক্তিমান, তাদের হাতে থাকে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কিংবা ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টির হাতিয়ার। থাকে এদেশের রাজনৈতিক ঐতিহ্যে লালিত 'মাস্তান বাহিনী' সহায়ক শক্তি হিসাবে। শান্তিপ্রিয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ওদের ভয় পায় বলে সংঘবদ্ধ সুস্থ রাজনৈতিক শক্তি সঙ্গে না এলে এরা প্রতিবাদী ভূমিকায় দাঁড়াতে পারে না।

তাই ভরসা সুস্থ রাজনীতির উপর যা ধর্ম চেতনাকে বাইরে রেখেই মানুষকে সংগঠিত করতে পারে এবং যা এখনও একেবারে মরে যায়নি। সত্যকার গণতান্ত্রিক আন্দোলন চরিত্রধর্মে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী। একদা ভাষা আন্দোলন এবং ষাটের দশকের স্বৈরতন্ত্রবিরোধী ছাত্রআন্দোলন, গণআন্দোলন পূর্ববাংলায় যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল তাতে সাম্প্রদায়িক শক্তি মুখ লুকোতে বাধ্য হয়। সেই পরিবেশে শাসক-সৃষ্ট দাঙ্গার

(১৯৬৪) বিরুদ্ধে মধ্যপন্থীরাও এগিয়ে আসে। তাদেরই এক দৈনিকে মোটা শিরোনাম ঝলসে ওঠে : 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও, বাঙালী রুখিয়া দাঁড়াও'। এসব বহু আলোচিত বিষয়।

বাঙালি জাতিসত্তার বিষয়টি এভাবেই সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধিতা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সামনে চলে আসে। বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, জাতিসত্তার বিষয়টিকে গণতান্ত্রিক চেতনায় যুক্ত করে যথাযথ মূল্যে পরিচর্যা করা হয়নি বলেই অসাম্প্রদায়িক জাতিগঠনের, রাষ্ট্র-গঠনের কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। এই গঠন-প্রয়াসে গণতন্ত্রী, রামপন্থী সবারই সমন্বিত ভূমিকা দরকার।

ভরসা আরও এইখানে যে, সাম্প্রতিক মৌলবাদী রাজনীতির (বিশেষ করে বাংলাদেশে মোল্লাতন্ত্রের) উত্থান সত্ত্বেও সুস্থ মূল্যবোধে বিশ্বাসী, সুস্থ-রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী মানুষ এখনও মৌলবাদ-বিরোধিতায়, সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধিতায় সক্রিয়, বিশেষ করে সুস্থ ছাত্র সমাজ। এমন মানুষও আছেন যারা চিন্তায়, কাজে, আচরণে সত্যকার অসাম্প্রদায়িক। এরাই বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় নির্দ্বিধায় আত্মদান করেছেন কলকাতা, সন্দ্বীপ, ঢাকা এবং অন্যত্র।

তাছাড়া আমাদের রয়েছে এক বলিষ্ঠ, অসাম্প্রদায়িক সংগ্রামী ঐতিহ্য। সেই ইংরেজ শাসনের শুরু থেকে ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের যৌথ প্রকাশ, পরবর্তীকালে একাধিক কৃষক আন্দোলন ও কৃষক বিদ্রোহ এবং আরও পরে তেভাগা আন্দোলনের পথ ধরে কাকদ্বীপ, সোনারপুর, মালদহ, দিনাজপুর, রংপুর হয়ে হিন্দু-মুসলমান জনতার যৌথ সংগ্রাম অবিস্মরণীয় ইতিহাস রচনা করেছে। এই ঐতিহ্যবাহী সংগ্রামের পথ যেমন আমাদের রাজনীতিকে পথ দেখাতে পারে তেমনই পারে সাম্প্রদায়িকতার স্থায়ী অবসান ঘটাতে।

কিন্তু এই দীর্ঘ শ্রমসাপেক্ষ পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার অপেক্ষায় বসে থাকলে চলবে না। পাশাপাশি আমাদের মধ্যে দীর্ঘকাল লালিত বাস্তব ও অলীক বিরোধের বিন্দুগুলো থেকে মুক্তিলাভের কাজে হাত লাগাতে হবে। এজন্য দরকার আনুষ্ঠানিক মত-বিনিময়ের জন্য উন্মুক্ত আলোচনা মঞ্চ, দরকার ব্যক্তি পর্যায়ে সামাজিক পর্যায়ে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের সৌহার্দপূর্ণ মেলামেশার ব্যবস্থা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি : "নানা উপলক্ষে এবং বিনা উপলক্ষে সর্বদা আমাদের পরস্পরের সঙ্গ ও সাক্ষাৎ-আলাপ চাই। যদি আমরা পাশাপাশি চলি, কাছাকাছি আসি, তাহলেই দেখতে পাব মানুষ বলেই মানুষকে আপন মনে করা সহজ। পরস্পরকে দূরে না রাখলেই মিল আপনিই সহজ হতে পারবে।"

রবীন্দ্র-নির্দেশিত পথ সাম্প্রদায়িক চেতনার বিলোপে এখনও আমাদের জন্য সত্য। সান্নিধ্য, নৈকট্য, মেলামেশা মানসিক সৌহার্দ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। মানস পরিবর্তনই সবচাইতে জরুরী বিষয়। আবারও রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "হৃদয়ের বন্ধন, শিষ্টাচারের বন্ধন, আদব-কায়দার বন্ধন—এই তিনই মানুষের প্রকৃতিগত।" এই মানব-প্রকৃতিকে, মানবিক চেতনাকে জাগিয়ে তোলাই হবে আমাদের প্রধান কাজ।

রবীন্দ্রনাথ আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এদেশের সংস্কৃতিতে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত অবদানের বিষয়টি যথাযথভাবে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় বিভেদমূলক পরিচয়টাই বড় হয়ে রয়েছে, উভয়ের দূরত্বকে আরও বাড়িয়েছে। এখনও শিক্ষার সেই চেহারা রয়ে গেছে। দরকার এমন শিক্ষার যা অতীত ইতিহাসকে সত্য চেহারায় তুলে ধরবে, ধর্ম-উত্তর মানবিক চেতনাকে যথার্থ মূল্যে তুলে ধরবে, যা দুই সম্প্রদায়ের সৌহার্দের সহায়ক হবে। এদিকে আমরা সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি, এই উপলক্ষে আন্দোলন সংগঠিত করতে পারি।

সত্যই সাম্প্রদায়িকতার মূল তুলে ফেলতে আজ সবচেয়ে জরুরী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব বিনিময়, পরস্পরকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে চেষ্টা করা। এজন্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে উভয়ের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করতে পারে সেই আশায় রবীন্দ্রনাথ সেই পথে হিন্দু-মুসলমানের 'মিলন যজ্ঞ' শুরু করার আহ্বান জানিয়ে গেছেন। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের কোন কোন দিকপাল সাহিত্যিকের রচনায় সাম্প্রদায়িকতার প্রকাশ এবং এর প্রতিক্রিয়া একদা উভয় সম্প্রদায়ের সম্পর্ক বিষিয়ে তুলেছিল। এর পাশাপাশি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ধারাটি ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ।

তাসত্ত্বেও বিশ শতকে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রমুখ সাহিত্য-মনীষীর কল্যাণে এবং বিশশতকীয় আধুনিকতার প্রভাবে বাংলা সাহিত্য অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য সৃষ্টিতে যাত্রা শুরু করে। এ ইতিহাস সবারই জানা। লক্ষণীয় যে, সাহিত্যের একদা খণ্ডিত যাত্রা থেকে বর্তমানের সমন্বিত যাত্রায় আমরা অনেকটা এগিয়ে যেতে পেরেছি। সঙ্গীত সাধনার ক্ষেত্রেও তাই। এতে পরস্পরকে কিছুটা বুঝতে ও জানতে পারাও নেহাৎ কম পাওনা নয়।

সাম্প্রদায়িকতার আলোচনায় একথা স্পষ্ট যে, দূষিত রাজনীতি যেমন এজন্য দায়ী, তেমনি ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও রক্ষণশীলতার বৈষয়িক ও মানসিক প্রভাবও কম দায়ী নয়, হয়ত বা কিছুটা বেশি। তাই যদি বলি, ধর্মমোহ বা ধর্মান্ধতা অক্ষুণ্ন রেখে সাম্প্রদায়িকতার বাঁধা ছক থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন, তাতে হয়ত কেউ আপত্তি করবেন, কারোর সংস্কারে লাগবে। কারণ উপমহাদেশীয় ভূ-খণ্ডে ধর্মবিশ্বাসের শিকড় এতটাই বিস্তৃত ও

গভীর যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় বলতে হয় ; 'ধর্ম শিকড় গেড়ে জাকিয়ে রয়েছে দেশে, তুমি আমি বললেই তো বাতিল হবে না।...পোড়া সংস্কারের ছাইগাদাতেও তাই চারা গজায়, বিশ্বাসের পোড়া ডালে গজায় নতুন পাতা। জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা দিয়েও প্রভাব কাটিয়ে ওঠা যায় না একেবারে।"

কথাগুলো মর্মান্তিক সত্য। তবু আধুনিক যুগে পৌঁছে সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটাতে সংকীর্ণ, অন্ধ বিশ্বাসের শিকড় কেটে ফেলতে পারাই ছিল সর্বোত্তম উপায়। ধর্মের অন্ধ প্রভাবের কারণে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ একবার (১৯৩০) বলে ফেলেছিলেন : "ধর্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভালো।" আমার কথা হল, শেকড় বাকড় কাটা যদি অসম্ভব হয় সেক্ষেত্রে অন্তত মানবধর্ম প্রসারের আহ্বান তো আমরা জানাতে পারি। স্মরণ করতে পারি রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'মানুষের ধর্ম' যা মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন করে আবদ্ধ করে রাখে না। জানাতে পারি শুভবুদ্ধি জাগিয়ে তোলার, মুক্তবুদ্ধির চর্চার আহ্বান। কাজী আবদুল ওদুদ ও তার সহকর্মিগণ একদা মুসলমান সমাজে মুক্তবুদ্ধির শিখা জ্বালাতে চেষ্টা করেছিলেন, তখন খুব একটা পারেননি। কিন্তু এখন আর তেমন কঠিন নয়। চেষ্টা চালানো দরকার সংস্কারের ও আচারের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসার, খোলা চোখে প্রতিটি বিষয় দেখার মতো স্বচ্ছ দৃষ্টি ও স্বচ্ছ বোধ অর্জনের। এ কাজটি দুই বাংলার সচেতন মানুষ সম্মিলিত চেষ্টায় শুরু করতে পারি পরস্পর মত বিনিময়ে, সম্মেলনে ও কর্মশালায় বসে। এই প্রক্রিয়ায় অন্য জরুরী কাজ হল জনসাধারণও এই চিন্তায় এক কাজে টেনে আনা, তা না হলে শুধু শিক্ষিতদের সমাবেশে একসময় এর গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে।

আলোচনা শেষ করছি একটা ঘটনার সাহায্যে। চল্লিশের দশকের এক স্কুল ছাত্রকে জানি, যে বাংলা ভাষাটা মূল ধরে শেখার উদ্দেশ্যে পাঠ্যবিষয় হিসাবে সংস্কৃত পড়তে চেয়েছিল। শুনে হেডমাস্টার মশাই তো মহাখুশি। কিন্তু বাদ সাধলেন সংস্কৃত শিক্ষক পণ্ডিত মশাই। বললেন : 'তুমি বাপু মোছলমানের ছেলে, আরবি পার্সি নেওয়াই ভালো।' ঘটনাটিকে যদি প্রতীক হিসাবে ধরে নিই, এমন বহু প্রতীক নানা ফর্মে এখনও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মানসিক-বিরোধ সৃষ্টি করে চলেছে। আর একারণেই দুই বাংলার সমাজে এখনও উচ্চশিক্ষা, চাকরি ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে সম্প্রদায়-ভিত্তিক গ্রহণ-বর্জনের মানসিকতা রয়ে গেছে। এই মানসিক সাম্প্রদায়িকতার বিষয় এখনও সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলা যায়নি। কিন্তু আধুনিকতার চর্চা, মননশীলতার চর্চার মাধ্যমে এই সংকীর্ণতার বেড়িটা কি ভেঙে চুরে গঙ্গা-পদ্মায় ভাসিয়ে দেওয়া যায় না?

সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রটি সেদিন রবীন্দ্রনাথের 'গোরার' মতো করে বলতে পারতো : 'আজ থেকে আমি মুসলমান নই, হিন্দুতো নইই, বৌদ্ধ-খ্রিস্টানও নই। আমি মানুষ। এই পরিচয় নিয়ে চলতেই চাই সব ধর্মের বাধা ছকের বাইরে থেকে'। কথাগুলো সে উচ্চারণ করেছিল কিনা জানিনা, তবে ঐ বয়সেই অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছিল, পরে নাস্তিক্যবাদী হিসাবে পরিচিত বাম রাজনীতিতে, যেখানে মানবিকবোধের চর্চা অনুপস্থিত নয়।

মনুষ্যত্বের এই সাধনা—রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, এমন কি ব্যক্তিক ক্ষেত্রেও এই সাধনার ব্রতযাত্রাই সাম্প্রদায়িকতার কলুষ থেকে আমাদের মুক্তি দিতে পারে, মানুষ হিসাবে আমাদের বাঁচতে শেখাতে পারে।

মুসলমানদের জন্য চাকরিতে সংরক্ষণের প্রশ্ন

সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ

কিছুদিন ধরে উপরের প্রসঙ্গটি আলোচিত হচ্ছে। ভারতবর্ষে তফসিলি সংরক্ষণের পর বর্তমানে আদার ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি বা অন্যান্য পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়দের জন্য সংরক্ষণের প্রশ্নটি মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ রূপে ও সাধারণভাবে স্বীকৃত রূপে দেশের রাজনীতিতে আসার ফলে কিছুটা স্বাভাবিকভাবে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার মুসলমান যুবক-যুবতীদের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তারা মনে করছেন যে অন্যদের যদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয় তো আমাদের ক্ষেত্রে সেটা হবে না কেন। অসংখ্য বেকারের মধ্যে সরকারি কর্মে কিছু নিয়োগ হলে সামগ্রিকভাবে মুসলমান বেকারের সমস্যা সমাধান হবে একথা বোধ হয় তারাও মনে করেন না। কিন্তু তাদের বক্তব্য, অন্যদের ক্ষেত্রে যদি হয় তো আমাদের ক্ষেত্রে একই যুক্তি প্রয়োগ করা হবে না কেন? সম্প্রতি বিভিন্ন রাজ্য কমিশন এই ব্যাপারে অন্য দিক দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। সম্প্রদায়গতভাবে সব মুসলমান ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি বা পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের মধ্যে আসতে পারেন না কারণ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অবস্থাপন্ন ও শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা কম নয়। অন্যদিকে ইসলাম ধর্মাবলম্বী অনেক মুসলমান আছেন যাঁরা প্রধান দুই অংশে বিভক্ত যাঁদের আশরাফ বা শরিফ বলা হয় আর দ্বিতীয় যাদের আতরাফ বলা হয়, এদের বাইরেও আরজাল বা নিম্নশ্রেণীর মুসলমান আছেন, যেমন ভানর, জলালখোর, ধাঙড়, লালবেগী, মাঙ্গতা, মেহতর প্রভৃতি। এছাড়া আতরাফদের মধ্যেও এমন কিছু আছেন যার শিক্ষাগতভাবে ও সমাজগতভাবে অনেক পিছিয়ে আছেন যেমন কুনজরা, কুর্মি, নোলা বা নালিয়া, নিকারী, ধুনিয়া, ধাওয়া, বাইশগামি ইত্যাদি। এদের অনেকেই এমন সমস্ত পেশায় নিযুক্ত যেগুলিকে উপরতলার মুসলমানরা ভাল চোখে দেখেন না, আগের দিনে এক মসজিদে নামাজ পড়তেও দিতেন না। এখন অবশ্য সে সব ব্যাপার নেই এবং সামাজিক পার্থক্যটা বাংলার বাইরে যত প্রকট এখানে ততটা নয়। বাংলায় এঁরা একদিক দিয়ে উভয়সংকটে আছেন। একদিকে প্রধানত তাঁরা চান যে তাঁরা মুসলিম সমাজে একত্রিভূত হয়ে যান। কিন্তু অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে তাঁরা যে পিছিয়ে আছেন তারও পৃথকভাবে প্রতিকার চান। শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে তফসিলি বা উপজাতিদের মতোই তাঁদের ক্ষেত্রেও সংরক্ষণ দরকার বলে এদের মধ্যে নতুন শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা দাবী করতে চান। এবং প্রকৃত পক্ষে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক কিছু ক্ষেত্রে এইসব সম্প্রদায়ের কিছু কিছু অংশকে পশ্চাদপদ শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে এই ধরনের পার্থক্য করাটা মৌলবাদী মুসলমানরা পছন্দ করে না কিন্তু খানদানি মুসলমানরা আবার সকলের জন্য ব্যাকওয়ার্ড বা পশ্চাদপদের স্বীকৃতি মানতে রাজি নন।

যাই হোক না কেন এটা ঠিক যে মুসলমান সম্প্রদায়ের কিছু কিছু অংশের মধ্যে বিশেষ করে কিছু ছাত্রযুবকদের সংরক্ষণের দাবী যে উঠেছে সেটা অস্বীকার করা যায় না। সেজন্য বিষয়টি সাধারণভাবে আলোচিত হওয়া উচিত কারণ ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই প্রশ্নটিকে ব্যবহার করার কাজ শুরু হয়েছে। দক্ষিণের দুটি রাজ্যে নির্বাচন উপলক্ষ্যে সফরে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সীতারাম কেশরী মুসলমানদের জন্য চাকরিতে সংরক্ষণের দাবী করেন। নির্বাচন কমিশনের তরফে তাঁকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন এটি তাঁর ব্যক্তিগত মত। এইক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতার ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের প্রশ্নটি কীভাবে দেখা হবে তা এখন কমিশনের বিচার্য তবে স্বাভাবিকভাবে মানুষ মনে করতে পারেন যে নির্বাচনের সুবিধার জন্যই এ কাজ করা হয়েছে। সম্প্রতি উত্তরভারত থেকে কলকাতায় মুসলিম নেতা এনে সংরক্ষণের দাবী করে মুসলমানদের একটি সভা করা হয়েছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দল নেতা জয়নাল আবেদিন সাহেবও সেখানে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য সমর্থন করেন। রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্য ভোটকেন্দ্রিক হবে এটা ধরে নেওয়া যায়। তাই সকল ধর্মনিরপেক্ষ ও চেতনাসম্পন্ন মানুষের কাছে বিশেষ করে মুসলমানদের কাছে এটি একটি বিপদের সংকেত হিসাবে সহজ হয়েছে।

সরকারি চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানরা বঞ্চিত হচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠিত খানদানি মুসলমানরা নানানভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছেন এ কথা উনবিংশ শতাব্দীর ষাট দশক থেকেই আলোচিত হয়ে আসছে। ১৮৫৭ সালের মহা বিপ্লবের পর থেকে বিশেষ করে মুসলমানদের নতুন বুদ্ধিজীবী

মহল এ বিষয়ে সোচ্চার হন। উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহমেদের নেতৃত্বে এবং বাংলায় নবাব আবদুল লতিফের নেতৃত্বে মুসলমানদের মধ্যে ইংরাজের বিরোধিতা পরিত্যাগ করে চাকরিবাকরির সুযোগ নেবার কথা বলা হয়। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টারের পুস্তক 'ইন্ডিয়ান মুসলমানস' নামক গ্রন্থে তিনি ওয়াহাবি আন্দোলনের বিস্তৃত বিবরণ দেবার পরে যে প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তা হল এই: ভারতের মুসলমানরা ইংরেজ শাসনের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে এবং একই সঙ্গে নিজেদের আদর্শ বজায় রাখতে পারবে কিনা? ওয়াহাবিদের মতে, তা মোটেই সম্ভব নয়, হান্টার মনে করেন, শান্তিপূর্ণভাবে ইংরেজ শাসনাধীন থাকার সঙ্গে ঐশ্লামিক রাজনৈতিক তত্ত্বের কোন বিরোধ নেই অন্তত বেশিরভাগ মুসলমানদের ক্ষেত্রেই একথা সত্য। হান্টার মুসলমানদের ওয়াহাবি ও অ-ওয়াহাবি এই দুই অংশে বিভক্ত করে দেখান যে, অ-ওয়াহাবি মুসলমানেরা ইংরেজ শাসনকে সহজেই মেনে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু ইংরেজ শাসকেরা এই ধরনের মুসলমানদের সমস্ত সরকারি কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রেখে অবস্থাকে জটিল করে তুলেছেন। তিনি লেখেন, ইংরেজ শাসনের পূর্বে রাষ্ট্রের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদেই মুসলমানেরা ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে হিন্দুরা নানা সুবিধা ভোগ করেন, অথচ অন্যদিকে মুসলমানদের দুরবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বভাবতই মুসলমানদের মনে অনেক অভিযোগ জমে আছে। হান্টার মুসলমানদের দুরবস্থার যে বিবরণ দেন তাতে শিক্ষিত মুসলমানরা খুবই প্রভাবান্বিত হন। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে ভারত বিভাগের সময় পর্যন্ত মুসলিম চিন্তাধারায় এই গ্রন্থের প্রভাব নানাভাবে প্রকাশিত হয়। (বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, অমলেন্দু দে, পৃষ্ঠা ১২০)

হান্টারের এই পুস্তক প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের ইংরাজ বিরোধিতার পথ থেকে সরিয়ে আনার প্রচেষ্টা হিসাবেই কাজ করে। পরবর্তী সত্তর বছরের ইতিহাস যদি দেখা যায় তাহলে লক্ষ করা যাবে যে স্যার সৈয়দ আহমদ, নবাব আবদুল লতিফ ইত্যাদিদের বক্তব্য মুসলমানদের জন্য কোন স্থায়ী সমাধানের পথ এনে দেয় না। স্যার সৈয়দ আহমদ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন আর মওলানা মহম্মদ কাসিম দেওবন্দে মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। লক্ষণীয় এই যে, এই দুই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও মওলানা মহম্মদ কাসিম উভয়েই তত্ত্বগতভাবে ও ভাবগতভাবে শাহওয়ালি উল্লাহ্‌র (১৭০৬-১৭৬৩ খ্রি) সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

প্রায় একই সময়ে বাংলাদেশে মৌলানা কেরামত আলি ও আবদুল লতিফ সক্রিয় ছিলেন আর তাঁদের মধ্যে যোগাযোগও ছিল। আবদুল লতিফ তাঁকে দিয়ে একটি 'ফতোয়া' লেখান। তাতে বলা হল: ভারতবর্ষে ইংরেজ সরকার মুসলমানদের ধর্মে-কর্মে বাধা দেয় না। সুতরাং ভারতবর্ষ হল 'দারুল ইসলাম' 'দারুল হরব্' নয়। (বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পৃষ্ঠা ১১৯-১২০)

প্রকৃতপক্ষে এর পর থেকেই মুসলমান বুদ্ধিজীবী মহল একদিকে ধর্মীয় আন্দোলন ও অন্যদিকে ব্রিটিশের সঙ্গে হাত মেলানোর লাইনে পরিচালিত হয়। বিংশ শতাব্দীতে এসে ধর্মীয় প্রাধান্যে যাঁরা রাজনীতি পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন তারা পুরোনো ওয়াহাবি আহ্বালে-হাদিসের পথে মুসলমানদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন; এ বিষয়ে দেওবন্দি মওলানার ভূমিকা প্রধান ছিল। কংগ্রেসের সঙ্গে খিলাফত আন্দোলনের সংযোগ এই পথেই হয়েছিল কিন্তু মুসলমান বুদ্ধিজীবী মহল মুসলমান জনসাধারণকে শেষ পর্যন্ত তাদের পক্ষেই নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করে মুসলিম উচ্চশ্রেণী ক্রমশ নিজেদেরকে মুসলিম জনগণের প্রতিনিধি রূপে খাড়া করে। এ ব্যাপারে ইংরেজের কূটনৈতিক চাল ও ভারতীয় ধনিক শ্রেণী তথা জমিদার মহাজনদের দ্বারা পরিচালিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দল ও প্রতিষ্ঠানসমূহ কতখানি দায়ী সে আলোচনা করে লাভ নেই। আজকে যে চাকরিতে সংরক্ষণের কথা বলা হচ্ছে এটা যে সেই উনবিংশ শতাব্দীর ডব্লিউ, ডব্লিউ হান্টার, স্যার সৈয়দ আহমদ, নবাব আবদুল লতিফের পথেই এগিয়ে এসেছে এটা বলা বাহুল্য। আবার অন্য দিকে আজও যে এই দাবী উঠছে বা দাবী অপূর্ণ রয়েছে তা আসলে স্যার সৈয়দ, নবাব আবদুল লতিফ ও কেরামত আলিদের নির্দেশিত পথেরই পরাজয় প্রমাণ করে। তা আরও প্রমাণ করে যে কৃষক, মজুর ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের শোষণের ভিত্তিতেই তাদের যারা ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম রাখতে চায় তারা প্রকৃতপক্ষে সামাজিক ন্যায়বিচার করতে পারে না। বিগত ৪৭ বছরের স্বাধীনতার পরবর্তী ইতিহাসও তাই প্রমাণ করে। অন্যদিকে মজুর, কৃষক, মধ্যবিত্ত মানুষেরা সামাজিক অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারের এই সমস্ত প্রশ্নের সঠিক মীমাংসার পথ দেখতে না পেয়ে সহজেই বিচ্ছিন্নতাবাদী, ধর্মান্ধবাদী, জাতিবিদ্বেষী প্রভৃতি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের খপ্পরে গিয়ে পড়েন। সমস্যা আছে এবং তার সমাধানের পথ আমাদেরকেই খুঁজে বার করতে হবে, এ বিশ্বাস নিয়ে এগোতে না পারলে চলবে না। চাকরি সংরক্ষণের প্রশ্ন, সে যে লোকের

জন্যই হোকনা কেন আসলে তা সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্ন। মুখে জাতীয় ঐক্য, জাতীয় সংহতি, বিভেদের মধ্যে বৈচিত্র্যের মধ্যে মিলন এইসব ভাল ভাল কথা বলে সামাজিক অন্যায় প্রতিকার করা যায় না।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস বলেছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনে হিন্দু-মুসলমান উভয়ে পঞ্চাশ শতাংশ অর্থাৎ আধা-আধি করে চাকরি পাবে। পরবর্তীকালে ব্যারিস্টার ডি. সি. চ্যাটার্জী এই ফরমুলা নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন যার ফলে তাঁর নাম হয়ে গিয়েছিল ফিফটি-ফিফটি চ্যাটার্জী। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সামগ্রিক সামাজিক একটি দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকরী না করলে যে সমস্যার সমাধান করা যায় না এই বাংলার পরবর্তী ইতিহাস তা প্রমাণ করে। দেশবন্ধু যে স্বরাজ্য পার্টি সৃষ্টি করেছিলেন সে পার্টি তদানীন্তন বেঙ্গল কাউন্সিলে প্রজাসত্ত্ব আইনের বিতর্কে জমিদারদের দাবী সমর্থন করেন এবং তাদের স্বার্থে প্রস্তাবিত আইনের সংশোধন করান। প্রাথমিক শিক্ষা আইনের এই জন্য বিরোধিতা করেন যে জমিদারদের উপর শিক্ষা কর বসানো যাবে না। সেদিন চাকরিতে সংরক্ষণের প্রচেষ্টা পরিত্যক্ত হয়েছিল মূলত সামগ্রিক, সামাজিক চিন্তার অভাবে, তবুও উনবিংশ শতাব্দীতে এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা মনে করতেন শিক্ষা-দীক্ষা এবং অন্য ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান একটা সমতা রক্ষা করা দরকার কারণ সমাজের একটা বৃহত্তর অংশ পিছিয়ে থাকলে সমাজ এগোবে না। ভূদেব মুখোপাধ্যায় মাইকেলের সহপাঠী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা ছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষার স্বপক্ষে হলেও ভূদেববাবু বিশেষ করে নারীমুক্তি, বিধবাবিবাহ ইত্যাদি প্রশ্নে প্রকৃতপক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন। শুনেছি তাঁর পুত্র মুকুন্দ দেবের এক কন্যা মাত্র দশ বছর বয়সে বিধবা হয়েছিল অথচ তাঁর পুনঃবিবাহ দেওয়া হয় নি। এই ভূদেববাবুই কিন্তু সাখাওয়াত হোসেনকে বিলেতে পাঠিয়ে ছিলেন। সাখাওয়াত হোসেন মুকুন্দ দেবের সহপাঠী ছিলেন, সেই সূত্রে সাখাওয়াত ভাল ছাত্র হিসাবে ভূদেববাবুর প্রিয় ছিলেন। অন্যদিকে ভূদেববাবুর মত ছিল যে একটা হিন্দু ছেলেকে যখন পাঠানো হচ্ছে বিলেতে সরকারি বৃত্তি দিয়ে তখন একজন মুসলমান ছাত্রকেও পাঠানো দরকার। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা যখন বাংলা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পশ্চাৎপদ, তা না হলে আজও আবার নতুন করে সংরক্ষণের এই ধরনের দাবি উঠত না।

স্বাধীনতার পর এতদিন যে ব্যাপারটি চাপা পড়েছিল তার অন্যতম কারণ এই যে, পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল এই বলে যে মুসলমানরা রাজনৈতিক ক্ষমতায় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় এবং পাকিস্তান সৃষ্টির দ্বারা সেই সমস্যার সমাধান হবে। তাই স্বাধীনতার পর মুসলমানরা মনে করছিলেন যে তাদের এইসব দাবী এখন আর গ্রাহ্য হবে না। তাছাড়া ১৯০৬ সাল থেকে মুসলিম লীগ যে সমস্ত দাবী করত তাদের সেই সমস্ত দাবী ছিল ইংরেজের কাছে, দেশের জনগণের কাছে নয়। মুসলমান রাজনৈতিক বা ধর্মীয় নেতারা ১৮৫৭ সালের পর ক্রমশ ভারতীয় জনসাধারণের বৃহত্তর অংশের উপর আস্থা হারিয়েছিলেন। ক্রমশ তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষকে সামাজিক ন্যায়বিচারের স্বপক্ষে নিয়ে আসার প্রয়োজনের কথা ভুলে যান। এই আস্থা হারানোর জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার নেতারা কতখানি দায়ী আগেই বলেছি সে প্রশ্ন বিচার করে লাভ নেই। ঘটনাটা এই যে ১৯১৫ সালের লখনউ প্যাক্ট ও ১৮২১ সালের মিলিত খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এই আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারেনি এবং যেটুকু আস্থা বর্তমান ছিল পরবর্তী দশ বছরে সেটুকুও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। এই অবস্থায় স্বাধীনতার পর মুসলমান ধনিকরা, জমির মালিকরা ও বুদ্ধিজীবীরা রাতারাতি ভোল পালটে কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হয়ে ও সমগ্র মুসলমান সমাজকে কংগ্রেসের ভোট ব্যাঙ্কে পরিণত করে নিজেদের ক্ষুদ্র শ্রেণীস্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট হন। বাবরি মসজিদের ঘটনার পর এইসব উপরতলার মুসলমান ভদ্রলোকদের মোহভঙ্গ হয়েছে বটে কিন্তু মুসলমানদের সামগ্রিক সামাজিক ন্যায় পেতে হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের গরীবদের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে, তাদের সামাজিক অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়ার সংগ্রামে তাদের সাথে থাকতে হবে, এই চেতনার অভাব এখনও আছে। আজ চাকরিতে সংরক্ষণের প্রশ্ন নিয়ে ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছেন একদল ব্যক্তি, যাঁরা এই দেশের মুসলমানদের সামগ্রিক ন্যায় ব্যবস্থা করতে তো ব্যর্থ হয়েছেনই বরং নতুন নতুন জটিলতার সৃষ্টি করে চলেছেন। আজকে যাঁরা মুসলমানদের চাকরির সংরক্ষণের কথা বলে আসর জমাতে চাচ্ছেন তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সাম্প্রদায়িকতাকে জাগিয়ে তুলতে চান। দেশের সামগ্রিক উন্নতির মধ্যে মুসলমানেরও অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধার প্রশ্ন সমাধান করতে হবে। এই চিন্তার বদলে সংরক্ষণের দাবী তুলে শুধু মুসলমানদের ক্ষতিই হবে, মঙ্গল হবে না। ধরুন আজ পশ্চিমবাংলার খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে, সবরকম কৃষি ফসলের দাম বেড়েছে, সেচের জল পাওয়ার সুবিধা বেড়েছে, রাস্তা ঘাট বেড়েছে। এর দ্বারা যে সামগ্রিক সুবিধা হচ্ছে তার থেকে কি মুসলমানরা বঞ্চিত হচ্ছেন? সেচের ক্যানাল বা মিনি টিউবওয়েল, ডিপ টিউবওয়েল, বিদ্যুৎ সরবরাহ, এ সবের মারফত যে আর্থিক উন্নতি হচ্ছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের যে সুযোগ বাড়ছে, সেইগুলোর মধ্যে অংশ গ্রহণ করে কি মৌলিক সমস্যার

সমাধান করা যায় না? না এসব ছেড়ে দিয়ে কটা সরকারি কী আধা সরকারি চাকরীর জন্যে মারামারি বা গুঁতোগুঁতি করে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাম্প্রদায়িক নেতাদের হাত শক্ত করলে কি মুসলমানদের উন্নতি হবে? বাঙালি হিন্দু-মুসলমান উভয়েই ব্যবসা বাণিজ্য করা, ছোট বড় শিল্প সংস্থাপন করা অপেক্ষা একটি চাকরি পাওয়া কি জীবনের একমাত্র সুযোগ বলে মনে করে? কয়েকবছর আগে তদানীন্তন সাংসদ পরলোকগত জ্যোতির্ময় বসু মেটিয়াব্রুজ-মহেশতলা এলাকায় একটি গার্মেন্ট বা পোশাক কারখানার পরিকল্পনা করেন তিনি মারা যাওয়ার পর এবং বামফ্রন্ট সরকার হওয়ার পর দর্জি ইউনিয়নের সেক্রেটারি বা বর্তমানে বাশার সাহেব এ ব্যাপারে অগ্রসর হন। এখনকার সংসদের জয়েন্ট কমিটির (জে.পি.সি.) সভাপতি মাননীয় রামবিলাশ মির্ধা তখন বস্ত্রমন্ত্রী ছিলেন। তিনি বলেছিলেন আধুনিক মানের একটি ছোটখাটো কারখানা করলেও তিনি রপ্তানি কোটা দিতে পারবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কলকাতার শিল্পপতি বা মহেশতলার ওস্তাগররা এ বিষয়ে অগ্রসর হন না। মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হলে তিনি বলেন আমরা সুযোগসুবিধা করে দিতে পারি। ফলতায় রপ্তানি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, সেখানেও সুযোগ করে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু কারখানা করবে কে, চালাবে কে? মজার কথা এই যে পৃথিবীতে রেডিমেড গার্মেন্ট বা পোশাকের আদি জন্মদাতা হল কলকাতার এই দর্জিরা। স্বাধীনতার পর পূর্ববঙ্গের অর্থনীতিতে এই গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি বা পোশাক শিল্প একটি প্রধান অবলম্বন হয়েছে। এই শিল্পে তিন-চার লক্ষ মুসলমান মহিলা কাজ করেন, এমনকি কিছু কিছু কারখানার মালিকও বাংলাদেশের মুসলমান মহিলা। কিন্তু কলকাতার বাঙালি হিন্দু-মুসলমান উভয়েই কেমন যেন চাকরি-বাকরি এবং ভূমির উপরেই জীবনধারণ করার প্রচেষ্টায় মগ্ন। আমাদের যেসব শিল্প ছিল যেমন ঔষধ শিল্প আবার বেঙ্গল পটারির মতো শিল্প তাও শেষ হয়ে গিয়েছে। এর জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারি নীতি কতখানি দায়ী একথা ছেড়ে দিলেও বাঙালির আরামপ্রিয় নির্বিঘ্ন জীবনযাত্রার মানসিকতা অনেকখানি দায়ী। স্বভাবতই চাকরির সংখ্যা কম এবং সেখানে শেষ পর্যন্ত গুঁতোগুঁতি, মারামারি। এখন সমস্যার সমাধান করতে হলে সামাজিক ন্যায় বিচারের সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। সংখ্যালঘুকে বিশ্বাস করতে হবে যে তাদের সুখ, সুবিধা বা সুযোগ পাওয়ার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চেতনা ও বোধের উপর নির্ভর করতে হবে। কোন তৃতীয় পক্ষ সুযোগ করে দেবে না এবং কোটি কোটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ইত্যাদির মধ্যে সামাজিক ন্যায় এনে দিতে পারে। অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে এবিষয়ে অবিরত প্রচার আন্দোলন দরকার। তাদের মধ্যে এই চেতনা আনা দরকার যে ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয়, জাতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের ভিত্তিতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তথা সারা দেশের মঙ্গল, কোথাও যদি কোন সংখ্যাগরিষ্ঠ সামাজিক ন্যায়-বিচার থেকে বঞ্চিত হয় তবে তার প্রতিকার করতে হবে সংখ্যাগরিষ্ঠকেই।

কিন্তু ব্যাপারটি মোটেই সহজ নয়। তাই সংখ্যালঘু মুসলমানদের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতার ও বঞ্চিতের মনোভাব রয়েছে তার প্রতিবিধান করতে হলে কিছু কিছু বাস্তব পদক্ষেপও দরকার। প্রথমত রাজনৈতিক দলের নেতাদের মধ্যে ও প্রশাসনের মধ্যে চাকরি-বাকরির ও সব রকম সরকারি সুবিধা বন্টনের ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। দ্বিতীয়ত যে সব জায়গায় মুসলমান অধিবাসীরা অনেকটা এলাকায় একত্রে বাস করেন শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে সেসব এলাকার পশ্চাৎপদ অবস্থা দূর করার জন্য বিশেষ নজর দিতে হবে। হস্তশিল্প, সেচ, বিদ্যুৎ-রাস্তাঘাট শিক্ষা ইত্যাদি বিস্তারে উন্নয়নের জন্য বিশেষ এলাকাগত ব্যবস্থা করতে হবে।

তৃতীয়ত মুসলমানরা বিভিন্ন কারিগরি কাজে হস্তশিল্প, সূচীশিল্প প্রভৃতিতে বিশেষ দক্ষ। দারু শিল্প থেকে হীরা কাটার কাজ সব খানেই দেখা যাবে দক্ষ কারিগর রয়েছেন মুসলমানদের মধ্যে। এদের শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে উন্নত করা যায় এবং পুঁজি সাহায্য দেওয়া যায়। সে ব্যাপারে বিশেষ নজর দিতে হবে। সূচীশিল্পে মুসলমান মহিলারা এক একটি এলাকায় বিশেষ দক্ষ। বাগনানের লেসের কাজ, মালদা মুর্শিদাবাদের নক্সী কাঁথার কাজ বিখ্যাত, এদেরকেও সাহায্য করে, বিদেশে এদের কাজ রপ্তানি করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা যায়। এছাড়া চামড়ার কাজ, ট্যানারি, বোন মিল বা হাড্ডি কল এসব ব্যাপারে সহজেই মুসলমানদের আকর্ষণ করা যায়। পোশাক শিল্পেও উদ্যোগ সৃষ্টি করা যায়। উন্নয়নের এসব নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মুসলমান সংখ্যালঘুদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সম্ভব হবে এবং তা হলেই তাদের মধ্যে হতাশার থেকে যে বিচ্ছিন্নতা ও বঞ্চিতের মনোভাব গড়ে উঠছে তা দূর করা সম্ভব হবে। সহজ প্রথায় সংখ্যালঘুদের চাকরি সংরক্ষণের কথা বলে আসর জমাতে চাইলে তার দ্বারা সংখ্যালঘু মুসলমান কোন উপকার হবে না, বরং সংখ্যাগুরু রোষ বা ধিক্কারের তারা শিকার হবেন।

উত্তরাধুনিকতার অর্থ ও উত্তরাধুনিকতার বিতর্ক

সালাহউদ্দীন আইয়ুব

উত্তরাধুনিকতার উদ্দীপক প্রতিভূ জঁ-ফ্রাঁসোয়া লিওতার "দি পোস্টমর্ডান কন্ডিশন" (১৯৭৯) লিখে ঘোষণা করেন: মহা-আখ্যান ও পরা-আখ্যানের কাল শেষ ; ওসব আখ্যানের বৈধতার প্রতিশ্রুতি লুপ্ত ও নির্বাপিত। কিন্তু পরা-আখ্যান/মহা-আখ্যান মেটান্যারেটিভ/গ্রান্ডন্যারেটিভ কি ? পশ্চিমের পরা-আখ্যান পশ্চিমের আধুনিকতা নির্ণয় করেছে ; ওসব আখ্যানের মধ্য দিয়ে সমাজ-পরিসর শ্রেণী-পরিসর ও জীবন-পরিসরে তৈরি হয়েছে যুক্তির বোধ ও ব্যবহার, স্বাধীনতার বোধ ও ব্যবহার ; উদ্ভূত হয়েছে মুক্তিঅন্বেষার বিভিন্ন প্রকরণ, প্রগতি বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব ও প্রাকটিস ; সর্বোপরি সম্ভবপর হয়েছে : পুঁজিবাদী প্রযুক্তিবিজ্ঞান বা টেকনোসায়েন্সের বিরাট অগ্রগতি ও বিকাশ। পরা-আখ্যানের শরীর থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে : আধুনিকতার গড়ন ; হেগেলের দর্শনে এই আখ্যান ও আধুনিকতা একক আধারে বিধৃত।

পরা-আখ্যানগুকে লিওতারের মনে হয়েছে পুরাণের মতো। পুরাণ-পৃথিবী যেমন শাদা-কালো ভালো-খারাপে বিন্যস্ত ; পুরাণ-কথায় যেরকম একটা নির্দেশ এবং একটা সংকেত আছে, একইভাবে মেটান্যারেটিভের (অর্থাৎ দর্শন, সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি বিষয়ক সকল আখ্যানের) মূলেও কার্যকর : বৈধতা ও বৈধায়নের প্রক্রিয়া ; মেটান্যারেটিভগুলো বৈধ প্রতিপন্ন করেছে বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও প্রাকটিস, আইন, নৈতিকতা, চিন্তাপদ্ধতি। মেটান্যারেটিভ এবং মেটান্যারেটিভে অন্তরিত বৈধায়ন প্রক্রিয়ায় জন্ম নিয়েছে কতিপয় সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা : যেমন স্বাধীনতা, এনলাইটেনমেন্ট, সাম্যবাদ। এই সংকল্প আন্তর্জাতিক ও সর্বব্যাপ্ত : সকল মানবিক বাস্তবতার নির্দেশক। এসবের মাধ্যমেই জন্ম নিয়েছে পশ্চিমের আধুনিকতা ও আধুনিকতার প্রজেক্ট ; য়ুর্গেন হেবারমাসের চোখে যে প্রজেক্ট অসম্পূর্ণ, অপরিণত, অমীমাংসিত।

লিওতার মনে করেন : আধুনিকতার প্রজেক্ট অসম্পূর্ণ নয় বরং বিধ্বস্ত ; বহুভাবে এই প্রকল্প বিনষ্ট হয়েছে। যেমন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 'আসউইচ' : নাৎসী নরহত্যাযজ্ঞের স্মরণীয় প্রতীক। 'আসউইচে' অসংখ্য মানুষকে পাশবিক প্রক্রিয়ায় হত্যা করা হয়েছে এবং এই হত্যাকে 'যুক্তি' দিয়ে বৈধ করার চেষ্টা হয়েছে : যে-যুক্তি মেটান্যারেটিভ, আলোকপর্ব ও আধুনিকতার সপ্রতিভ শস্য। 'আসউইচ' একটি আধুনিক অপরাধ এবং এই অপরাধ-মুহূর্ত থেকে উত্তরাধুনিতার সূচনা : লিওতার বলতে চান।

লিওতারের উত্তরাধুনিকতা ও দেরিদার উত্তরাধুনিক বিনির্মাণের প্রবল বিরোধিতা করেছেন য়ুর্গেন হেবারমাস। উত্তরাধুনিকতাকে তিনি নব্যরক্ষণশীলতা বলেছেন এবং লিওতার-দেরিদা ও অন্যান্য উত্তরাধুনিক ভাবুক বিষয়ে তাঁর সন্দেহ গভীর। হেবারমাসের প্রধান ভয় অনাধুনিকতা ও অযুক্তিতে : লিওতার ও দেরিদার অনেক লেখায় যার লক্ষণ তিনি শনাক্ত করেছেন। মূলত য়ুর্গেন হেবারমাসই উত্তরাধুনিকতা বিষয়ে জ্ঞানগত/রাজনৈতিক/সাংস্কৃতিক/ভাবানৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের উদ্যোক্তা। হেবারমাস দেরিদাকে আক্রমণ করেছেন এবং আরো অনেক উত্তরাধুনিক ভাবুককে বিভিন্ন প্রশ্নের মুখোমুখি করেছেন।

উত্তরাধুনিকতায় হেবারমাস লক্ষ করেছেন : পেছনে ফেরার একটা বাসনা, যে-বাসনা আধুনিকতার বিপরীত এবং যে-বাসনা রক্ষণশীলতার চিহ্নযুক্ত। আশির দশকের প্রথম থেকেই হেবারমাস রক্ষণশীল রাজনীতির সঙ্গে উত্তরাধুনিকতার দর্শনের সম্পর্ক আলোচনা করেছেন। ১৯৮০ সালে তিনি লেখেন সাড়া জাগানো প্রবন্ধ : 'আধুনিকতা বনাম উত্তরাধুনিকতা' (এটা ছিল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে ফ্রাঙ্কফুর্টে হেবারমাসের বক্তৃতা [প্রথম প্রকাশ 'নিউ জার্মান ক্রিটীক', ১-২, শীত ১৯৮১])। এই প্রবন্ধে হেবারমাস তিন ধরনের রক্ষণশীলতার কথা বলেছেন :

(ক) প্রাচীন রক্ষণশীলতা : এই রক্ষণশীলতা হল প্রাগাধুনিক জীবনপ্রণালীর দিকে প্রত্যাবর্তন।

(খ) নব্য রক্ষণশীলতা : এই রক্ষণশীলতা আধুনিকতার অর্থনৈতিক ও প্রাযুক্তিক সমৃদ্ধি স্বীকার করে, কিন্তু আধুনিকতার বিরাট সাংস্কৃতিক প্রগতি গ্রাহ্য করে না।

(গ) যুব রক্ষণশীলতা : হেবারমাসের মতে এটা হল উত্তরাধুনিক রক্ষণশীলতা। যুবরক্ষণশীলরা, হেবারমাসের মতে, নান্দনিক আধুনিকতার মৌল অভিজ্ঞতাকেই এলোমেলো করে দিতে চায় ; তাদের লক্ষ্য : আধুনিক পৃথিবীকে ভেঙে ফেলা। আধুনিকতার মুখোশে অনাধুনিকতার চর্চা উত্তরাধুনিকতারও অন্তঃসার। হেবারমাসের মতে ফরাসি দেশে এই প্রবণতা জর্জ বাতিল্লি থেকে ফুকো-দেরিদা পর্যন্ত বিস্তৃত। এঁদের আদি পুরুষ : নীটশে ; নীটশে উত্তরাধুনিকদের প্রেরণার প্রধান উৎস।

য়ুর্গেন হেবারমাস উত্তরাধুনিকতা বিষয়ক বিতর্ককে গুরুতর তাত্ত্বিক ফ্রেমে বিন্যাস করেছেন, তাঁর "দি ফিলসফিকাল ডিসকোর্স অফ মডার্নিটি" (প্রথম প্রকাশ ; ইংরেজি অনুবাদ এফ. লরেন্স, কেমব্রিজ এম আই টি প্রেস ১৯৮৭) এবং "দি নিউ কনসারভেটিজম" (প্রথম প্রকাশ : ইংরেজি অনুবাদ শিয়ারি ওয়েবার নিকলসন, পোলাইটি প্রেস, ১৯৮৯) গ্রন্থদ্বয়ে। হেবারমাসের আধুনিকতার তত্ত্ব এবং সংজ্ঞাপক কর্মের তত্ত্ব এক এবং অভিন্ন। হেবারমাস নব্যরক্ষণশীলতার আলোচনা করে উত্তরাধুনিকতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। হেবারমাসের আধুনিকতা ওয়েবারের তত্ত্বের ভিত্তিতে নির্মিত। ওয়েবারের মতে আধুনিকতার উৎস বিজ্ঞান/প্রযুক্তি, নৈতিকতা/আইন এবং শিল্পকলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্বাধীন যুক্তির বিস্তার। ওয়েবারের মতে প্রাগাধুনিক সংস্কৃতির পরিসর মহাজাগতিক বিশ্বদৃষ্টি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল ; যেমন ধর্ম ও পুরাণ, কিন্তু এনলাইটেনমেন্টের পর সংস্কৃতির সমস্ত স্তরে স্বতন্ত্র মূল্যের ধারণা গড়ে ওঠে এবং বিজ্ঞান, নৈতিকতা ও শিল্প নিজ নিজ মূল্য ও তাৎপর্য লাভ করে। হেবারমাস ওয়েবারের ভাবনার প্রক্রিয়ায় আধুনিকতা বিষয়ে ভেবেছেন এবং উত্তরাধুনিকতার সমালোচনা করেছেন।

হেবারমাসের কথা ছিল : উত্তরাধুনিকেরা 'আধুনিকতা' বিষয়ে যা বলেন, তা অসম্পূর্ণ ও অনির্দিষ্ট। 'উপকরণাত্মক যুক্তি' উত্তরাধুনিকদের মতে 'আধুনিকতা'র অন্তঃসার ; অথচ এ ছাড়াও 'আধুনিকতার' আরও অনেক প্রান্ত আছে। নীটশের মতোই তারা 'সুশৃংখল অধিবিচারে' অনুৎসাহী, সেজন্যে উত্তরাধুনিকেরা আধুনিকতার সকল মূল্যের বিরুদ্ধে। আধুনিকতার সকল মূল্য ও মূল্যবোধকে তারা দূষিত, কলুষিত ও বিকৃত মনে করে।

আধুনিকতার যে বিশ্বজনীন নৈতিক বিশিষ্টতাগুলো আছে, উত্তরাধুনিকেরা তা অনুধাবন করতে পারেনি। উত্তরাধুনিকতা এভাবে প্রবেশ করেছে রক্ষণশীলতা ও অনাধুনিকতায় : য়ুর্গেন হেবারমাসের এই হল বক্তব্য।

উত্তরাধুনিকতা বিষয়ে সবচেয়ে বড় বিতর্ক : হেবারমাস বনাম দেরিদা-লিওতার। বিতর্ক বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। দেরিদা হেবারমাস ভিন্ন দুই দেশের সমকালীন দুই মনীষী ; হেবারমাসের জন্ম ১৯২৯ সালে, দেরিদার ১৯৩১-এ। দেরিদা হেবারমাসের জীবনের অভিজ্ঞতায়ও মিল আছে। হেবারমাস কিশোরবয়সে নাজীজার্মানির অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, ১৯৪০ সালে দেরিদা দেখেছেন আলজিরিয়ার যুদ্ধ।

হেবারমাসের বয়স যখন পনের কিংবা ষোল, একদিন রেডিওতে তিনি শুনলেন, নুরেমবার্গ ট্রাইবুনালের আলোচনা। অমানবিকতা, পশুভ ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, অযুক্তিতে সমস্ত লোক কীভাবে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, কিশোর হেবারমাস জীবনে প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করলেন। যে জাতির ঐতিহ্যের মধ্যে আছে কান্ট, হেগেল এবং মার্কসের মতো মহীরূহ, সে দেশে এটা কী করে সম্ভবপর : ভাবতে ভাবতে হেবারমাস সেই অল্পবয়সেই বিমূঢ়, স্তম্ভিত, নির্বাক হয়ে যান। হেবারমাসের উত্তরকালীন সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিক অন্বেষণ, জিজ্ঞাসা ও আধুনিকতার মূলে এই অভিজ্ঞতা কাজ করেছে। আধুনিক জার্মানির মানুষ পাশবিকতায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, তবু হেবারমাস আধুনিকতায় আস্থা হারাতে নারাজ।

দেরিদার ক্ষেত্রে ঘটেছে উল্টো। দেরিদা পেটি-বুর্জোয়া ইহুদী পরিবারের সন্তান ; উনিশবছর বয়সে ফ্রান্সে আসার আগে তিনি ছিলেন আলজিরিয়ায়। দেরিদা ইহুদী ছিলেন, আবার ছিলেন না ; আবার আলজিরিয়ান ইহুদী হওয়ার কারণে তিনি 'ফরাসি সাহেব'ও নন : এই কারণে দেরিদার মধ্যে কাজ করেছে বিভিন্ন কূটাভাস, মার্জিনালিটি এবং অন্যতা-অপরতার বোধ। আলজিরিয়ায় যখন যুদ্ধ তখন তাঁর বয়েস অল্প ; তাঁর মনে হয়েছে আগুন আর রক্ত আর গন্ধক আর বারুদে পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে। আত্মপরিচয়ের দ্বিমাত্রিকতা, বয়োধর্ম, মানবধ্বংসের আয়োজন, সন্ত্রাস-বৈকল্য-ভয় : দেরিদার মনোলোকে স্থায়ী জায়গা করে নেয়। এজন্যেই দেরিদা ভেবেছেন বিকল্প, ব্যবধান, ব্যাকৃতি, বিনির্মাণ, মার্জিনালিটি, অপরতা-অন্যতা নিয়ে। দেরিদার ভাবনায় ডিকন্সট্রাকশন তাই একটা সাড়া এবং একটা সংকেত : বিকল্পের জন্যে সাড়া, 'অন্য' 'অপর' 'আদারে'র প্রতি সংকেত।

দেরিদার অন্বেষণের আয়ুধ 'ভাষা' ; সমালোচনায় ডিকন্সট্রাকশন বা বিনির্মাণ বা অনন্তরঙ্গের কথা তিনি তুলেছেন, তাও এই 'ভাষা'কে কেন্দ্র করে, ভাষাকে ব্যবহার করে। ভাষার মধ্যে কাজ করে তিনি ভাষার বাইরে যাবার চেষ্টা করেছেন। এ হল ভাষার মাধ্যমে ভাষার বিরোধিতা। কথা হল ভাষা কি ? হাইডেগারের মনে এই প্রশ্ন জেগেছে এবং এর জবাবে পৌঁছুতে গিয়ে তিনি এক প্রতিবর্তিতার সমস্যায় উপনীত হয়েছেন। 'ভাষা হল ভাষা' এই হল সেই প্রতিবর্ততার সমস্যা।

ভিটগেনস্টাইনের লক্ষ্য ছিল : ভাষার সঙ্গে জগতের সম্পর্ক সন্ধান করা এবং ব্যাখ্যা করা। তাঁর মীমাংসা : যা ভাষার সীমা, তা আমার জগতেরও সীমা। তাহলে প্রশ্ন : বাস্তব

কী? হাইডেগার ও হিটগেনস্টাইনের অনুসরণে বলতে হয়: বাস্তব তাই, যা এবং যতটুকু ভাষা আমাদের জানায়। ভাষা মানে বাস্তব নয়, বাস্তব মানে ভাষা নয়, কিন্তু ভাষার বাইরে বাস্তব নেই। ভাষার রিফ্লেক্সিভিটির এই সমস্যা দেরিদাকে বিমির্নাণ, বিদ্রোহ ও জ্ঞানচেতন ক্রীড়ায় অনুপ্রাণিত করেছে। এই প্রক্রিয়ায় দেরিদা মুক্ত করে দেন 'দ্যোতকে'র সঙ্গে 'দ্যোতিতে'র সম্পর্ক: দ্যোতকের অর্থনির্মাণের নির্দিষ্টতা দেরিদা ভেঙ্গে দিয়েছেন। দেরিদা ব্যাখ্যাবিরোধী; তিনি লোগোসেন্ট্রিজম বা অর্থকেন্দ্রিকতা অস্বীকার করেন। দেরিদার মতে কোন নির্দিষ্ট অর্থ নেই, নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা নেই, বিশুদ্ধ উৎস নেই। দেরিদা উপস্থিতিকে স্বীকার করেন না, কারণ উপস্থিতির ধারণা পরাতাত্ত্বিক, মেটাফিজিক্যাল : দেরিদা পরাতত্ত্ব এবং মেটাফিজিক্সের কঠোর সমালোচক। নীটশে উক্তির স্বেচ্ছাচারের কথা বলেছেন, হাইডেগারের কামা অনন্ত মুলতুবি : জাক দেরিদার লক্ষ্য অন্তহীন তামাশা।

যুর্গেন হেবারমাস স্পষ্টভাবে রাজনীতির মধ্যে কাজ করেন, কিন্তু দেরিদার রাজনীতি কী? দেরিদার লেখার বড় বাস্তবতা: রাজনীতির অনুপস্থিতি। এজন্যে দেরিদা অভিযুক্ত হয়েছেন। অভিযোগ হল: দেরিদা সবকিছুকে 'টেক্সটে'র মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন, টেক্সটের বাইরে কোনও কিছুকে স্বীকার করেননি; টেক্সটবহির্ভূত অনুসন্ধান তার কাছে অবাঞ্ছিত। কিন্তু টেক্সট কী? কিংবা টেক্সট বলে দেরিদা কী বোঝাতে চান? 'বর্ণবাদের শেষ কথা' (১৯৮৫) নামক প্রবন্ধে দেরিদা বলছেন: টেক্সট মানে বই নয়। টেকস্ট তাই, যা অসীম এবং অফুরন্ত, যার সীমারেখা টানা যায় না। সেজন্যেই দেরিদা বলেন টেক্সটের বাইরে কিছু নেই এবং থাকে না। সেজন্যে একটা গ্রন্থের টেক্সট যেমন পাঠ করা যায়, পৃথিবীর টেক্সটও তেমনি পাঠ করা যায়। পাঠের পদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু দুটোই টেক্সট। সেজন্যেই টেক্সট সবসময়ে শক্তির একটা ক্ষেত্র, সেজন্যেই ডিকনস্ট্রাকশন কেবল গ্রন্থাগারের বই, ডিসকোর্স, শব্দগত বা বোধাত্মক ব্যাপার নিয়ে কাজ করে না। ডিকনস্ট্রাকশান একটা প্রাধিকার, হস্তক্ষেপ এবং আধিপত্যও বটে: সেজন্যে বিনির্মাণ 'কনটেক্সট' পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখে। একারণে দেরিদা বলতে চান, তাঁর বিনির্মাণ রাজনীতিহীন নয়; বিনির্মাণ বরং একটা রাজনৈতিক/আশ্রমিক অনুশীলন। বিনির্মাণ কেবল ডিসকোর্সের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ নয়; বিনির্মাণের মধ্যে বিশ্লেষণের কাজে অবস্থান গ্রহণের ব্যাপার আছে; কারণ যেসব রাজনৈতিক/আশ্রমিক গ্রন্থন ও গড়ন আমাদের অনুশীলন, প্রতিযোগ ও অভিব্যক্তিকে সম্ভবপর করে তোলে, তা বিনির্মাণের দৃষ্টিতে মনোযোগের বস্তু। দেরিদা জোর দিয়ে বলেছেন, বিনির্মাণকে রাজনীতি বা রাজনৈতিকতামুক্ত মনে করা যাবে না। তাই বিনির্মাণ প্রায়ই প্রশ্ন তোলে বিভিন্ন 'কোড' নিয়ে; যেসব কোড উদ্ভূত হয়েছে এথিক্স থেকে, রাজনীতি থেকে। দেরিদার ব্যাখ্যায় বিনির্মাণের অনুসন্ধান দায়বদ্ধ। দেরিদার লেখায় তাই দুটো রূপক ঘুরে ঘুরে আসে: 'নির্বাসিত' এবং 'পরজীবী' (এক্সাইল এন্ড প্যারাসাইট)।

তবু দেরিদার লেখায় রাজনীতির উপস্থিতি খুঁজে পাওয়া দুরূহ। বিপরীতে হেবারমাসের রচনা স্পষ্টভাবে রাজনীতি এবং রাজনৈতিকতার সঙ্গে যুক্ত। রাজনীতির বাইরে কিছু নেই এবং থাকা সম্ভব নয় : এই প্রত্যয় থেকে হেবারমাস বিনির্মাণ এবং উত্তরাধুনিকতা বিরোধী। উত্তরাধুনিকতা তাঁর ব্যাখ্যায় এন্টিমডার্ন বা কাউন্টারমডার্ন। হেবারমাস রাজনৈতিক লেখক এবং রাজনীতির লেখক। জার্মানির রাজনীতি এবং রাজনীতির সংস্কৃতি তাঁর নিত্য আলোচনার বিষয়। এই অর্থে হেবারমাস জাতীয়তাবাদীও বটে। পশ্চিমের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য থেকে জার্মানির আত্মাকে বিচ্ছিন্ন হতে দিতে তিনি নারাজ। এজন্য তিনি হাইডেগারকে স্বীকার করেছেন আবার সমালোচনাও করেছেন। যে হাইডেগার 'বিয়িং এ্যান্ড টাইম' (১৯২৬) লিখেছেন, হেবারমাস তাঁর সমর্থক; তিরিশের দশক পর্যন্ত হাইডেগার ছিলেন প্রতিযোগীহীন এক দার্শনিক ব্যক্তিত্ব, যাঁর চিন্তা জার্মানির সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে শাসন করেছে। কিন্তু ১৯২৯ সালের পর হাইডেগার তাঁর বিশ্বাস এবং প্রজ্ঞানের র‍্যাডিকালিজম থেকে বিচ্যুত হন। তাঁর লেখায় ঘুরে ঘুরে পুনরাবৃত্ত হতে থাকল দুটো শব্দ 'ভাগ্য' এবং 'নিয়তি'। হয়ত সেসময়ের বিশ্বঅর্থনৈতিক সংকট কিংবা ভাইমার রিপাবলিকের পতন এর কারণ। কিন্তু কারণ যাই হোক, এই হাইডেগারকে হেবারমাস কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। হেবারমাসের ব্যাখ্যায়: ১৯২৯ পরবর্তী হাইডেগার 'তরুণ রক্ষণশীল', যেরকম অসওয়াল্ড স্পেংলার; এবং এই হাইডেগারের উত্তরসূরী জাক দেরিদা। স্পষ্ট রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে হেবারমাস র‍্যাডিকাল এবং সমঝোতাবিরোধী। জার্মানির ইতিহাসের একটা কালো অধ্যায়ের নাম 'নাজীপর্ব'; মাইকেল স্টুমার এবং আর কোন কোন ঐতিহাসিক 'নাজীপর্ব' সম্পর্কে সহিষ্ণু এবং সমঝোতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে চান॥ জার্মানির খ্রিস্টান ডেমোক্রাটিক নেতৃত্ব যে 'স্বাভাবিকায়নে'র সূচনা করেছিল, নাজীপর্ব সম্পর্কে নীরবতার কিংবা সহিষ্ণুতার কিংবা অবিরোধিতার মনোভঙ্গি তারই পরিণাম। এসব ঐতিহাসিকদের উদ্দেশ্য, 'জার্মানির অতীত সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি' পোষণ এবং অতীতের উত্তম ইমেজরাশির উত্থাপন। আমাদের বাংলাদেশে বি.এন.পি এবং জার্মাতে ইসলামীর ইতিহাসব্যাখ্যাও এইরকম; তারা মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার প্রেরণা ও তার র‍্যাডিকালিজমকে হ্রস্ব, সংকুচিত ও লুপ্ত করতে উৎসাহী। সংকোচন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা বিষয়ে; তাদের মনোভঙ্গি : মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা মার্জনীয়।

এই অপবিশ্বাস আমাদের ইতিহাসের টেক্সটকে পরিবর্তিত করছে, এবং একারণেই বাংলাদেশে স্বাভাবিক হয়ে উঠছে মৌলবাদ, প্রতিক্রিয়াশীলতা, অন্ধতা, ফতোয়ার কলরব এবং ধর্মীয় মোড়কে সমাজের নিরীহ স্ত্রীপুরুষের নিগ্রহ। যুর্গেন হেবারমাস ইতিহাসের এই 'স্বাভাবিকায়নে'র বিরোধী, এজন্যে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান র‍্যাডিকাল এবং সুস্পষ্ট। দেরিদার মতো হেবারমাসের পক্ষে একথা মনে করা অসম্ভব যে, রাজনৈতিকতা ছাড়া কেবল টেক্কেস্টর অন্তহীন বিশ্লেষণের মাধ্যমে পৃথিবীর রাজনৈতিক, বিচারবিভাগীয় এবং নৈতিক সমস্যাসমূহের মোকাবিলা করা সম্ভব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ফরাসি সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে হেবারমাস অত্যন্ত সংশয়ী, তাই দেরিদা, লিওতার ও উত্তরাধুনিকতার তিনি সমালোচক।

হেবারমাস বলেন : 'উত্তরাধুনিক দর্শন' শেষ কথার দর্শন। উত্তরাধুনিকতা মন্ময়তার দর্শনে অন্তরীণ। উত্তরাধুনিকেরা বিশ্বাস করেন : দর্শনের হৃদয় খুঁড়ে দর্শন তৈরি হবে। উত্তরাধুনিকরা বলেছেন দর্শন এবং মেটাফিজিক্সের কাল শেষ : এই কথার মধ্যে স্বতঃসিদ্ধতার একটি ভঙ্গি আছে—যেটা কৈশোরক, অনাধুনিক, অদার্শনিক। উত্তরাধুনিকদের সমালোচনা সম্ভবপর নয়; কারণ তাঁরা শেষ কথার লোক; তাঁরা দর্শন এবং চিন্তাকে শুদ্ধ ও পবিত্র করে তুলতে চান; অথচ যে কোনও তত্ত্বের বিকাশ সংশোধন ও পরিবর্তন-সাপেক্ষ। হেবারমাস বিভিন্নসময়ে বহুরূপী উন্নাসিকতাবাদ, আপেক্ষিকতাবাদ, সিদ্ধান্তবাদ, ইতিহাসবাদ প্রভৃতির বিরোধিতা করেছেন।

হেবারমাস গণতন্ত্রে অঙ্গীকারবদ্ধ। যেমন জন ডিওয়ে তেমনই হেবারমাস গণতন্ত্রের দার্শনিক। হেবারমাস তিনজন মার্কিন চিন্তাবিদ থেকে অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেছেন—যেমন পিয়েরস, মেড এবং ডিওয়ে। এদের প্রভাবে তিনি গণতান্ত্রিক, সমালোচনাশীল, অনাবদ্ধ, আত্মসমীক্ষাপ্রবণ, প্রথাহীন, নৈতিকতানিষ্ঠ, সার্বিক অংশগ্রহণসম্ভব, মুক্তসমাজে বিশ্বাসী। তবে হেবারমাসের চিন্তাভাবনায় আনুপূর্ব প্রভাব রেখেছে একটি গ্রন্থ, আডর্নো—হোর্কেইমারের যৌথপ্রযোজিত, "ডায়ালেকটিক অব এনলাইটেনমেন্ট" (প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৪)।

দেরিদার রাজনৈতিক অবস্থান অস্পষ্ট। হ্যাঁ, নাগরিক হিসাবে তিনি বহু রাজনৈতিক ইস্যুতে উজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছেন : যেমন পৃথকীকরণের বিরুদ্ধে তিনি লড়েছেন; নেলসন ম্যান্ডেলাকে অভিনন্দিত করেছেন; ফরাসি সরকার যখন মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে দর্শন পাঠ কমিয়ে আনবার পদক্ষেপ নিয়েছিল, তিনি সক্রিয় প্রতিরোধে অংশ নেন; প্যারিসে নতুন মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে তাঁর ভূমিকা বিরাট; মানবাধিকারের অবমাননায় সরাসরি তিনি সোচ্চার হয়েছেন; নারীবাদী ইস্যুগুলোতে বক্তব্য রেখেছেন; গ্রেফতারও হয়েছেন একবার চেকোশ্লোভাকিয়ায়। তাছাড়া দেরিদা একজন ব্যস্ত ফরাসি বুদ্ধিজীবী। তবু প্রশ্ন ওঠে, তাঁর এসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর বিনির্মাণ এবং ডিকনস্ট্রাক্শনের যোগ কতটুকু। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল : আপনার র‍্যাডিকাল বিনির্মাণ তত্ত্বকে র‍্যাডিকাল অনুশীলনে পরিণত করা যায় কিনা। তিনি জবাবে বলেন: 'আমি স্বীকার করি যে, বিনির্মাণতত্ত্বকে প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান রাজনৈতিক কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত করতে চাইনি।' কারণ, তাঁর মতে, এখনও পর্যন্ত সমস্ত রাজনৈতিক কোড কিংবা পরিভাষা ভয়াবহভাবে মেটাফিজিক্যাল, পরাতাত্ত্বিক—তা ডান রাজনীতি হোক বা বাম রাজনীতি। কিন্তু প্রশ্ন হল এমন রাজনৈতিক কোড কিংবা পরিভাষা আছে কিনা যা মেটাফিজিক্যাল নয়? বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে দেরিদার স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায় না। তবে তিনি জানেন দায়িত্ব, মীমাংসা এবং বাছাই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বর্তমান পৃথিবীর সিদ্ধান্তহীন মানবিক পরিস্থিতি দেরিদার ভাবনার বিষয়। কিন্তু দেরিদা কোন্ ধরনের রাজনীতির পক্ষে? এ বিষয়ে দেরিদা যদিও নিঃশব্দ নন, কিন্তু অস্থির এবং দ্বিধাগ্রস্ত, তিনি কর্তৃত্ববাদ এবং কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে: যুক্তিবাদের মুরুব্বিরা যে কর্তৃত্ববাদের কথা বলেছেন। দেরিদার এক ভাষ্যরচয়িতা রিচার্ড বার্নস্টাইন লিখেছেন : 'দেরিদা কিসের বিরুদ্ধে তা বলা সহজ, কিন্তু কার পক্ষে বলা কঠিন।' তবে রাজনীতি বিষয়ে দেরিদাকে একেবারে নেতিবাচক অবস্থানে নির্দিষ্ট করা যাবে না।

এইটে হল দেরিদা-হেবারমাসের বিতর্কের একটা সূত্র। দেরিদা তাঁর বিনির্মাণকে 'ইতিবাচক' প্রকল্প হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে : বিনির্মাণ ইতিবাচকতার এক মুহূর্ত রচনা করেছে। লৈঙ্গিক 'ভিন্নতার' ভাবনা দেরিদাকে তাঁর বিখ্যাত 'ডিফারেন্স'-অনুষঙ্গে নিয়ে গেছে; লিঙ্গনির্ভর চিন্তা, অনুভূতি, সংস্কারের বাইরে যাওয়া যায় কিনা তিনি ভেবেছেন; এবং ভিন্নরকম মানবিক বন্ধন তাঁর কাম্য; যার ভিত্তি লিঙ্গ নয়, পুরুষ/নারীর বৈপরীত্য নয়; বোঝা যায় এমন সমাজ তিনি চান যাতে বৈষম্য নেই, বৈষম্যের ভায়োলেন্স নেই, কিংবা থাকলেও তা সহনশীল স্তরে আছে। হয়ত তিনি গণতান্ত্রিক সমাজ কামনা করেন, কিন্তু এমন গণতান্ত্রিক সমাজ নয় যার অস্তিত্ব বর্তমান পৃথিবীতে কোথাও রয়েছে।

যুর্গেন হেবারমাস ও জাক দেরিদা আসলে বর্তমান পৃথিবীর আধুনিক/উত্তরাধুনিক মানবপরিস্থিতির রূপকব্যক্তিত্ব। হেবারমাস আধুনিকতার কথা বলেন, কিন্তু সমালোচনাহীনভাবে বলেন না। তিনি আলোকপর্বের উত্তরাধিকারের কথা বলেন, কারণ তাঁর কাম্য এমন সমাজ যেখানে বিচার, সমতা এবং সংলাপাত্মক যুক্তিশীলতা প্রতিদিনের প্রাকটিসে বিকশিত। হেবারমাসের কথা হল: স্বাধীনতা, যুক্তি ও সংলাপ যদি আমাদের কাম্য হয়,

তাহলে কীভাবে আমরা সমকালের প্রশ্ন, সমস্যা, জটিলতা এড়িয়ে যাব? অন্যদিকে দেরিদার ভাবনার কেন্দ্রে আছে : অপরতা, বিকল্প, ব্যবধান। আমাদের চিন্তাপ্রক্রিয়ার কী সেই সূত্র, যার কারণে বরাবরই নির্জিত হয় 'অপরতা' 'অন্যতা' 'আদারনেস'? দেরিদার সমগ্র বিনির্মাণ প্রকল্পের মূলে আছে এই 'আদারনেস'। আধুনিককালে এই 'আদারনেস' (তার সমস্ত প্রকরণসমেত) এক বড় প্রশ্ন এবং জিজ্ঞাসা। আদারনেসের ত্রাস ও আতঙ্কে কীভাবে সাড়া দেব আমরা? 'অপরে'র এককত্ব বিষয়ে আমাদের কর্তব্য কী? এ হল এমন প্রশ্ন, যার নিরাকরণ সহজ নয়। 'আদারনেস' দেরিদাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে অবিরাম, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে; সেজন্যই কি তাঁর রাজনৈতিকতা অস্পষ্ট? অমীমাংসিত? দেরিদার সঙ্গে তাই ফ্রাঙ্কফুর্ট ঘরানার আডর্নো-বেনজামিনের অনেক সাদৃশ্য আছে কিন্তু হেবারমাসের সঙ্গে নেই। যুক্তিচর্চার প্রাতিষ্ঠানিকায়ন আডর্নোর মতো দেরিদারও ভাবনার উৎস। দেরিদার চিন্তার কেন্দ্রে আছে ভাঙন এবং ভাঙনের বোধ এবং ভাঙনের ব্যাখ্যা; আর হেবারমাসের মনোযোগের উৎস : যোগাযোগ ও যুক্তিশীলতা। হেবারমাস ও দেরিদার তাত্ত্বিক/দার্শনিক অবস্থান ভিন্ন; তাঁরা দু-জন মিলে রচনা করেছেন বিংশ শতাব্দীর আধুনিকতা/উত্তরাধুনিকতার মনোজ্ঞ রূপক।

তথ্যসূত্র

১. জঁ-ফ্রাঁসোয়া লিওতার, "দি পোস্টমডার্ন কন্ডিশন/এ রিপোর্ট অন নলেজ", (অনুবাদ : জি. বেনিংটন ও বি. মাসুমি); ইউনিভার্সিটি অফ মিনেসোটা প্রেস, ১৯৮৪।

২. জঁ-ফ্রাঁযোয়া লিওতার, "দি পোস্টমর্ডান এক্সপ্লেইনড্" প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৩; যুনিভার্সিটি অফ মিনেসোটা প্রেস।

৩. জাক দেরিদা, "অফ গ্রাম্যাটোলজি" (অনুবাদ : গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক); প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪, বাল্টিমোর, জন হপকিন্স প্রেস।

৪. জাক দেরিদা, "ডিসেমিনেশন" (অনুবাদ : প্রফেসর বারবারা জনসন) প্রথম প্রকাশ : ১৯৮১, শিকাগো য়ুনিভার্সিটি প্রেস।

৫. য়ুর্গেন হেবারমাস, "দি ফিলসফিকাল ডিসকোর্স অফ মডার্নিটি" (অনুবাদ : এফ লরেন্স); ক্যামব্রিজ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭।

৬. য়ুর্গেন হেবারমাস, 'দি নিউ কনসারভেটিজম" (অনুবাদ : শিয়ারি ওয়েবার নিকলসন), প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৯; ক্যামব্রিজ, পোলাইটি প্রেস।

গ্রন্থ-সমালোচনা

অমলেশ ত্রিপাঠীর রেনেসাঁস-ভাবনা

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

খ্যাতনামা ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী **'ইতালীর র‍্যানেশাঁস বাঙালীর সংস্কৃতি'** নামে একটি বই লিখেছেন (১৯৯৪, জানুয়ারি), যা বাংলায় রেনেসাঁস আলোচনার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসাবে স্বীকৃত হবে। নামকরণ বা প্রচারিত বিজ্ঞাপন দেখে পাঠক যদি ভেবে থাকেন ইতালির রেনেসাঁস নিয়ে বাংলায় এই প্রথম পূর্ণাঙ্গ একটি বই বের হল তাহলে ভুল হবে। আসলে এতে আছে দুটি প্রবন্ধ 'ইতালীর র‍্যানেশাঁস' ও 'আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতির আদর্শ সন্ধানে'। 'ইতালীর র‍্যানেশাঁস' নামাঙ্কিত প্রবন্ধটির দৈর্ঘ্য কুড়ি পৃষ্ঠার মতো, আর বাঙালির সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধটি একশো পৃষ্ঠার কাছাকাছি। যাঁরা বইটি এখনও দেখেননি তাঁদের ধারণা হতে পারে 'ইতালীর র‍্যানেশাঁস' নামাঙ্কিত প্রথম প্রবন্ধে আনীত সূত্র বা তত্ত্বের প্রয়োগ পাওয়া যাবে বঙ্গ-সংস্কৃতি বিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধে। তা-ও নয়। কী পাওয়া যাবে সেখানে? লেখকের জবানিতে শোনা যাক—দ্বিতীয় 'প্রবন্ধটিতে ইতালীয় বা রুশ আদর্শ কোনোটাই প্রয়োগ করা হয়নি।....আমি জোর দিয়েছি Tradition ও Modernity-র দ্বন্দ্বের উপর—আমাদের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের পুরোধাগণ ঐতিহ্য বিসর্জন দেননি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাকেই আধুনিকী-করণের কাজে লাগিয়েছেন। এই ভাবনা প্রয়োগ করি 'Vidyasagar : Traditional Moderniser' গ্রন্থে (১৯৭৪)...উল্লিখিত paradigm বর্তমান গ্রন্থে বিশদরূপে উপস্থাপিত।'

ইতালীয় রেনেসাঁসের কথা যদুনাথ সরকার বা সুশোভন সরকার প্রথমদিকে উত্থাপন করলেও এ নিয়ে প্রথম গভীরতাযুক্ত আলোচনা শুরু করেন শিবনারায়ণ রায় (১৯৫৬)। এ বিষয়ে একাধিক মূল্যবান প্রবন্ধও তিনি রচনা করেছেন। অবহিত পাঠকের তা জানা। অমলেশ ত্রিপাঠী দাবী করেছেন, প্রথম প্রবন্ধটি 'ইতালীয় র‍্যানেশাঁস নিয়ে সর্বাধুনিক গবেষণার ফলশ্রুতি।' বুর্খহার্ড্ট (১৮৬০) থেকে আজ পর্যন্ত দেশে দেশে ইতালীয় রেনেসাঁস নিয়ে যত গবেষণা হয়েছে তাদের যদি 'লণ্ডশটে' দেখা যায় তবে নজরে পড়বে তার দুটি পর্যায়। এক সময় ইতালীয় রেনেসাঁসকে তিল তিল করে রচনা করা হয়েছিল। বুর্খহার্ড্ট থেকে এর সূচনা। পরে বিশ্লেষণাত্মক গবেষণার নামে ভাঙা হচ্ছে তার নানা স্বর্গীয় ইমেজ। কেন এরকম হয়েছিল বা হচ্ছে তার উত্তর গবেষণার মৌলিকতায় যত না আছে, তার চেয়ে বেশি পরিমাণে আছে বিদ্যাচর্চার মোরগ যে অদৃশ্য মৌসুমী হাওয়ায় অভিমুখ পাল্টায় তার মধ্যে। সে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানে অবান্তর। ইতালীয় রেনেসাঁস বিষয়ে অমলেশ ত্রিপাঠীর বক্তব্য ঝুঁকে আছে দ্বিতীয় পর্যায়ের গবেষণাসারগুলির প্রতি। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি মিথ ভাঙা যদি আধুনিকতা হয়, তবে বাংলাতে সে-আধুনিকতার সূচনা 'পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদে'র অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনে (১৯৯১) উপস্থাপিত 'ইতালীয় রেনেসাঁসের কয়েকটি মিথ' অভিধেয় গবেষণা-নিবন্ধটি থেকে। (দ্র. পঃ বঃ ইতিহাস সংসদ প্রকাশিত **'ইতিহাস অনুসন্ধান'** ৭ম খণ্ড)।

রেনেসাঁসকে কেউ বলেছেন 'আধুনিক সভ্যতার উষাকাল', 'মানব সভ্যতার প্রথম বসন্ত' (সাইমন্ডস); কেউ তাকে বলেছেন, 'রেনেসাঁস মধ্যযুগের শেষ অধ্যায় ছাড়া কিছু নয়।' ভিক্তর হুগো বলেছেন, রেনেসাঁস আসলে 'the setting Sun all Europe mistook for dawn'. অমলেশ ত্রিপাঠী এখানে হুইজিঙ্গার শিষ্য।

এঙ্গেলস বলেছেন, 'প্রথম ধনতন্ত্রী দেশ ইতালি'। মার্টিন ভন সেইমতো লিখেছেন বিখ্যাত গ্রন্থ **'সোসিওলজি অব দ্য রেনেসাঁস'**। বুর্খহার্ড্ট থেকে কাসিরার আরেকদল রেনেসাঁস-ভাষ্যকার আছেন, যাঁরা রেনেসাঁসের মতো বৈপ্লবিক সাংস্কৃতিক বিস্ফোরণকে সমাজ পরিবর্তন-নিঃসম্পর্কিত স্বয়ম্ভূতত্ত্বে দেখতে চান। ত্রিপাঠীর অবস্থান স্বভাবতই প্রথম মতের বিপরীতে।

রেনেসাঁসের উৎসে ছিল 'রিভাইভ্যাল অব ক্ল্যাসিকাল লার্নিং'—প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন বিদ্যার পুনরুদ্ধার। ফাইলেলফো (হিউম্যানিস্ট) লিখেছিলেন, 'গ্রীসের মৃত্যু হয়নি ফ্লোরেন্সে সে আবার নতুন করে মাথা তুলছে'। জি. সি. সিলারি তাঁর **'দ্য রেনেসাঁস ইন ইটস নেচার অ্যান্ড অরিজিন'**—গ্রন্থে দেখাচ্ছেন এ ব্যাপারে গ্রীক সংস্কৃতির ভূমিকা প্রায় নেই বললেও হয়। ত্রিপাঠী দ্বিতীয় ধরনের 'অ্যান্টি-ক্ল্যাসিক' বক্তব্যকেই উঁচু করে তুলে ধরেছেন।

রেনেসাঁসকে একদল ভাষ্যকার ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকুলার সংস্কৃতির সূচনাকারী হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যদল, হুইজিঙ্গা, ভিনসেন্ট ক্রোনিন, ডগলাশ বুশ প্রমুখ দেখাতে চেয়েছেন, 'রেনেসাঁসে আসলে জয় হয়েছিল ক্রিশ্চিয়ানিটির'। শিবনারায়ণ রায় প্রথম মতের পোষক, ত্রিপাঠীর ঝোঁক দ্বিতীয় মতের দিকে। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য....'। কোন্ মতটিকে সর্বাধুনিক বলব?

রেনেসাঁসকে মধ্যযুগের সমাপ্তি ও আধুনিক সংস্কৃতির অভ্যর্থনাকারী হিসাবে দেখিয়েছেন কার্ল নিউম্যান, বেইল প্রমুখ। মার্টিন ভন, সাইমন্ডস এই মতেরই পোষক। হুইজিঙ্গা, হ্যাসকিনস, ডগলাশ বুশ দেখাতে চেয়েছেন মধ্যযুগ ততটা

অন্ধকার ছিল না। ওয়াল্টার উলমান রেনেসাঁসের মধ্যযুগীয় ভিত্তি নিয়ে পুরোদস্তুর একটি বইই লিখেছেন—**'মিডিয়াভ্যাল ফাউন্ডেশন অব দা রেনেসাঁস হিউম্যানিজম'**। অমলেশ এক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় অভিমতের দ্বারা গ্রস্ত। রেনেসাঁসের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে তঁর স্বঘোষিত 'সর্বাধুনিক' মতামত এইরকম—'মধ্যযুগের অর্থনৈতিক উন্নতির জোরেই র‍্যানেশাঁসের অসামান্য সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল'। (পৃ: ২১)

যতদূর জানা আছে রেনেসাঁস নিয়ে দুদিকে ঝুঁকে পড়া বক্তব্যের একদিকে আলো ফেলে তাকে আধুনিক বলে চালানোর পাশাপাশি নতুন ইতিহাস-দর্শন উঁকিঝুকি মারছে ডাবলু. কে. ফার্গুসনের মতো ভাষ্যকারদের এই ধরনের বক্তব্যে — "The Renaissance it seems to me, was essentialy an age of transition containing much that of the mixture of mediaval and modern elements, was peculialr to itself and was responsible for its contradiction and contrasts and its amazing vitality'। ভারসাম্যযুক্ত সংশ্লেষণরচনাকারী এই অভিমতেই হয়ত রয়েছে রেনেসাঁস বিষয়ে সর্বাধুনিক মতামতের পাথেয়। অমলেশ ত্রিপাঠী ফার্গুসনকে ইতিহাস-দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হিসাবে সম্মান জানিয়েছেন, কিন্তু তাঁর দর্শন গ্রহণ করেননি।

রেনেসাঁসের শিল্প চর্চা নিয়ে একটি জরুরি আলোচনা পেড়েছেন তিনি। আলোচনায় যোগ দিতে লোভ হয়। কিন্তু সামর্থ্য, পরিসর দুই-ই কম। বত্তিচেল্লির প্রসঙ্গে এসেছে রবীন্দ্রনাথের বিজয়িনীর কথা—হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো। তবে হতভম্ব হয়েছি বত্তিচেল্লির 'ভেনাসের জন্ম' ছবির ব্যাখ্যা পড়ে। ত্রিপাঠী লিখেছেন, ভেনাসের 'লীলায়িত আঙুল যেন ইচ্ছে করেই স্তন ঢাকছে না'। (পৃ: ২৮) এ ব্যাখ্যা শুনে পলিজিয়ানো তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা না ঠুকলেও আলবের্তি মুচকি হাসতেন, তাঁর চিত্রবোধ নয়, দৈহিক জ্যামিতি-বোধের স্বল্পতা নিয়ে।

আর একটি কথা না বলে পারছি না, প্রবন্ধটির মধ্যে সাল, তারিখ, ঘটনা পরম্পরা, ব্যক্তিপরিচিতি নিয়ে অবিশ্বাস্য কিছু ভুল স্থানে স্থানে জট পাকিয়ে আছে। লিখেছেন, '১৫২৭ সালে ব্রামান্তে ও রাফায়েল গত হলেন। ঐ সালেই সম্রাট চার্লসের বাহিনী রোম লুণ্ঠন করল। লেওনার্দো প্রথম ফ্রান্সিসের সঙ্গে চলে গেলেন ফ্রান্সে'। (পৃ: ৩১) লিওনার্দো মারা যান ১৫১৯ সালে। ১৫২৭ এ তিনি ফ্রান্সে যাবেন কী করে? প্রথম ফ্রান্সিসের আহ্বানে তিনি ফ্রান্সে যান ১৫১৬-র শেষ দিকে। ব্রামান্তে (১৪৪৪-১৫১৪), রাফায়ল (১৪৮৩-১৫২০)-এর মৃত্যু সাল ১৫২৭ নয়। ১৫২৭-এর রোম লুণ্ঠনের ঘটনার সঙ্গে লিওনার্দোর পেট্রন মিলানের ডিউক লোডোভিকোর পর্যুদস্ত হওয়ার ঘটনা জড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাতেও সব ভুলের ব্যাখ্যা হয় না। ঐতিহাসিক প্রতিযোগিতায় জিতে গিবার্তি ব্যাপটিস্টারির ব্রোঞ্জ গেট নির্মাণের বরাৎ পেয়েছিলেন ১৪০১ সালে, ১৪৫৬ সালে নয়। (পৃ: ১৭) যদিও গেটটির নির্মাণ শেষ করতে সময় লেগেছিল উনত্রিশ বছর। মার্টিন ভনকে খ্রিস্টবাদী ভাষ্যকার হিসাবে হ্যাসকিনস, ডগলাস বুশের শ্রেণীভুক্ত করা বিভ্রান্তিকর। (পৃ: ১৪) ভুলের প্রসঙ্গ থাক। এবার আসি দ্বিতীয় নিবন্ধটির কথায়।

'আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতির আদর্শ সন্ধানে' আখ্যাত দ্বিতীয় নিবন্ধটি পাশ্চাত্য সাহিত্য সংস্কৃতির মুহুর্মুহু উল্লেখে খচিত, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথে পরিব্যাপ্ত আধুনিক বঙ্গ সংস্কৃতির একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা। 'ঐতিহ্যসম্মিত আধুনিকীকরণে'র যে তত্ত্ব তিনি এখানে নিয়ে এসেছেন তা নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক দুই-ই চলতে পারে। **'প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ'** গ্রন্থে প্রযুক্ত সুশোভন সরকারের রেনেসাঁস তত্ত্বের পাল্টা একটি প্রকল্প হিসাবে এটি আমাদের সামনে এল। সুশোভন সরকার স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, 'বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে পশ্চিমী দৃষ্টিকে আমি প্রাচ্যাভিমানের উপরে স্থান দিই।...এই জাগরণের মূল প্রেরণা আসে নূতনের আগমনে; প্রাচীন রক্ষণশীলতা ঠিক তার আদি উৎস ছিল না...রেনেসাঁসের গঠন কার্যে প্রাচ্যাভিমানের দান অস্বীকার না করেও বলা চলে যে তার প্রাণসঞ্চার হয়েছিল পশ্চিমী চিন্তার আবাহনে।' অমলেশ ত্রিপাঠীর বক্তব্য সম্পূর্ণ এর বিপরীত। অধ্যাত্ম-ভারতবাদী অরবিন্দ ঘোষ তাঁর **'ভারতের নবজন্ম'** গ্রন্থে বলতে চেয়েছিলেন পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিঘাত অভিপ্রেত ভারতীয় রেনেসাঁসকে ঘুলিয়ে দিয়েছে। অমলেশ সেই পুনর্জাগরণবাদী আধ্যাত্মিক ভারতাভিমানকেই নতুন তত্ত্বের মোড়কে পরিবেশন করেছেন। তাঁর মতে ইতালীয় রেনেসাঁসে শিল্পের মতো উনিশ শতকে বঙ্গ সংস্কৃতির বিজয় বৈজয়ন্তীর ক্ষেত্র 'spiritual saga'। বাঙালির সংস্কৃতিতে সঙ্গীতাদি নানা ব্যাপার থাকতে চিত্রকলা নিয়ে প্রলম্বিত আলোচনা করেছেন তিনি। এরও মূল নিহিত ছিল অরবিন্দের বক্তব্যে। পুনরুজ্জীবনবাদী অরবিন্দ মনে করতেন ভারতীয় রেনেসাঁসের যথার্থ প্রতিফলন ক্ষেত্র সাহিত্য নয়, চিত্রকলা। বাঙালির চিত্রকলা নিয়ে সমৃদ্ধ আলোচনায় আপত্তি নেই কিন্তু ইতালীয় রেনেসাঁসের সর্বোত্তম প্রতিফলন ঘটেছিল চিত্রে ('Painting was the art of arts of Italy') সুতরাং বঙ্গীয় রেনেসাঁসেও সেই ব্যাপারই ঘটে থাকবে—এ রকম একটা ধারণা থেকে যদি এ আলোচনার জন্ম হয়ে থাকে তা হলে আমার 'নোট অব ডিসেন্ট' দেওয়া থাকল। অবন ঠাকুর, নন্দলাল দেশীয়

চিত্রান্দোলনের ক্ষেত্রে অবশ্যই বড় শিল্পী, কিন্তু মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর সিস্টিন চ্যাপেল ফ্রেস্কোমালার 'অ্যাডামের সৃষ্টি'র পাশে অবন ঠাকুরের 'ভারতমাতা'র আর্ট প্লেট রাখা নিষ্পাপ শিশুর মতোই দুঃসাহসিক।

ইংরেজি উদ্ধৃতি ও উল্লেখে অতিকণ্টকিত (ডিরোজিয়ানদের পক্ষে যা অপরাধবিশেষ) হলেও অমলেশ ত্রিপাঠী আসলে সেই ট্রাডিশনালিস্টদের উত্তরাধিকারী যাঁরা মনে করেন পাশ্চাত্যপন্থী ইয়াং বেঙ্গলরা বঙ্গীয় জাগরণের পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ, সংস্কৃতজানা পণ্ডিত বলে বিদ্যাসাগরকে জাতে নেওয়া যায়, বিজ্ঞানমনস্ক অক্ষয় দত্ত সম্পর্কে যতটা কম বলা যায় ততটাই ভাল, মাইকেল সম্পর্কে ঢোঁক গিলে একটু প্রশংসা না করলে নয়; বঙ্কিম-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে এসে তাঁরা গলার স্বর পঞ্চমে তোলেন [তিনি (রামকৃষ্ণ) আবার আমাদের হারানো ঈশ্বরকে ফিরিয়ে দিলেন..., (পৃ: ৭৫)], শান্তিনিকেতন-গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথকে বেশ বড় মাপেই দেখতে পান, কিন্তু রাশিয়ার চিঠি-কালান্তরের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করেন। ডিরোজিওর ছাঁটাই মিটিঙে মেম্বার হিসাবে উপস্থিত থাকলে বা বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সপক্ষে বিপক্ষে স্বাক্ষরাভিযানের ইস্যু পুনরায় সামনে আনা হলে ট্রাডিশনালিস্ট রেনেসাঁস-ভাষ্যকাররা কী করতেন তা আমাদের জানা, 'ট্রাডিশনাল মর্ডানাইজেশন'-তত্ত্বের প্রবক্তা তাদের থেকে কতটা স্বতন্ত্র তা হয়ত জানা যেত। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'যদি গীতোক্ত নিষ্কামকর্মের আদর্শে তিনি বিশ্বাস করতেন, অর্থাৎ সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করতে পারতেন, এত দুঃখ পেতেন না।' (পৃ: ৭৫) প্রণবরঞ্জন ঘোষ তাঁর **'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য'** গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের দুঃখে বিগলিত হয়ে প্রায় এইরকমই করুণা-লাঞ্ছিত একটি প্রেসক্রিপশন করেছিলেন। রোগী হিসাবে বিদ্যাসাগরের ভাগ্য ভাল, এইসব দিগ্‌গজ ডাক্তারদের হাতে জীবৎকালে তাঁকে পড়তে হয় নি।

বৈচিত্র্যময় মননশীল ও সৃজনশীল রেনেসাঁসের রূপ নির্ণয়ে বিশেষ একটি তত্ত্ব গ্রহণ করলে কী বিপদ হতে পারে হুইজিঙ্গা বলেছিলেন সে কথা। সেই সতর্কবাণী অমলেশ ত্রিপাঠী উদ্ধারও করেছেন, 'Whoever casts a single schema as a net to recapture the Proteus will catch himself in its meshes' (পৃ : ১৮)। বইটি পড়ার পর বলতে পারি অমলেশের (ঐতিহ্যসম্মিত আধুনিকীকরণ) তত্ত্বের জানালা গলে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অনেক রূপোলি ইলিশই পালিয়েছে, কিন্তু ধরা পড়েছেন তিনি নিজে। ইতালীয় রেনেসাঁস, বঙ্গীয় রেনেসাঁস উভয় প্রসঙ্গেই তাঁর 'schema' 'single'। তা সত্ত্বেও বলা যায় তার রেনেসাঁস-প্রকল্প যাঁদের চিত্ত জয় করবে ঋতু-বৈগুণ্যে তাঁদের সংখ্যা এদেশে ক্রমবর্ধমান। বিদ্যাচর্চার মোরগ অভিমুখ পাল্টায় হাওয়া বুঝে। হাওয়া এখন 'spiritual saga'র পক্ষে বড়ই অনুকূল।

প্রবীর সেনের আঁকা দৃষ্টিশোভন প্রচ্ছদ, মধ্যে বেশ কয়েকটি আর্টপ্লেট, আধুনিক মানের চমৎকার ছাপাই, বই অনুপাতে স্বল্প মূল্য পাঠককে চুম্বকের মতো টানে। তত্ত্ব লেখকের নিজস্ব। রুচি অনুসারে পাঠক তার সঙ্গে সম্মত বা অসম্মত হবেন। কিন্তু এমন একটি বইয়ে মুদ্রণপ্রমাদজনিত বানান ভুলের বহর দেখে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

ইতালীর র‍্যানেশাঁস বাঙালীর সংস্কৃতি — অমলেশ ত্রিপাঠী/ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯ / ৪০ টাকা

মতিলাল শীলের জীবন বৃত্তান্ত

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

মতিলাল শীল ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসার পয়সায় জমিদারি কিনেছিলেন। শিক্ষা এবং নানা জনহিতকর কাজে তাঁর মন ছিল।—মতিলালের এই সংবাদ সকলেরই জানা। কিন্তু তাঁর সময় এবং তাঁকে একই সূত্রে গেঁথে একটি চমৎকার গবেষণার অবকাশ আছে। ঐ সময়ের কোনও কোনও ব্যক্তিকে নিয়ে কিছু কিছু কাজ হয়েছে, কিন্তু আরও বিস্তৃত তল্লাশের প্রয়োজন। ১৮৬৯ সালের ২৩ এপ্রিল কিশোরীচাঁদ মিত্র বড়বাজার লিটেরারি ক্লাবের ত্রয়োদশ বার্ষিক সভায় একটি বক্তৃতা দেন। বিষয়: দ্য লাইফ অ্যান্ড ক্যারেক্টার অব দ্য লেট বাবু মতিলাল শীল। বক্তৃতাটি মতিলাল শীল এস্টেট ট্রাস্ট থেকে পুস্তকাকারে ছাপা হয় (১৮৬৯)। শ্রীশ্যামল দাসের সম্পাদনায় **Mutty Lall Seal** বইটির পুনর্মুদ্রণ হয়েছে (১৯৯৩)। বাংলা তথা ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে মতিলালের এই ছোট্ট জীবনীগ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই 'শাসক এবং বণিক' ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতার কয়েকটি পরিবারের সহায়তা পেয়েছিল। ব্যবসা ও অন্যান্য সূত্রে কোম্পানির সঙ্গে কলকাতার ঠাকুর, সিংহ, ঘোষাল, দেব প্রভৃতি পরিবার গাঁটছড়া বেঁধে ধনবান হয়ে ওঠে। সেই অর্থে তাঁরা জমিদারি কেনেন। এ ব্যাপারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাঁদের সহায় হয়েছিল। একাধারে এই ব্যবসায়ী ও জমিদার শ্রেণীর কর্মস্থল ছিল ভারতের রাজধানী কলকাতা। পূর্ব ভারতের অন্যতম বন্দর। এই মুৎসুদ্দি বেনেরাই

বাংলার সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করেছিল। এঁদের সঙ্গে বুদ্ধিজীবীরা যুক্ত হয়ে যে ধর্মীয় দোলাচলের সৃষ্টি করেছিল তা সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসে আধুনিকতা এনেছিল। সে আধুনিকতায় অবশ্যই ঔপনিবেশিকতার স্পর্শ ছিল। আধুনিকতার অন্যতম হাতিয়ার শিক্ষা জারিত হয়েছিল ঔপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি দ্বারা। বাঙালি ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বণিক সম্প্রদায় বাণিজ্যের খাতিরেই ইংরেজি শিক্ষার দিকে ঝুঁকেছিলেন। উপনিবেশবাদীরাও সেই সুযোগে শিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে, জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে এদেশের মানুষের মননে নিজেদের স্থায়ী রং ধরাতে চেষ্টা করেছেন। হিন্দু কলেজ, পশ্চিমী শিক্ষাবিদ্‌দের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এদেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মূল লক্ষ্য কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষাই। তাই মেকলের মিনিট (১৮৩৫) উদ্ধত হলেও গৃহীত হয়েছিল অনায়াসেই।

১৮২৫ সালে রামদুলাল দে-র মৃত্যুর পর এদেশের বাণিজ্য নতুন মোড় নিয়েছিল। কিন্তু পুরনো বাণিজ্যিক ঐতিহ্য "with its strong speculative bias still produced merchants like Motilal Seal and Biswanath Motilal both of whom attained great prominence in the thirties and forties." (Pradip Sinha, 'Social Change', N. K. Sinha ed. History of Bengal (1757-1905), Calcutta University,1967, p. 398). শুধু এঁরাই নন, দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো ব্যবসায়ীর আবির্ভাবও উল্লেখযোগ্য। মতিলাল, দ্বারকানাথ এবং অন্যান্য দেশীয় বণিকরা দেশি-বিদেশি বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পুঁজি বাড়িয়ে তুলেছিলেন। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য ছিল তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। সুতিবস্ত্র, লোহা আমদানি ছাড়াও জাহাজ ব্যবসায় ভারতীয় মুৎসুদ্দিদের মনোযোগ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। ইউরোপীয়দের সঙ্গে যৌথ কারবার খুলেছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, ব্যবসালব্ধ অর্থ ভূমিতে নিয়োজিত হল অর্থাৎ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ছোট-বড় জমিদারি এঁদের হস্তগত হয়। এতে দেশীয় অর্থনীতির উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

এই সমাজ-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেই মতিলাল নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। হয়ে উঠেছেন অন্যতম স্তম্ভ। মূলত ব্যবসায়ী অর্থাৎ মুৎসুদ্দি বেনে। সেই অর্থে ভূসম্পত্তির মালিক এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারক-বাহক। যুগোপযোগী চরিত্র গঠনে তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

১৭৯২ সালে কলকাতার কলুটোলায় এক সুবর্ণবণিক পরিবারে মতিলালের জন্ম। বাবা চৈতন্যচরণ। কাপড়ের ব্যবসায়ী। মতিলাল নিত্যানন্দ সেনের পাঠশালা এবং ইউরেশিয় মার্টিন বউলের ইংরেজি স্কুলে পড়াশুনা করেন। পরবর্তীকালে স্বচেষ্টায় তাঁর ইংরেজি জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে তোলেন। সামরিক বিভাগের উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ায় মতিলাল "received their orders to supply them with stores." (পৃ. ৭)। কিছুদিন পরে বালি খালের আবগারি দারোগা হন। তাছাড়া মৃত কমললোচন মল্লিকের সম্পত্তি দেখাশোনার দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়। কমললোচনের স্ত্রী মতিলালের খুড়তুতো বোন। তাঁর অনুমতি নিয়ে মতিলাল ঐ সম্পত্তির কিছু অংশ নিজ ব্যবসায় খাটান। কিন্তু ব্যবসায় ক্ষতি হয়। তবু তিনি তাঁর ব্যবসা চালিয়ে যান। "In his days, neither the joint-stock principle nor the limited liabilities principle had been developed. Prudence was the leading principle had been developed." (পৃ. ৮)। এরপর তিনি শিশি-বোতল-ছিপির ব্যবসা করে মোটা টাকা লাভ করেন। ১৮২০ সালে সেকালের এক বড় ব্যবসায়ী মি. স্মিথসনের বানিয়া হন। এবং কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ১৮৩৪ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারত এবং চিনে ব্যবসা করা বন্ধ করলে কোম্পানির কর্মচারীরা নানা ব্যবসায় লিপ্ত হন। এই কর্মচারীদের একাংশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয় এবং বাজার থেকে নানা রকম জিনিস সংগ্রহ করে সরবরাহ করার ফরমাশ পান। এই সরবরাহের কাজ করে তিনি লাভবান হয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দু-বৈষ্ণব মতিলাল সংস্কারবশত গরুর চামড়া সরবরাহ না করায় প্রায় দু লাখ টাকা উপার্জন থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন।

মতিলাল ক্রমশই ইউরোপীয় বণিক কোম্পানিগুলির 'বানিয়া' হয়ে ওঠেন। কিশোরীচাঁদ এই কোম্পানিগুলির একটি তালিকা দিয়েছেন—Messers. Leach, Kettlewell; Mess. Livingstone, Syreres & Co.; Mess. McLeod, Fagan & Co.; Mess. Chapman & Co.; Mess. Tulloh & Co.; Mess. Ralli, Mavrojani; Mess. Oswalld, Seal & Co. এবং Mess. Kelsall & Co. এই সংস্থাগুলির সঙ্গে একযোগে কাজ করার পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগে নীল, চিনি, চাল এবং শোরার ব্যবসা করেছেন। শুধু তাই নয়, "Mutty Lall was the founder and promiter of the first indigo-mart which was established here under the style of Messrs. Moor, Hickey & Co." (পৃ. ১১)। ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে নীল ব্যবসার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি হটে যাননি। এটা কম কথা নয়।

ব্যবসা ছাড়াও তিনি বিশাল ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। পুরনো জমিদাররা ক্রমশই তাঁদের জমিদারি হারাচ্ছিলেন। জমির মালিকানার দ্রুত পরিবর্তনের পিছনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অশুভ খেলা তো ছিলই, সেই সঙ্গে ছিল "the extravagance and recklessness of

the Zemindars, litigation and non-productiveness caused by neglect and mismanagement, as well as by drought and inundation." (পৃ. ১৪)। বণিক শ্রেণী ভূসম্পত্তি কিনে ভূমিকেন্দ্রিক অভিজাত শ্রেণীতে পরিণত হল। মতিলালও তাই হলেন। তাছাড়া অন্য উপায়েও তাঁর হাতে জমিদারি এসে গিয়েছিল, যেমন, জমিদারদের ঋণ দেওয়ার মাধ্যমে এবং বন্ধকি জমি জমিদাররা ছাড়াতে না পারার ফলে। জমিদারি ছাড়াও তিনি শহর এবং শহর সংলগ্ন অনেক সম্পত্তি কিনছিলেন। ডক্টর জ্যাকসনের কাছ থেকে 'ধর্মতলা বাজার' কেনার বিষয়টি মতিলালের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মতিলাল জাহাজ ব্যবসায়ও পুঁজি বিনিয়োগ করেছিলেন।

অর্থোপার্জনের ফিকিরটাই মতিলালদের জীবনের একমাত্র ঘটনা নয়। সমাজ-শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে রয়েছে তাঁদের অবদান। রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, মতিলাল শীল এবং অন্যান্যরা তৎকালীন বাংলাকে রূপায়িত করতে চেয়েছেন পশ্চিমী ঢঙে, আনতে চেয়েছেন আধুনিকতার জোয়ার। তাঁদের উদ্দেশ্য রূপায়ণের জন্য যে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন সেটা তাঁরা অনুভব করেছিলেন। সেই জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হিন্দু কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পিছনে বেসরকারি উদ্যোগই ছিল প্রধান।

মতিলাল ১৮২৪ সালে কলুটোলায় শীলস্ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। উপস্থিত ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স পীল এবং বহু গণ্যমান্য ইউরোপীয় এবং দেশীয় ব্যক্তি। বিনা বেতনে প্রায় ৩৬০ জন ছাত্র এখানে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠানের নাম হয় 'শীলস্ ফ্রি কলেজ'। কিশোরীচাঁদ লিখেছেন, "It is now one of the best conducted educational institution in this metropolis." (পৃ. ২৪)।

ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে তিনি ছিলেন সচেতন। "He never tolerated the religious dodge, and considered it the worst," (পৃ. ২৫)। ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা রদ করা হলে পরের বছর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'ধর্মসভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সভার উদ্দেশ্য ছিল সতীদাহ প্রথা রদের বিরোধিতা করা। মতিলালকে বারবার ঐ সভায় যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। মতিলাল "did not join the Sabha because the Sabha was a misnomer, and was in reality not a Dharma but an A-Dharma Sabha-a Society not for the preservation and promotion, but for the transgression and subversion of religion and religious duties." (পৃ. ২৬)। অপরপক্ষে তিনি হিন্দু বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। "Mutty Lall had offered a liberal reward to the person who should have the moral courage to marry a Hindu widow." (পৃ. ২৭)। তিনি অন্যান্য সামাজিক সংস্কারেরও পক্ষপাতী ছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর চর্চার ক্ষেত্রে কিশোরীচাঁদ মিত্রের লেখা এই ছোট্ট জীবনীটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আরও মূল্যবান হয়ে উঠেছে ছ'টি পরিশিষ্টের সংযোজনে—১. Indenture of Deed of settlement, made between Mutty Lall Seal and Jugantanundo Mullick and others, and dated the 21st February 1848, ২. A List of properties, the subject of the Deed of settlement of 21st February 1848, ৩. Will of Mutty Lall Seal, dated the 7th Joisty 1251=19th May 1854, referred to in the written statement of Kanny Lall Seal, ৪. List of properties, ৫. Property at 66 Collootollah, ৬. Genealogical table. এই বইয়ের সম্পাদককে ধন্যবাদ। তাঁর পরিশ্রম সার্থক। শেষে একটা প্রশ্ন: অন্য লেখকের লেখা বই কি সম্পাদক কাউকে উৎসর্গ করতে পারেন?

Mutty Lall Seal — Kissory Chand Mitra, Ed. by Syamal Das/Toolat, Calcutta/ Rs. 60.00

একজন খাঁটি দেশজ মানসিকতার কবি

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

বেণু দত্ত রায়ের 'বাংলার চাঁদ দেখ' বইটি শেষ করে বহুক্ষণ অভিভূত হয়ে বসেছিলাম। গত দশ বছরে এর চেয়ে অনেক ভাল বই এবং অধিকাংশক্ষেত্রে খারাপ বই অনেক পড়েছি, কিন্তু এমন ঘোর লাগানো কাব্য-অভিজ্ঞতা সাম্প্রতিক কালে খুব কমই হয়েছে। বাংলার চাঁদ দেখে কবি আমাদের তা দেখিয়েছেনই শুধু নয়, যে বাংলার কথা আমরা ভুলে গেছি—যে যজ্ঞিডুমুর, ন্যাড়া শিবতলা, নিভৃতরাত্রির ঝিল্লিরবের কথা আমরা ভুলতে বসেছি, পূব-বাংলার খাল বিল নদী নালা, মাঠজমি, ধানের জাঙাল, জামীরের ভ্রষ্টফল ছোঁয়া সেই চাঁদ

এপার ওপার তাবৎ বাংলার সমস্ত পথ ঘাট, বালিকার নতুন কিশোরী শরীর, চৈত্রনিশীথের দাওয়ায় শীতল পাটিতে শুয়ে ঠাকুরমার গল্পকথা হয়ে কুহক-দ্বীপের দিকে ভেসে যাওয়া, চাঁদ দেখে তাকে স্বপ্নের ভিতরে নিয়ে আসার যে নিষ্পাপ উৎসব—সবই কবি বেণু দত্তরায় আমাদের দেখিয়েছেন।

বস্তত জীবনান্দের "রূপসী বাংলার" পর এমন স্মৃতিছেঁচা ঘাসমাটির গন্ধসমাকুল রচনা খুব বেশি পড়েছি বলে এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

এক সময় বেণু দত্তরায়ের কবিতা বাংলাভাষার সমস্ত নামীদামী কাগজে প্রকাশিত হত সেটা পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যবর্তী দশকে। তারপর তার লেখা খুবই কম চোখে পড়েছে। কিন্তু যখনই পড়েছে দেখেছি তার মধ্যে একজন খাঁটি দেশজ-মানসিকতার কবিকে। তারপর প্রায় দুদশক পরে পেলাম ঊনচল্লিশ পাতার এই সুদীর্ঘ কবিতাটি। জীবনানন্দ একবার লিখেছিলেন দীর্ঘ কবিতা হচ্ছে সেই অভ্রান্ত নিরিখ যেখানে কবির ক্ষমতা নির্ভুলভাবে ধরা পড়ে। আসলে দীর্ঘ কবিতা অনেকাংশে সার্থক মার্গসঙ্গীতের মতো যার স্বচ্ছলতা ও ক্রমবর্ধমান দ্রুতি আমাদের ঘাড় ধরে আদ্যপ্রান্ত পড়িয়ে নেবে। চাই শব্দ ও পংক্তিবিন্যাসের সেই উর্ধ্বশ্বাস ও মোহময় বিন্যাস, যা পাঠককে আক্রমণ করবে এবং অনতিবিলম্বে তাকে অধিকার করবে। এই একটিমাত্র কবিতার কাব্যগ্রন্থটি সে ভূমিকা অনেকখানিই পালন করেছে। ভূতে পাওয়া মানুষের মতো, আশিরপদনখ আবেগতাড়িত হয়ে প্রায় দুকুলপ্লাবী উচ্ছ্বাসে কবি ভেসে যাওয়া সত্ত্বেও—একথা স্বীকার করতেই হবে। তাই দেখা যায় একটি-দুটি অতি বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া এই অতিদীর্ঘ কবিতায় প্রশ্নচিহ্ন, কমা ছাড়া কোনো পূর্ণচ্ছেদের যতিচিহ্ন প্রায় নেইই। পড়ে বোঝা যায় সত্যি তার প্রয়োজনও ছিল না। যেন চাঁদমাতাল দৌড়ে থামার কোনও অবকাশই কবির ছিল না।

কাব্যগ্রন্থটি শুরু হয়েছে এইভাবে—

"বাংলার চাঁদ দেখে
বাইরে এসেছি
দোর খোলো আউল-বাউল
হাওয়া, দেউল-দেহারা
যজ্ঞিডুমুর ও নীলজল
স্বপ্নের ভিজে মাঠ
... ...
হিমস্বাদ নীরবতা মেখে-চুখে
ভাতঘুম, নিম-নিশিন্দের
    ললিতবিস্তার
দোর খোলো।"

আসলে কোনও লৌকিক দরজা নয়, মনের ভিতরদেউলে প্রবেশ করার জন্যই এই দরজাখোলার নান্দীপাঠ।

গ্রাম, গ্রামীণ অনুষঙ্গ, কী চমৎকার ভাবে উঠে এসেছে তার কয়েকটি উদাহরণ:

"মনসা-বীজের বাংলা, ন্যাড়া শিবতলা...বট...
ছাতিমপুরের মাটি
    দোর খোলো
কতদূর থেকে আজ বৃষ্টি আসে
করমচা ফুলে-ফুলে বৃষ্টি মেঘে মেঘে...
জয়সিদ্ধি গ্রামে কাল ছিল
বাউলের মেলা।"

অথবা

"জামীরের মতো তীব্র ভ্রষ্টফল আর্তনাদ
মৃত্যুভীত নিজের অজান্তে
কারা যেন
কার্নিশের ধার ছুঁয়ে এসে দ্যাখে
মাঠ-জমি চোর-কাঁটা ধানের জাঙাল
ভুল খতিয়ান ধরে ডেকে-ওঠা
    কবেকার...ছাঁচি-কুমড়োর ডগা পানি-ঘাস
    দূরশ্রুত একা ঘুমিয়েছে
    নির্জন নিশীথ-স্বপ্ন কারা যেন"

কবির প্রশ্ন এই রূপময়ী বাংলা কি তার নিসর্গনন্দিতরূপ, তার অফুরান সৌন্দর্যোর উৎস কিংবা বিষাদ, হতাশা, এমনকি পাপ নিজে জানে?—

"বাংলা কি তার নিজেকে জানে? জানে তার
সুগোপন সুখ! দুঃখ? চাওয়া-পাওয়া?
বিষাদ-হতাশা?
জানে তার পাপ? গোপন কান্না?
বেত-ঝোপ, বুকের ভেতরে
ডাহুকের ডাক?
জানে হিরণ্য প্রেম ও তপস্যা? গিরি-নদী
সমুদ্র ও মৃত্যুকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে...তীব্র স্বর...
ছড়িয়ে ছাপিয়ে...জানে?"

আরেকটি উদ্ধৃতি:

আমি বাবুহাটের রেল-লাইনে দাঁড়িয়ে / চাঁদ চাঁদ বলে ডেকে উঠি / দেখি বট-পাকুড়ের ডালে / যায় ভেসে যায় অমল স্তোত্র / দেখি, সিজ-বৃক্ষের ছায়ায় / অনন্তমূলে অনন্তচাঁদ নাভিপদ্মে / চোখের খিলানে বাহু-মূলে, / ভ্রু-রেখায়, চিবুকের দিকে / দেখি সুখ ও দুঃখ আলোচালবাটা দাগ / আল্পনা, জন্ম-যৌবন, / সোনার কৌটোয় আলাভোলা / দেখি, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-জরা ভেসে যায়— / পাপ ও পুণ্য—হেঁতালের লাঠি-হাতে / চাঁদ সদাগর'।

এবারে শেষ উদ্ধৃতি: "আমি শীতলক্ষার জলে / তার অঙ্গ দেখেছি—মেঘনার মেঘ-নীল জলে— / আমি নারাণগঞ্জ ইষ্টিশানের জেটিতে / দীর্ঘছায়া নিয়ে হেঁটেছি— / বন্ধুদের নিয়ে গেছি গৌড়-পাণ্ডুয়ায় / বিখ্যাত ধুলোয়—কবে যেন— / দ্বিতীয় জন্মের মতো / খল্‌খল্ রক্তে ও তৃষ্ণায় / আমাকে ভীষণ দুঃখ দিয়েছিল অনন্তমুহূরী / পদ্মপুরাণের গানে নেচেছিলো জল সাক্ষী করে"।

বলাই বাহুল্য, কারো কারো মনে হতে কয়েকটি জায়গায় জীবনানন্দ তাঁর রূপসী বাংলা নিয়ে উঁকি মেরেছেন। আসলে কিছু কিছু নিসর্গসম্পদ, কিছু কিছু বোধ ও বিবেককে চিরকালই সমালোচনার বাইরে রাখতে হয় আমাদের। আমরা যারা পূর্ববাংলায় জন্মেছি, তার জল হাওয়া শরীরে নিয়ে বড় হয়েছি, জীবনের প্রথম সেই বছরগুলি নিশ্বাসপ্রশ্বাস ধমনীতে তো থেকেই গেছে। তাই এই গ্রন্থ যেন আয়না হয়ে আমাদের সামনে এসেছে। আমাদের ভুলে যাওয়া মুখোশহীন মুখটিকে নতুন করে দেখিয়েছে। মনে পড়িয়ে দিয়েছে জননী মাটি ও মাথার ওপর চির অভিভাবক চাঁদকে।

পাঠক লক্ষ করেছেন নিশ্চয় আমি কোনরকম নৈয়ায়িক বিশদতায় যাচ্ছি না। বলছি না ইচ্ছে করলেই কবি আরও মিতভাষী হতে পারতেন। আবেগের বল্গাকে আরেকটু নিয়ন্ত্রণে রাখলে দীর্ঘ কবিতা হিসাবে এর কোন নান্দনিক ক্ষতি হত না। আসলে প্রিয় নাম যেমন অধিকন্তু হলেও খারাপ লাগে না, কেননা যেখানে বিচার নেই, বিবেচনা অনুপস্থিত—আমার কাছে এই গ্রন্থ যেন তেমনই এক বিবেকী প্রত্যাবর্তন। আরেকবার নিজের কাছে ফিরে আসা।

চাঁদের হাত ধরে কবি আমাদের ওপার-বাংলা এপার-বাংলা ঘুরিয়ে এনেছেন। দেশাচার লোকাচারের অনেক নিহিত তাৎপর্য মেলে ধরেছেন। না, অলঙ্কারশাস্ত্রের কোনও রস নয়, যিনি কবিপরিচিতি লিখেছেন তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতেই হয়—এ বই-এর যদি কোনও রস থেকে থাকে তবে তা বঙ্গ রস।

বাংলার চাঁদ দেখ — বেণু দত্ত রায়/দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা—৭৩ / ১৫ টাকা

ভিন্ন সময়ের তিন কবি এবং একটি ভিনদেশী উপন্যাস

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

বাংলা কবিতাকে ঘিরে কৃত্তিবাস কবি-গোষ্ঠীর যে কলরোলময় আন্দোলন শুরু হয়েছিল পঞ্চাশের দশকে; তা যে লক্ষভ্রষ্ট এবং নিষ্ফল হয়নি, তা আমরা ইতিমধ্যে মর্মে উপলব্ধি করেছি। এই গোষ্ঠীর কবিদের প্রায় সকলেরই প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য ছিল যে, কবিতাকে আক্ষরিক এবং সাংকেতিক অর্থে, শুধুমাত্র কবিতাই হতে হবে, অন্য কিছু নয়। বলা যায়, সমস্ত রকম অ-কবিতা থেকে কবিতাকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন এঁরা। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি প্রাধান্য পেয়েছিল এঁদের কবিতায়; বলাই বাহুল্য, সেসবের মধ্যে, রক্তমাংসের প্রেম, যৌবনের সংরাগময় স্ফূর্তি,—প্রিয় বিষয় ছিল এই গোষ্ঠীর কবিদের কাছে। এসবের সঙ্গেই আরও কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ ছিল এঁদের কবিতার। যাকে আমরা বলে থাকি 'পোয়েটিক ডিক্‌শান',—সেই কাব্যভাষাকেও এঁরা করে তুলতে চেয়েছিলেন ধারলো, ছিপছিপে, বাহুল্য-বর্জিত; প্রত্যক্ষ এবং সজীব। মানুষের মৌখিক ভাষাকে জীবনের বাস্তবতা থেকে সরাসরি তুলে এনে এঁরা প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন কবিতায়। এই সময়ের কিছু কবির বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা আজও দেখলে স্বীকার করতেই হয়, পাঠক তাঁদের গ্রহণ করেছিলেন। আর প্রায় চল্লিশ বছর আগে, যেসব লক্ষণ বাংলা কবিতাকে বিচিত্র করে তুলেছিল, আজ, এতদিন পর, পরবর্তী দশকগুলির ধারাবাহিকতায়, তা প্রায় আধুনিক কবিতার মূল চরিত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত।

এই কথাগুলি মনে এল, কৃত্তিবাস-গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান অশ্বারোহী— শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ —'সোনার পিত্তলমূর্তি ওই' পাঠ করে। শরতের প্রথমদিকের কবিতা ভরপুর ছিল যৌবনের সদম্ভ উচ্ছ্বাসে;—'রাত বারোটার পর কলকাতা শাসন করে চারজন যুবক'—তাঁর কবিতার এই একটি বহু-উদ্ধৃত লাইন এখন প্রায় প্রবাদের মতোই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কৃত্তিবাস-গোষ্ঠীর অধিকাংশ অগ্রগণ্য কবিদের সঙ্গে, তাঁর মানসিকতায় এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রচুর অমিলও চোখে পড়েছিল আমাদের। যেমন তাঁর সতীর্থরা যখন তাঁদের কবিতায় দেহজ প্রেমকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তখন শরতের কবিতায় লক্ষ করা গিয়েছিল প্রেমহীনতার বিষাদ এবং যৌবন প্রতিদিন একটু একটু করে হারানোর নিঃশব্দ যন্ত্রণা।—'এখানে বুভুক্ষা শুধু, তোমার আসন কোথা— প্রেম / আজকে তোমাকে তাই হৃদয়ে লুকিয়ে রাখলেম'—এরকম লিখেছিলেন শরৎই তাঁর যৌবনে। এবং সে কারণেই বোধহয় আরো কিছু পরে শরৎ একটি কবিতায় বিদ্রূপ করেছিলেন এভাবে—'প্রেম শব্দটি বর্তুল মনে হয়। / টেলিফোনে বলা যায় না, হৃদয়? হৃদয় ছিল আমাদের / পুরাতন নফরের নাম...'ইত্যাদি। শরতের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে। আর সাম্প্রতিক গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৩৯৩। প্রায় তিন দশকের ব্যবধানে শরতের কবিতা পরিণতির কোন্ স্তরে উত্তীর্ণ;—এই প্রশ্ন স্বাভাবিক কারণেই পাঠকের মনে হয়ত জাগবে।

বাগাড়ম্বর না করেই বলা যায়, শরৎ তাঁর দীর্ঘদিনের কাব্যচর্চায়

এক ধরনের প্রত্যাশিত পরিণতিতে পৌঁছতে পেরেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটির বহু কবিতাই এই বক্তব্যের প্রমাণ রাখবে। এই কবিকে ধারাবাহিকভাবে যাঁরা অধ্যয়ন করেছেন, তাঁদের নিশ্চয়ই এরকম মনে হয়েছে যে, কবিতা লিখতে এসে শরতের সামনে দুটি লক্ষ্য ছিল —এক হল, তিনি যে ধরনের কাব্যদর্শনে বিশ্বাসী, বিচ্যুতিকে প্রশ্রয় না দিয়ে, তাকেই অনুসরণ করা সারাজীবন। এবং দুই হল, জীবনকে নির্মোহভাবে, নিরাসক্তভাবে, নৈর্ব্যক্তিকতার এক কৌণিক বিন্দু থেকে দেখতে শেখা। স্বীকার করতে দ্বিধা হওয়া উচিত নয়, যে, এই দুটি ব্যাপারেই শরৎ সিদ্ধিলাভ করতে পেরেছেন। শব্দকে শরৎ, যে কোনও উঁচু মানের কবির মতোই, বারবার নতুন উপলব্ধির আলোয় আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। এই গ্রন্থের একটি কবিতায় তিনি বলেছেন—'স্বাধীন ও অনুচ্ছিষ্ট শব্দের অভাবে কত ক্রিয়াকাণ্ড স্থগিত রয়েছে।' সত্যিই তাই। যুগ-যুগান্ত ধরে একইরকম ব্যঞ্জনায় ব্যবহৃত হতে হতে কিছু শব্দ তাদের ভাবমাহাত্ম্য, তাদের যথাযথ প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। শব্দকে পুনরায়, যুগোপযোগী প্রতীকে আবিষ্কার করাই কবির বড় কাজ। শরতের কবিতাতেও এই প্রবণতা আমরা লক্ষ করি। তিনি তাঁর স্বাভাবিক বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে বলেন—"'বিদ্রোহ' শব্দটি তুলে নেড়ে দেখি, / নেড়েচেড়ে দেখি: / সে-ও নয় তেমন ধারাল।/ ছোট-ছোট কাজে / মানুষ ঘষেছে তাকে দীর্ঘকাল, / এই চাকু দিয়ে কেউ পেনসিল বেড়েছে, কেউ ছাড়িয়েছে খোসা, / ওকে দিয়ে আর কোনো বড় কাজ হবে না এখন।" অন্য একটি কবিতায় শরৎ তাঁর কাব্য-দর্শনকেই যেন সংক্ষেপে বলতে চেয়েছেন—'যা কিছু সুন্দর আর অভিজাত, কাঁটাতারে ঘেরা / তাকে কবিতার মধ্যে আনো দৃশ্য-শব্দের মোচড়ে। অনুভবে / তাকে ভাঙো, নিংড়ে নাও, তবে ধর্ষকাম পূর্ণ হবে।' এই 'অনুভব' শব্দটিই এখানে প্রধান। কবির অনুভব আর বোধের অভিজ্ঞতা যদি শব্দের মধ্যে সঞ্চারিত না হয়, তাহলে তাঁর কবিতা শব্দমালা হয়, অনুভূতিমালা হয়ে ওঠে না। সূক্ষ্ম এবং উচ্চাঙ্গের অনুভব-ক্ষমতার অধিকারী বলেই শরৎ পরিচিত কোনও দৃশ্যকে এভাবে নতুন মাত্রায় ও প্রতীকের চমৎকারিত্বে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করতে পারেন —জিনস্ ও ফতুয়া পরা রোগা এক মেয়ে দুহাতে ধরে আছে একটি ডাব — এই সামান্য দৃশ্য শরতের মনে এরকম প্রতিক্রিয়া জাগায়—'মনে হয়, ডাব নয় / মেয়েটির হাতে ধরা ও-যেন পরাস্ত এক জন্তুর মুখোশ।' এবং-'একটু পরে ভুল বুঝি। / দেখি, সে পশুর মুণ্ড লম্ফ দিয়ে উঠে / মেয়েটিকে পরাস্ত করেছে / দুজনের / উদগ্রীব চুম্বন থেকে ঝরে পড়ছে জল ফোঁটা ফোঁটা।' কবির প্রকৃত কাজ তো এটাই। বাস্তবকে পুনরাবিষ্কার করা, পুনঃনির্মাণ করা, পুরনো, গতানুগতিক, ক্লিশে দৃশ্যগুলিকে আবার উজ্জীবিত করে তোলা কল্পনা এবং অনুভবের সালোক-সংশ্লেষে।

প্রথম দিকে মূলত আত্মমুখী কবিতা রচনায় ব্যস্ত থাকলেও, শরৎ ক্রমশ, নিজেকে আরও বিষয়-মগ্ন করে তুলেছেন। নিজের চারপাশের জীবনকে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ ও নিজের কবিতায় তার রসোত্তীর্ণ সমীক্ষণ—এই হল শরতের পরিণত কাব্যদর্শন। এই গ্রন্থের কিছু কবিতায় আমরা লক্ষ করি, শরৎ নিকৃষ্ট কিছু জীবের ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপের গূঢ় খেলায় মেতেছেন। যেমন কুকুর, টিকটিকি এবং বেরাল নিয়ে অসাধারণ তিনটি কবিতা আছে। এরা মানুষেরই মতো যেন, জীবনযাপনের তাগিদে, প্রবঞ্চক, চাটুকার, সুযোগসন্ধানী এবং কখনও কখনও নিঃসঙ্গ। যেমন বাড়ির পোষা কুকুর ভাবে—'আজকের অভিনয় বিশ্বাসযোগ্য হল তো? / রাত্তিরের খাওয়াটা পাওয়া যাবে, আশা করি।' টিকটিকিকে লক্ষ করে তিনি বলেন—'তুমি মানুষের মতো চাটুকার, তুমি ধর্মঘাতী / নিজের কদর্য মুখ লুকোতে কেবল / ছবির পিছন থেকে কাজ করো,'। আর সিঁড়ির নীচে একাকীত্ব লোভী বেরালকে নিয়ে শরৎ ভাবেন—'বেরালটার বাচ্চা হবে। মনে হয় / এই বাচ্চা ও চায়নি, / মনে হয়, আদর করতে গিয়ে কেউ ওকে ঠকিয়েছে।' অন্য একটি কবিতায় তাঁর অভিজ্ঞতা এরকম—'মানুষের চিত্ত বড়ো বিচিত্র জিনিস— / খুঁড়তে খুঁড়তে কেবল কষ্টের কাদা, হিংসে আর মনখারাপ,'—। উল্লিখিত তিনটি কবিতায় এই একই কথা যেন তিনি অন্য আঙ্গিকে, অন্য পরিপ্রেক্ষিতে বোঝাতে চাইলেন।

শরৎ বরাবরই নাগরিক জীবনের কবি। সাফল্যের জন্যে শহুরে মানুষের ইঁদুর-দৌড়, একাকীত্ব, বস্তুগত ধাতব জীবনযাত্রা তাঁর এই গ্রন্থের কিছু কবিতাতেও প্রতিফলিত হয়েছে। 'লেমিং', 'লণ্ঠন', 'তাৎক্ষণিক', ইত্যাদি কবিতাগুলি এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মানুষের জীবন এখন অবসরহীন, আলস্যহীন—'আমাদের তাড়া আছে, এই কথা মনে করিয়ে দিতে / সকালবেলায় বেজে ওঠে কুকার।' এবং শরতের আক্ষেপ—'এক জীবন ধরে ধিকিয়ে ধিকিয়ে জীবনযাপন — তার সময় কই।' আশেপাশে তাকিয়ে তিনি দ্যাখেন—'প্লাস্টিক নারীর বুকে রবারের স্তন / মুখে প্রদর্শপ্রতিভা, / কাচের ঠোঙায় ঠাণ্ডা দুধ হাতে পুরুষ চলেছে।' আর ইদানীং প্রবীণ শরতের আরও এক তিক্ত অভিজ্ঞতা হল এই যে, নাগরিক জীবনে যেমন ব্যস্ততা বেড়েছে তেমনই এই জীবনকে তুমুলভাবে আক্রমণ করেছে জটিলতা ও পেশাদারিত্ব —'হাবা চোখ মেলে দেখি, যা কিছু সরল—সবই কুঁকড়ে গেছে'; এবং—'আপাতত গুড় সত্য, গুড় ধর্ম, গুড়াকাঙ্ক্ষা খাঁটি,' এবং 'কোথা কে আঙুল চুষছে ভেবে কেন মন খারাপ করা!' আত্মিক উন্মীলন নয়, এখন যুবসমাজ কেবল, যে কোনও মূল্যে জাগতিক

সফলতার জন্যে, অন্ধের মতো ছুটছে। চতুর্দিকে শরৎ শুধু আজ দেখেন, অন্য সব সংবেদনশীল ব্যক্তির মতো দেখে কষ্ট পান, যে, মানবিক সম্পর্কগুলির আর তেমন কোনও কিছুই অবশিষ্ট নেই। যেদিকে তাকানো যায় শুধু নৈতিক অধঃপতন, মূল্যবোধগুলির বর্জন ও স্খলন; আর তাই শরৎ উত্তর প্রজন্মের জন্যে 'শুধু ছাপার অক্ষরে / কয়েকটি কবিতা' রেখে যেতে চান। এবং পরামর্শও দিতে চান এইভাবে—"বলে যাচ্ছি, 'বিংশ শতকের / অনেকটা সময় ছিল দীর্ঘ মলমাস। হিজিবিজি / ফেনা সবই মুছে দেবে কাল। কিন্তু পারো / উত্তর প্রজন্ম, তোমরা এখনো তো দৃঢ় ও নির্মম হতে পারো / যদি থাকে প্রেম, মনে অভিক্রম থাকে।'"

কবিতাকে যাঁরা জীবনের সঙ্গে একীভূত করে নিতে পেরেছেন, নিঃসন্দেহে রবীন সুর ছিলেন তাঁদের অন্যতম। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে কবির মতো বেঁচে থাকতে চাইতেন তিনি। সৃষ্টির উন্মাদনাই ছিল তাঁর একমাত্র অনুপ্রেরণা। এবং সর্বদাই তাঁর লক্ষ্য ছিল কবিতাকে বাণিজ্য থেকে, খ্যাতির অনুমোহ থেকে, যাবতীয় অ-কবিতার জঞ্জাল থেকে মুক্ত রাখা। কবিতা লিখতে এসে রবীন প্রথম থেকেই তাঁর গন্তব্য স্থির করে নিয়েছিলেন। তিনি জানতেন, তিনি কী করতে চান। 'খ্যাতি' নামের এক ছোট্ট কবিতায় রবীন লিখেছিলেন—'সেই খ্যাতি চাই / যা জলের মত সমোচ্চশীল সর্বত্রগামী।' এবং আরও পরে অন্য একটি কবিতায় তাঁর সফলতা-বিষয়ক চিন্তা-ভাবনা এরকম—'প্রতিদিন বাবুই শ্রমের / শিল্পিত কুটির চাই—কাঁচা হোক নিজ হাতে গড়া! / যে খ্যাতি অর্জিত নয়, শ্রম-পেষা ঘামের আতর / যেখানে মেলে না, তার স্বর্গ-সুখ ফ্যালো আঁস্তাকুড়ে।' নিজের শিল্প সম্বন্ধে এই উচ্চাশা, এই সুচেতনাই রবীনকে স্থির থাকতে দেয়নি কখনও। কবিতায় তিনি হতে চেয়েছিলেন পারফেকশনিস্ট। যদিও ব্যর্থতার অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল। তিনি জানতেন, সব রচনাই সাফল্য পায় না, শিল্পের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না; এবং এই ব্যর্থতা বোধই শিল্পীকে সচল, ক্রিয়াশীল রাখে। শিল্পীর বা কবির নিঃসঙ্গ যন্ত্রণা রবীন ফুটিয়ে তুলেছেন অনেক কবিতাতেই। তাদের মধ্যে একটি থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করছি—'কাঁটায় রক্তাক্ত হতে হতে কখনও ফুল ফোটাই, / সব ফুল বাঁচে না। / বেঁচে থাকা দু' একটা ফুল থেকে ফল হয়, / সব ফল পাকে না। / দু' একটা পাকা ফলের মধ্যে বীজ দানা বাঁধে।'

১৯৩৪-এ যে-জীবনের শুরু, ১৯৮৮-তেই তা শেষ হয়ে যায়। ষাটের দশক থেকেই কবিতা রচনা শুরু করেন রবীন সুর। যদিও তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ হয় একটু বিলম্বেই—১৯৭০-এ। ১৯৬০ থেকে ১৯৮৮ —এই ২৮ বছরে রবীন যা কবিতা রচনা করেছিলেন, তা মোট ১৭টি কাব্যগ্রন্থে ধরা আছে। গাণিতিক হিসেবে তা খুব একটা কম নয়। বোঝাই যায়, বাবুই-পাখির মতো যে শিল্পী-শ্রমিক হবার কথা ভেবেছিলেন রবীন, তা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন নিজের জীবনে। তাঁর মৃত্যুর পর এই ১৭টি কাব্যগ্রন্থ থেকে বেশ কিছু কবিতা নির্বাচন করে আলোচনা 'নির্বাচিত কবিতা' প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশকের নিবেদন থেকে জানা যায় যে, কবিতাগুলি নির্বাচনের দায়িত্বে ছিলেন কবি অরুণ মিত্র, অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কবি রাম বসু। সঠিকভাবে বলতে গেলে, এই গ্রন্থের তিনটি সুস্পষ্ট পর্ব আছে। দুটি পর্বের ভূমিকাস্বরূপ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাম বসু এই কবি সম্বন্ধে তাঁদের পর্যবেক্ষণ ও অনুভব সংক্ষিপ্তভাবে জানিয়েছেন। অরুণ মিত্র কবিতা নির্বাচনের ব্যাপারে অবশ্য কোনও মতামত রাখেননি। সরোজ লিখেছেন—'রবীন মানুষটি যেমন তার কবিতাও তেমন। দরাজ এবং দিলখোলা—তাকে দেখলে কোনো জট পাকানো গোলকধাঁধার কথা মনে আসবে না।' এরকম পর্যবেক্ষণ রাম বসুরও এবং তিনি যেহেতু নিজেও একজন কবি, তাই কবিতার মতো প্রতীকে রবীনকে বর্ণনা করেছেন এইভাবে—'রবীনকে যখন ভাবি তখন একটা ছবিই আমার চোখে ভাসে। নির্জন সমুদ্রের দীর্ঘ ও শূন্য বেলাভূমিতে ঘোর আঁধির মধ্যে পৌরুষদীপ্ত বুনো ঘোড়া দিগ্‌বিদিকে ছুটে চলেছে।' রবীনের কবিতায় রোমান্টিক 'ভায়োলেন্সের' ইঙ্গিত দিয়েছেন রাম বসু। সেই ভায়োলেন্স কি এরকম?—'আমরা সংঘর্ষ, প্রেম, উত্তেজনা চাই/ চাই যোগ্যতার উদ্বর্তনে সুর্শকাতর শাখাপ্রশাখার/ দিগ্বিদিকে বিস্তারিত মানবিক গান।' অথবা, — 'যখন যেভাবে থাকি ধ্বনি-প্রতিধ্বনি/ শ্রুতির আড়ালে বাজে মূর্ত অবয়বে/ চোখের আয়ত দৃশ্যে দেওয়ালে দেওয়ালে/ রক্তবর্ণ ইস্তেহার — সার্থক বাঁচার আমন্ত্রণ'।

সার্থক বাঁচার জন্যে এই তীব্র আর্তি রবীনের অনেক ভাল কবিতার বিষয়। মর্তলোকের এই জীবন, তা যতই 'অপরের ম্লানমুখের রক্তহীনতার ছায়াপ্রধান পিলসুজের / অন্ধকার বৃত্তের স্বর্ণশীর্ষ অর্জিত প্রতিভায়' অস্পষ্ট এবং অসহ্য হয়ে উঠুক না কেন, রবীন সেই জীবনকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন প্রবলভাবে, শব্দে-ছন্দে-ছবিতে-চিত্রকল্পে সেই জীবনেরই একটা নিজস্ব অবয়ব নির্মাণ করে নিতে চেয়েছিলেন। একটি কবিতায় তিনি যেন মৃত্যুর মুখের ওপরই দরজা বন্ধ করে দিচ্ছেন এইভাবে—'তুমি যাও এই মাটি ছেড়ে আমি কোনদিন কোথাও যাবো না / কারণ এই মাটি থেকেই / আমার হাড় মাংস নিঃশ্বাসের স্পন্দনগুলি জন্মেছে'।

কিন্তু জীবনকে এত গাঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা সত্ত্বেও, মৃত্যুচিন্তা রবীনকে বারবার আক্রমণ করেছে। এই গ্রন্থের তৃতীয় পর্বের কিছু কিছু কবিতায় (যা প্রকাশকের উল্লেখ অনুযায়ী অরুণ

মিত্রের নির্বাচিত) রবীনের চেতনায় উদ্‌ভাসিত মৃত্যুবোধের কথা ভেবে শিহরিত হয়ে উঠতে হয়! কবিরা আপাতদৃষ্ট পর্দার নীচে অনেক গভীরে দেখতে পান; র‍্যাঁবো এ-জন্যেই কবিকে বলেছিলেন 'seer'। রবীনের কিছু কবিতা পড়লে মনে হতে পারে যে, তিনিও নিষিদ্ধ অনেক কিছু জেনেছিলেন, যা একমাত্র প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি থাকলেই দেখা যায়। নাহলে—কেনই বা তিনি লিখবেন এরকম সব লাইন?...

(ক) 'বারংবার মৃত্যু এসে দরজায় কড়া নেড়ে যায়। / গোধূলি বারান্দালগ্ন ফুটফুটে টগরে শুভ্রশ্বেত শব্দের কিশোরী / বারংবার বলে যাচ্ছে, বাড়ি নেই, বয়স্ক রবীন।'

(খ) 'চুলে এসে লেগে গেল বিকেলের রোদ— / অনন্তের কাছে থেকে চলে যাচ্ছি অনন্তের স্বাদ ব্যতিরেকে'।

(গ) 'অপরিমেয় দূরত্বের কোথায় সমাপ্তি জানা নেই / তবু যেতে হবে। / অজানা নক্ষত্রের টেলিগ্রাম / দিয়ে গেছে বিকেলের নিষ্ঠুর পিওন।'

এবং যেহেতু এই কবি ছিলেন প্রকৃত প্রস্তাবে একজন জীবন-প্রেমিক, তাই তিনি লিখতে পেরেছেন, হয়ত বা মৃত্যুর পদধ্বনি জান্‌লার ওপারে শুনেও,—'মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে কথাটা বারংবার মনে হয় / তার নাম জীবন, সলতে পোড়া গন্ধ, অরুন্ধতী আলো— / অথচ তার জন্য কতটুকু জল হাওয়া রোদ বরাদ্দ ছিল?' যেহেতু রবীন শিল্পী হিসাবে নিজের কাছে আপাদমস্তক সৎ ছিলেন, যেহেতু সিদ্ধি অর্জনের ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টায় কোনও খাদ বা আত্ম-প্রতারণা ছিল না, তাই তিনি দুর্দম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে লিখতে পেরেছিলেন—'একা এসেছি, একাই যাবো। অনেক তিরস্কার / এপার নয় ওপার নয় মধ্যে খরস্রোতে / যেটুকু সুখ দুঃখ পাই সেটাই পুরস্কার / মন্ত্রে কোনো ভুল রাখিনি, ভালবাসার ব্রতে।'

প্রবল জীবনীশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে এই কবি অসময়ের মৃত্যুকে রোধ করতে পারেননি। কিন্তু এ তো শুধুই শারীরিক মৃত্যু। তাঁর সচেতন শিল্প-চর্চায়, কবিতা-রচনায় তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন। হয়ত পেরেওছিলেন। কেননা, আমাদের বিশ্বাস, তাঁর অজস্র সৃষ্টিসম্ভারের মধ্যে কিছু অন্তত থেকে যাবে আগ্রহী পাঠকের স্মৃতিতে, মেধায়, স্বগত উচ্চারণে।

'প্রাণ' সৈয়দ সমিদুল আলমের চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ। এই কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৯০-এ। তারপর ৯১ ও ৯২-এ তাঁর পরপর আরও দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ কাব্যচর্চা ও কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে আলম এক সচেতন ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছেন বোঝা যায়। মনে পড়ছে, এই পত্রিকার পাতাতেই আলমের ২য় গ্রন্থ—'নিরুক্ত বর্ণ' সমালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলাম যে, এই কবি মেটাফিজিক্যাল কবিদের মতো যুক্তি ও আবেগের সংহত মেলবন্ধন ঘটাতে চান তাঁর রচনায়। আলোচ্য গ্রন্থটি পড়ে মনে হচ্ছে ঠিকই বলেছিলাম। কেননা এখানেও তিনি তাঁর শিল্প-লক্ষ্যে অবিচল আছেন। আশির দশকের শেষ পর্ব থেকেই হয়ত কবিতা রচনায় নিমগ্ন আছেন এই কবি। অর্থাৎ বয়সে তিনি খুবই তরুণ এবং মননগত দিক থেকে অবশ্যই আধুনিক প্রজন্মের প্রতিনিধি। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে সাম্প্রতিক আধুনিক বাংলা কবিতা বলতে, আমাদের চোখের সামনে যে চেহারাটা ফুটে ওঠে, আলমের কবিতা, নিঃসন্দেহে তার অনন্য ব্যতিক্রম। এমনিতেই সব বাঙালিই যৌবনে আর কিছু না করুক, কবিতাই অন্তত লেখে —এরকম এক দুর্নাম আমাদের আছেই। তার ওপর মুদ্রণ-ব্যবসার অবাধ প্রগতিতে 'কবিতা' নামে যে কোনও কিছু রচনা করা ও তা অবিলম্বে ছাপিয়ে ফেলা খুবই সহজ কাজ এখন। পত্রিকার সম্পাদকদের যদি সে রচনা পছন্দ নাও হয়, তাহলেও কুছ পরোয়া নেহি। নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে কবিতার বই প্রকাশ করে ফেলা যায় এবং পাড়া-প্রতিবেশী-প্রেমিকার কাছে সহজেই নিজেকে কবি প্রতিপন্ন করা যায়। বাংলা ভাষায় এই সর্বজনীন কাব্যচর্চার ফলে যা ঘটছে তা হল, অসংখ্য অ-কবিতা রচিত হচ্ছে প্রতিদিন, যার ভিড়ে প্রকৃত ক্ষমতাসম্পন্ন কবিরাও অনেক সময় আড়ালে থেকে যাচ্ছেন। যদিও আমরা জানি, প্রতিভা ছাই-চাপা আগুন; তাকে দমিয়ে রাখা যায় না। তবুও মনে রাখতে হবে যে, এটা প্রচারের এবং বিজ্ঞাপনের যুগ। এই দুই ঢক্কানিনাদের ফলে আজকাল অ-কবিকেও কবি বানিয়ে তোলা যায় খুব সহজেই।

এ-ধরনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হল এই কারণেই যে, সৈয়দ সমিদুল আলম খুবই নবীন কবি হলেও, তাঁর কবিতা-চর্চার মধ্যে প্রগাঢ় আন্তরিকতা আছে। বৈদগ্ধ্য এবং জীবনবিষয়ক এক ধরনের প্রজ্ঞা-শাসিত দর্শনও তাঁর কবিতার বিশেষ উপাদান। আলোচ্য গ্রন্থে আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষাও করতে চেয়েছেন তিনি। গ্রন্থের সব কবিতাগুলিই গদ্য-ফর্মে এবং সাধুভাষায় রচিত। হঠাৎ সাধুভাষাকে গ্রহণ করবার কারণ কী? —এরকম প্রশ্ন পাঠকের মনে জাগতেই পারে। সেক্ষেত্রে স্মরণে রাখতে হবে যে, কাব্যগ্রন্থটির নাম—'প্রাণ'—। '...যে প্রাণের নির্বাণ তার স্বাদ অমৃতে-লবণে এসে মিশে যায় দিগন্তরেখায়'—সেই প্রাণ-এরই নানা রূপ উদ্ভাসিত হয়েছে কবিতাগুলিতে। নিঃসন্দেহে খুবই দুরূহ বিষয়কেই স্পর্শ করতে চেয়েছেন আলম। এবং শুধু তাই নয়। 'অন্ধকার', 'আলো', 'মোক্ষ', 'মুক্তি', 'মৃত্যু', 'আত্মা'—এসবের বিষয়ে আলম তাঁর নিজের বিশ্লেষণাত্মক ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন কবিতায়। বিষয়ের উপস্থাপন করার ব্যাপারেও তাঁর একটা নিজস্ব স্টাইল আছে। প্রথমে তিনি কিছু প্রশ্নের সমাহার ঘটান। তারপর সেই প্রশ্নের

নিজ-আবিষ্কৃত উত্তরগুলিকে যুক্তির শক্ত জমিতে দাঁড় করাতে চান। জন ডান্‌ বা কহলিল জিব্রানের কবিতার কথা মনে পড়ে যায়।

যেমন আলম লিখেছেন—

(ক) 'জানিও, অন্ধকার বলিয়া কিছু নাই। সমস্তই আলো। বস্তুতঃ এই আলোই তাহার অস্তিত্ব প্রকাশকল্পে অনুভব করিয়াছে অন্ধকার এর উপস্থিতি।'

(খ) 'নিষ্প্রাণ কাহাকে বলো? বস্তুতঃ নিষ্প্রাণ কিছুই নাই। যে মৃতের প্রতি তুমি উদাসীন, সমস্ত মায়া ছিন্ন করিয়া চিতায় তোলো অথবা গভীর খননবাহে অবজ্ঞায় অবজ্ঞায় মৃতটিরে ভাসাইয়া দাও, জানিও তাহার-ও প্রাণ আছে।'

এই সিদ্ধান্তকে যুক্তির মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্য করেন আলম এভাবে—'চিতায় উঠিয়া যাহা আগুনেরেই তীব্র করে, গোরের ভিতরে যাহা ভূমির প্রাণের প্রাবল্যে ডুবিয়া যায়, নিষ্প্রাণ তাহাকে বলিবে?'

একটি কবিতা-কণিকায় আলম মৃত্যু সম্বন্ধে এক নতুন ভাবনা প্রকাশ করেছেন—"'শ্বেত'—শবের বর্ণ। শব, মৃতের প্রতীক নহে। নূতন চেতনার উন্মেষ। 'শব' সকল বর্ণের সমাহার।" আমরা চমকিত হই। বুঝতে পারি এক গভীর উপলব্ধি থেকে কবি এই নতুন সত্য আবিষ্কার করেছেন।

তবুও আমরা এই কবিকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, কবিতা শুধুমাত্র প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের প্রকাশ নয়; কবিতা আরও অন্যকিছু, এক ভিন্ন 'রস';—তা একমাত্র যিনি কবিতা রচনা করেন তিনিই বোঝেন। কবিতার শরীর ও আত্মা খুব পেলব, সূক্ষ্ম, স্পর্শকাতর। কবিকে মনে রাখতে হবে, জ্ঞানের গাম্ভীর্য এবং অতিরিক্ত ভার যেন তাঁর রচনার কবিত্বকে গ্রাস না করে।

অনুবাদে মালয়েশীয় উপন্যাস

'হাসান বয়াতির সুখদুঃখ' একটি মালয়েশীয় উপন্যাস। লেখকের নাম আনওয়ার রিদওয়ান। আলোচ্য গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থেকে জানা যায়, এই লেখকের জন্ম ১৯৪৯ সালে। নিজের দেশে তিনি একজন পরিচিত লেখক ও সম্পাদক। এই উপন্যাসটির জন্যে রিদওয়ান পুরস্কারও পেয়েছেন। এ ছাড়াও উপন্যাসটি ইংরেজীতে 'The last days of an Artist' নামে অনূদিত হয়েছে।

গ্রন্থটির বাংলা ভাষায় অনুবাদক মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ, মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রকাশকও বাংলা একাডেমী, ঢাকা। অনুবাদকের 'প্রসঙ্গ-কথা' থেকে আমরা জানতে পারি যে মালয়েশিয়া ও বাংলদেশের মধ্যে সাহিত্যকর্মের অনুবাদের ব্যাপারে এক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার সম্ভাবনা আছে। এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে দুই দেশের মধ্যে কথাসাহিত্যের অনুবাদের কাজকর্ম নিয়মিতভাবে চলছে। এই তথ্য উভয় দেশের লেখকবর্গ ও পাঠকদের কাছে যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক।

অনুবাদক দাবী করেছেন যে, এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত প্রথম বাংলা উপন্যাস। যতদূর জানা গেছে, এরকম দাবীতে কোন ভুল নেই। সেক্ষেত্রেও, এই গ্রন্থটির ঐতিহাসিক উল্লেখযোগ্যতা আছে এবং থাকবে।

একজন বয়াতি বা গল্প-কথকের জীবনের আখ্যান—এই উপন্যাস। এই বয়াতি মনে-প্রাণে একজন শিল্পী। পেশাদারী মনোবৃত্তির অভাবে তাকে জীবনে অনেক আঘাত পেতে হয়। তার স্ত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু দিয়ে এই আখ্যানের সূচনা। তারপর উপন্যাসটি যত এগিয়ে যায়, হাসান বয়াতিও একের পর এক নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।তার একমাত্র মেয়ে দুর্বৃত্তের দ্বারা ধর্ষিতা, এবং সেই দুঃখে গ্রাম থেকে নিরুদ্দেশ। তার ছেলেটির মধ্যেও কোনও সম্ভাবনা নেই; সে প্রতিবন্ধী এবং বেশ কিছুটা অসামাজিক। উপন্যাসের শেষদিকে বয়াতির এই ছেলেটিও অজ্ঞাত কারণে নিরুদ্দেশ। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে বারবার আঘাত এলেও বয়াতি কোনও সময়েই ভেঙে পড়ে না। গান বেঁধে এবং সেই গান গ্রামের মানুষদের শুনিয়েই তার আনন্দ। গান বিক্রি করে তার ভাত ঠিকমতো জোটে না। কিন্তু ভাতই তার জীবনের একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নয়। জীবনের কোন প্রাত্যহিক চাহিদাকেই সে বড় করে দেখে না। গভীর দুঃখের মধ্যেও সে গলা ছেড়ে গান গেয়ে সুখ পায়। তার চিন্তাভাবনায় ফুটে ওঠে একজন প্রকৃত শিল্পীর জীবনদর্শন। পাঠককে তা বোঝাবার জন্যে উপন্যাসের এক সুন্দর অংশ এখানে উদ্ধার করছি। নির্জনে বসে বয়াতি ভাবে—'জীবনে আনন্দ আর আত্মতৃপ্তিই যার একমাত্র চাওয়া তার জীবনের পথ দীর্ঘ হবে, আঁকাবাঁকা হবে সেই তো স্বাভাবিক।...জীবনের এমন কিছু সমস্যা আছে যার কোন সত্যিকার সমাধান নেই। শেষমেষ মানুষকে তাই বেছে নিতে হয় যা তার কাছে সবচেয়ে ভালো মনে হয়। আমি তাই করলাম। যে পথ আমার চিরচেনা, যে পথ আমার বন্ধু, আমি সে পথকেই বেছে নিলাম।' —এ পথই হল শিল্প-সাধনার পথ। সন্দেহ নেই লেখক এক বড় এবং মহান ভাবনাকে ধরতে চেয়েছেন এই উপন্যাসে। বয়াতির মৃত্যু দিয়ে উপন্যাসটির সমাপ্তি হলেও, তার এই গূঢ় জীবনচেতনাই যেন পাঠকের মনে শেষ অবধি অনুরণিত হয়। গ্রীক ট্র্যাজেডির মতো রিদওয়ানের এই উপন্যাসটিতেও যেন মানুষের ভাগ্য মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে। বয়াতির বহু চেষ্টা সত্ত্বেও জাগতিক জীবনে তার দুর্দশার অন্ত নেই। সংগ্রামী মনোভাব থাকলেও বয়াতির নিজেরও ধারণা তাই—'মানুষের তকদীর আল্লাহ, রাব্বুল আলামীনের হাতে। আল্লাহ মহান। তিনি সবকিছু চালান। গ্রামীণ পটভূমিতে উপন্যাসটি রচিত। দৈনন্দিন জীবনে প্রকৃতির

খামখেয়ালিপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে কীভাবে গ্রামের মানুষেরা বেঁচে থাকে তারও টুকরো টুকরো ছবি আমরা পাই এই উপন্যাসে। মালয়েশীয় গ্রামবাসীর অন্যতম প্রধান বৃত্তি হল মাছ ধরা। ঝড় এবং বৃষ্টি তাদের নিত্যসঙ্গী। একাধিকবার ঝড়-বৃষ্টির সুন্দর বর্ণনা লেখক করেছেন। মাছ-ধরার বর্ণনাটি পাঠক ভুলতে পারবেন না। সাবপ্লট হিসেবে জাপানীদের হামলার উল্লেখ সমান্তরালভাবে জায়গা পেয়েছে উপন্যাসে। কাহিনীতে সময়ের কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। কিন্তু মালয়েশীয় এই গ্রামটি যে ব্রিটিশ অধ্যুষিত এবং জাপানী সৈন্যরা এই গ্রামে সে কারণেই অনুপ্রবেশ করছে তার উল্লেখ আছে। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালই এই উপন্যাসের সময়কাল।

এবার অনুবাদ সম্বন্ধে কিছু কথা বলা যাক। স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও বোঝা যায়, উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ থেকেই বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে। সুতরাং মূল উপন্যাসটির প্রতি অনুবাদক কতটা দায়বদ্ধ থাকতে পেরেছেন, তা বোঝার উপায় নেই। তবে স্বীকার করতেই হবে, বাংলা এই অনুবাদের ভাষা খুবই স্বচ্ছ এবং সাবলীল। পাঠককে হোঁচট খেতে হয় না। অনুবাদক এজন্য পাঠকের ধন্যবাদ পাবেন। দু-একটি মুদ্রণ-প্রমাদ ছাড়া গ্রন্থের ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদি খুবই উঁচু মানের। সর্বত্রই বেশ পরিকল্পনার চিহ্ন আছে। মালয়েশীয় গল্প-উপন্যাসের আরও অনুবাদের জন্যে আমরা ঢাকার বাংলা একাডেমীর দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে থাকব। ভেবে দুঃখ হয়, কলকাতা বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্য, এরকম অনুবাদের মাধ্যমে, বাংলা ভাষা ও বাঙালি পাঠককে ঋদ্ধ করার ধারাবাহিক প্রয়াস চোখে পড়ে না।

সোনার পিত্তলমূর্তি ওই — শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়/আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯/১৫ টাকা

রবীন সুরের নির্বাচিত কবিতা/অরণি প্রকাশন, ১২ মুখার্জী পাড়া লেন, ভাটপাড়া, উঃ ২৪ পরগণা/৩৫ টাকা

প্রাণ— সৈয়দ সমিদুল আলম/ছাতিমতলা, এন সি সিনহা রোড, পুরুলিয়া-৭২৩১০১/১৫ টাকা

হাসান বয়াতির সুখদুঃখ — আনওয়ার রিদওয়ান/মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ অনূদিত/বাংলা একাডেমী, ঢাকা/১০০ টাকা

ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার

আবদুর রউফ

শিক্ষিত জনসাধারণের একটা বড় অংশের মধ্যেই যে বিজ্ঞান-মনস্কতার অভাব ঘটছে একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। অথচ বিজ্ঞানের জয়যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ কোন না কোন ভাবে এই জয়যাত্রার প্রভাব অনুভব করতে বাধ্য হচ্ছে। স্কুল শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকেও প্রাথমিকভাবে বিজ্ঞানের মূল কথাগুলি পড়ানো হচ্ছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শাখাতেই বুদ্ধিসুদ্ধির দিক থেকে সবচেয়ে উজ্জ্বল ছেলেমেয়েদের ভিড়। যে প্রযুক্তিবিদ্যা বা টেকনোলজির পাঠ নিয়ে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা জীবনে সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে অগ্রণী হয় তাও বিজ্ঞানেরই অবদান। তথাপি বিজ্ঞানমনস্কতার এত অভাব কেন?

এবার স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে বিজ্ঞানমনস্কতা বলতে আসলে কী বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে? এই প্রশ্ন নিয়ে কোনরকম তাত্ত্বিক আলোচনার এখানে অবকাশ নেই। সোজা কথায় মানুষের এই জীবনযাপন, এর চারপাশের প্রকৃতি এবং বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে শিক্ষিত মানুষ যেসব ধারণা পোষণ করে সেগুলি বিজ্ঞানের শৃঙ্খলাবদ্ধ পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিংবা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা সমর্থিত কিনা, কোন অজানা বিষয় সম্পর্কে কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য অন্ধবিশ্বাসের চেয়ে সে যুক্তিবিচার এবং বিজ্ঞানের সম্ভাব্যতার নিয়মের উপর নির্ভরশীল হওয়াটা বেশি পছন্দ করে কিনা, বিজ্ঞানমনস্কতার এগুলিই প্রাথমিক শর্ত।

বাস্তবে দেখা যায়, বিশেষ করে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা, জাত-পাত, পরম্পরাগত কোন বদ্ধমূল কুসংস্কার ইত্যাদি বিচারের সময় তথাকথিত মানুষেরাও উল্লেখিত বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দিচ্ছে না। কতকগুলো দৃঢ়মূল ভ্রান্ত সংস্কারকে তারা যাচাই করার তাগিদই বোধ করে না। মনের এই যে বদ্ধ জলাশয় অবস্থা, এখান থেকেই জন্ম নিচ্ছে নানারকম অবৈজ্ঞানিক জীবন-দর্শন, বিশেষ করে ধর্মীয় মৌলবাদ।

শিক্ষিত মানুষদেরও মনের এই বদ্ধজলাশয় দশা ঘোচাবার উপায় কী? আমার বিবেচনায় মানব-সন্তানের জ্ঞান উন্মেষের সময়কালেই এমন সব বই-পত্র তার হাতের কাছে থাকা উচিত সেগুলির সাহায্যে জীবন জগৎ এবং বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে তার কৌতূহল নিবৃত্ত হতে পারে বিজ্ঞানের দ্বারা নির্ধারিত পন্থায়। সত্যি কথা বলতে কি, সেই ধরনের বই আমাদের এই মাতৃভাষায় লেখা হয়েছে খুবই কম সংখ্যায়। বিশেষ করে বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তোলার মতো পূর্ণাঙ্গ বই বাংলাভাষায় তেমন চোখেই পড়ে না।

এইরকম পরিস্থিতিতে 'আরজ আলী মাতুব্বর রচনাসমগ্র' পড়তে পড়তে এইরকম মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক যে এটাই হল বাংলাভাষায় রচিত সেই কাঙ্ক্ষিত পূর্ণাঙ্গ বই যা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান-মনস্কতা গড়ে তোলার কাজে মোক্ষম হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু লক্ষ করার বিষয়

হল এটাই যে এমন একটা বই যিনি লিখতে পেরেছেন সেই আরজ আলী মাতুব্বর আদৌ কোন উচ্চশিক্ষিত এলিট কিংবা অ্যাকাডেমিশিয়ন নন। তিনি একেবারেই চাষাভুষো মানুষ।

বরিশাল জেলার লামচরি গ্রামে এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে আরজ আলীর জন্ম হয় ১৩০৭ বঙ্গাব্দে। তিনি আজীবন এই গ্রামেই থেকেছেন। কৃষিকাজ এবং আমিনগিরি ছিল তাঁর পেশা। লেখাপড়া শিখেছেন সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়। মাতুব্বর বেঁচেছিলেন ছিয়াশি বছর। এর মধ্যে সত্তর বছরই কাটিয়েছেন জ্ঞানের সীমাহীন রাজ্যে বিরামহীন অন্বেষায়। তাঁর জীবদ্দশায় বাংলাভাষায় রচিত ধর্ম, দর্শন এবং বিজ্ঞানের অধিকাংশ বই-ই তিনি পড়ে ফেলেছিলেন। তিনি পড়াশোনা যত করতেন, তার থেকে ভাবনা-চিন্তা করতেন বেশি। বলতেন খুবই কম, লিখতেন আরও কম। তথাপি তাঁর দীর্ঘ কর্মময় জীবনে তিনি দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, গণিত, কবিতা ও আত্মজীবনী মিলিয়ে মোট আঠারটি পাণ্ডুলিপি রচনা করেছেন। ধর্মীয় কুসংস্কারবিরোধী লেখালিখির কারণে পাকিস্তানি শাসন-আমলে তাঁর উপর আনা হয়েছিল গ্রেপ্তারি মামলা এবং তাঁর মতপ্রকাশে আরোপিত হয়েছিল নিষেধাজ্ঞা। স্বাধীন বাংলাদেশেও ধর্মীয় মৌলবাদীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর দ্বারা তাঁকে কম নিগৃহীত হতে হয়নি। কিন্তু কোন কিছুতেই দমিত না হয়ে তিনি লেখনী চালিয়েছেন। কুসংস্কারবিরোধী মুক্তবুদ্ধিচর্চার কেন্দ্র হিসাবে স্বগ্রামে পাঠাগার স্থাপন করেছেন। মানব কল্যাণে নিজের চোখ এবং শরীর দান করেছেন।

আরজ আলী মাতুব্বরের মৃত্যু হয় ১৩৯২ বঙ্গাব্দে। ইতিমধ্যে ঢাকার বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর জীবনী গ্রন্থ। আর সম্প্রতি আমরা হাতে পেলাম ঢাকার পাঠক সমাবেশ প্রকাশিত 'আরজ আলী মাতুব্বর রচনাসমগ্র ১'। বইটি পড়তে পড়তে বার বার মনে হয়েছে মাতুব্বর হলেন সেই ধরনের চিন্তাবিদ, যাঁর ভাবনা অতি সহজেই বাংলাভাষী সাধারণ মানুষের বোধগম্য হয়ে উঠতে পারে। মানুষমাত্রেরই মনে জ্ঞান হওয়া অবধি এই জীবন, জগৎ-সংসার, চারপাশের প্রকৃতি, মহাকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ইত্যাদি নিয়ে হাজার রকম কৌতূহল জেগে ওঠাই স্বাভাবিক। এইসব কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য রয়েছে দুরকম পন্থা। যেটা সবচেয়ে চালু পন্থা তা হল প্রচলিত কুসংস্কার-মূলক ধ্যান-ধারণাগুলোকে কোনরকম সংশয় প্রকাশ না করেই মেনে নেওয়া। এই পন্থাটাই ব্যাপক ভাবে চালু থাকায় বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়ার অভ্যাস গড়ে ওঠে এবং এর ফলে এমনকি উচ্চশিক্ষিত লোকদের মধ্যেও বিভিন্ন বিষয়ে কুসংস্কারের প্রাবল্য দেখে বিস্মিত হয়ে যেতে হয়। স্বাভাবিক কৌতূহল নিবৃত্তির দ্বিতীয় পন্থা হল, বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা লব্ধ জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক সম্ভাব্যতার নিয়ম এবং যুক্তিবিচারের উপর নির্ভর করা। বলাই বাহুল্য যে, এই ধরনের মানসিকতা অর্জনের সুযোগ বাংলাভাষী সাধারণ মানুষ খুব কমই পেয়ে থাকে। কারণ কৌতূহল নিবৃত্তিকে এই পন্থায় পরিচালনার জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরে তেমন শিক্ষক এবং বিশেষ করে বই-পত্রের অত্যন্ত অভাব। আরজ আলী মাতুব্বরের রচনাসমগ্রকে এই অভাব মোচনের রাস্তায় এক সুদৃঢ় পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

বয়স্ক নবসাক্ষরদের সাক্ষরতা উত্তর পর্যায়ে কী কী বই পড়ালে তারা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে এই নিয়ে বর্তমানে অনেকেই ভাবনা-চিন্তা করেন। আমার মনে হয় সাক্ষরতা আন্দোলনে যতটুকু সাফল্য পাওয়া গেছে সেটাকে কুসংস্কার বিরোধী ধর্মীয় মৌলবাদের খপ্পরমুক্ত প্রগতিশীল সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে হলে আরজ আলী মাতুব্বরের রচনাসমগ্রকে নিয়ে যাওয়া উচিত অবশ্য পাঠ্যের পর্যায়ে। কিন্তু কেবলমাত্র নবসাক্ষরদের জন্যই এই বইয়ের উপযোগিতা, উচ্চশিক্ষিত লোকদের তেমন কোন কাজে আসবে না, এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ ঘটবে। কারণ বেশির ভাগ উচ্চশিক্ষিত লোকের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা করলেই বোঝা যায় তাঁদের বিশ্বদৃষ্টি বড্ড বেশি ঘোলাটে। এই ঘোলাটে দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করে তোলার প্রয়োজনেও আরজ আলী মাতুব্বরের রচনাসমগ্র অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত।

শুধু মনে রাখতে হবে মাতুব্বর যেহেতু মুসলিম ধর্মীয় সমাজ-সম্ভূত ছিলেন তাই ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁর কুসংস্কারবিরোধী সংগ্রাম মূলত ইসলামের ঐতিহ্যকেন্দ্রিক। অমুসলমান পাঠকগণকে সেই কারণে মুসলমান সমাজের ধর্মীয় কুসংস্কার কিংবা বিজ্ঞানবিরোধী ধারণাগুলির সঙ্গে আপন আপন ধর্মীয় ঐতিহ্যের অনুরূপ ব্যাপারগুলি মিলিয়ে নিয়ে মাতুব্বরের বইটি পড়তে হবে। তবেই তাঁদের কাছে এই রচনাসমগ্র তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে। তাঁরাও তখন এই বই থেকে ধর্মীয় কুসংস্কার এবং ভ্রান্ত ধারণাগুলির মোহাচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত হয়ে বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে ওঠার প্রেরণা খুঁজে পাবেন।

পরিশেষে আমি তাই আবার উচ্চারণ করতে চাই, 'আরজ আলী মাতুব্বর রচনাসমগ্র' নিঃসন্দেহে ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের একখানি অন্যতম মোক্ষম হাতিয়ার। আইয়ুব হোসেন সম্পাদিত বইটির সম্পাদনা, প্রচ্ছদ, ছাপা, কাগজ ইত্যাদি সবই বেশ ভাল। কেবল দামটাই অনেককে হতাশ করবে। ছাপার খরচ এবং কাগজের মূল্য যে হারে বাড়ছে তাতে প্রকাশক বোধ করি নিরুপায়।

• • •

সম্প্রতি বেশ কিছুকাল থেকেই আমাদের এই ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মীয় মৌলবাদের অভূতপূর্ব প্রভাববৃদ্ধি ঘটছে। এই অশুভ ঘটনাটি নিয়ে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক নন্দগোপাল ভট্টাচার্য ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৪

পর্যন্ত যেসব প্রবন্ধ লিখেছেন সেগুলিরই সংকলন গ্রন্থের নাম 'মৌলবাদের ক্ষমা নেই'। পুস্তকের নামকরণের মধ্যেই ঘটনাটি সম্পর্কে লেখকের মনোভাব সোচ্চার করে তোলা হয়েছে। এর ফলে শুরুতেই এমন আশঙ্কা হয় রাজনীতিক প্রাবন্ধিক বোধ করি এই রকম শ্লোগানধর্মী কিছু কথা উচ্চারণ করেই দায়িত্ব শেষ করবেন। কিন্তু বইটি পড়লেই বোঝা যায় কেবল মাত্র প্রচারপত্র রচনা লেখকের উদ্দেশ্য নয়। ধর্মীয় মৌলবাদ যেভাবে এদেশে ফ্যাসিবাদের চেহারা নিচ্ছে তার প্রক্রিয়া নির্ধারণ, তথ্য সংকলন এবং পরিস্থিতি বিশ্লেষণ তিনি পর্যাপ্ত পরিমাণে বস্তুনিষ্ঠ।

ধর্মীয় মৌলবাদকে ভিত্তি করেই যে এদেশে ফ্যাসিবাদের বিকাশ ঘটতে চলেছে তার লক্ষণগুলির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নন্দগোপাল ভট্টাচার্য লিখেছেন, "জার্মান ফ্যাসিবাদ যেমন জাত্যাভিমানের ভিত্তির উপর পুষ্ট, তেমনই সংঘ পরিবার 'একটি মাত্র ধর্মের প্রাধান্য স্বীকৃত' তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। হিটলারি ফ্যাসিবাদ যেমন উগ্র ইহুদিবিরোধিতা এবং লক্ষ লক্ষ ইহুদি হত্যার যজ্ঞ সংগঠিত করেছে, তেমনই সংঘ পরিবার মুসলিম জনগণের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি করে, এমনকি তার মুসলিম নিধনেও বিশ্বাসী।" (পৃ ২)..........."ইউরোপীয় ফ্যাসিবাদ যেমন সংসদীয় এবং সংসদীয় প্রথাবহির্ভূত উভয় পথেই তাদের শক্তির চূড়ান্ত প্রয়োগ ঘটিয়েছে, তেমনই ভারতেও সংঘ পরিবার সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্যে এবং তার বাইরেও যে কোনও পরিস্থিতির সুযোগ নেবার জন্য প্রস্তুত। বি জে পি যেমন সংসদীয় কাঠামোর মধ্যে কাজ করছে, পাশাপাশি আর এস এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরঙ্গ দল ইত্যাদি সংগঠন সংসদীয় ব্যবস্থার বাইরে কাজ করে চলেছে।" (পৃ. ২-৩)

কী ধরনের পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ধর্মীয় মৌলবাদের প্রচারক সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি বিশেষ করে ভারতবর্ষে এতখানি প্রভাবশালী হয়ে উঠল তার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শ্রীভট্টাচার্য লিখেছেন, "ধর্মনিরপেক্ষতা, সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জন্য অর্থবহ উন্নয়নের সম্ভাবনা ছিল বা রয়েছে তাকে একচ্ছত্র ধনবাদী পথে বিকৃতি ঘটিয়ে শাসকশ্রেণী অর্থনৈতিক-সামাজিক সংকটকে শুধু গভীর ও তীব্রতরই করেনি, দেশকে এক নৈরাজ্য ও হতাশার দিকেই টেনে নিয়ে গেছে। জাতীয় জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে সমস্ত স্তরে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের পাশাপাশি দেশের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দল ও শক্তিগুলির পারস্পরিক বৈরিতা এমন কি হানাহানি সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিকে এগিয়ে যাবার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বামপন্থীদের দৃঢ় অবস্থান সত্ত্বেও প্রয়োজনের তুলনায় হস্তক্ষেপের ক্ষমতা কম থাকায় এবং বাম-গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ জোট সত্যি সত্যি গড়ে না ওঠার জন্যই সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি এতবার সুযোগ পেয়েছে।" (পৃ.৭)

মৌলবাদীদের সংগঠন গড়ে তোলার প্রক্রিয়া সম্পর্কে যেসব তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে সেগুলির কোন কোনটি এমনই অশনি সংকেত বহন করে যে শঙ্কিত বোধ না করে উপায় থাকে না। যেমন, "বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং আর এস এস যে শিক্ষা সংগঠন পরিচালনা করে তার নাম বিদ্যাভারতী। বিদ্যাভারতীর মূল কেন্দ্র লক্ষ্ণৌ শহরে।......ইতিমধ্যেই বিদ্যাভারতী ৪০টি কলেজ পরিচালনা করে যার শিক্ষক সংখ্যা ১৩১২ জন, এবং অধ্যয়নরত ছাত্রের সংখ্যা ২০ হাজারের বেশি। সারা দেশে প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিদ্যাভারতী পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা ২৯৩৪, এবং শিক্ষকের সংখ্যা ৩১,১৭৭। এই স্কুলসমূহে পাঠরত ছাত্রের সংখ্যা ৭,৮১৮৮২। শহরাঞ্চলে স্কুলের সংখ্যা ১৮২২টি, বস্তিতে ৩১টি, গ্রামে ৯৬১টি এবং আদিবাসী অঞ্চলে ১২০টি।" (পৃ ১৩) এই ধরনের আরও অনেক তথ্যে পুস্তকটি পরিপূর্ণ।

এইসব তথ্য থেকে বোঝা যায় দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, পুলিশ, প্রশাসন এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ দওগুলির কর্মী-সমর্থকদেরও নিরবচ্ছিন্নভাবে বিচিত্র প্রক্রিয়ায় প্রভাবিত করার সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুসরণ করা হচ্ছে। এইভাবে মৌলবাদের ভাবাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত লোকবল তারা যে কখন কতদূর বাড়িয়ে ফেলতে সক্ষম সেটা সব সময় হিসাবের মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়। বহু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং অন্যান্য ফ্যাসিবাদী কাণ্ডকারখানায় তাদের ভূমিকার ব্যাপকতা দিয়েই টের পাওয়া যায় তাদের সাফল্যের বহর।

বইটির আর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, লেখক, যিনি স্বয়ং একজন বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা, একাধিক বার হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, বামফ্রন্টশাসিত পশ্চিমবঙ্গেও আত্মসন্তুষ্টির কোন স্থান নেই। কেবলমাত্র হুঁশিয়ারিই নয়, প্রচুর তথ্য পরিবেশন করে তিনি দেখিয়েছেন বিপদ কীভাবে এই রাজ্যেই ক্রমেই ঘনীভূত চেহারা নিচ্ছে। যেমন, "ইতিমধ্যেই রাজ্য পুলিশের মধ্যে ১৪৩৭ জন আর এস এস স্বয়ংসেবক আছে বলে জানা গেছে।" (পৃ. ৪৫) "১৯৯২ সালে (আর. এস. এস-এর) শাখা-উপশাখার মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮০০০-এর বেশি। অর্থাৎ ২ বছরে এই সংখ্যা বেড়েছে তিনগুণের মতো। বর্তমানে এই রাজ্যে আর এস এস-এর মোট পূর্ণ স্বয়ংসেবক ৩১৪২৩ জন, সাধারণ স্বয়ংসেবক ১,৩০৮৫৮ জন এবং সমর্থক স্বয়ংসেবকের সংখ্যা ১,৩৭,২০৫ জন। অর্থাৎ ১৯৮৯-৯০ এর তুলনায় পূর্ণ স্বয়ংসেবক বেড়েছে ৪৫ শতাংশেরও বেশি। আর সাধারণ স্বয়ংসেবকের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৪ গুণ এবং সমর্থক স্বয়ং সেবকের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৩ গুণ। সংগঠনটির এই বিপুল প্রসার বিস্ময়কর।" (পৃ. ৬৩) মনে রাখতে হবে উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে আর এস এস।

পরিশেষে শ্রী ভট্টাচার্য তাই লিখতে বাধ্য হয়েছেন, "এই কঠিন সময়ে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে বাম, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, দেশপ্রেমিক ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণকে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করেই বর্তমান কঠিন পরিস্থিতির মোড় ঘোরানো সম্ভব। এর কোন বিকল্প নেই।"

"আর লড়াইটা শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফ্রন্টেই সীমাবদ্ধ নয়। এটাই আমাদের অভিজ্ঞতা যে দেশের বিপুল অংশের অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা, অন্ধতা, কুসংস্কার, দারিদ্র্য, বৈষম্য ইত্যাদিকে সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তিগুলি তাদের উর্বর জমি হিসাবে ব্যবহার করছে। কাজেই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আর এই গভীর সামাজিক ব্যাধিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম একাত্ম হয়ে উঠেছে। এই সংগ্রামে সমাজের উন্নততর বিকাশে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন আধুনিক মননের বহুমুখী শক্তিগুলিকে সংহত করার উদ্যোগ নিতে হবে আমাদেরই।" (পৃ. ৭৮)

দায়িত্বশীল জননেতার এই মার্গদিশারী বাক্যগুলিকে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীতে রূপান্তরিত করে নিরবচ্ছিন্ন দীর্ঘস্থায়ী প্রয়াসের দ্বারা সেগুলির বাস্তবায়নের উদ্যোগই যে কেবলমাত্র ধর্মীয় মৌলবাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে রুখে দিতে পারে এতে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। এই কারণেই ধরে নেওয়া যায় শ্রী নন্দগোপাল ভট্টাচার্যের আলোচ্য গ্রন্থখানি অন্তত পশ্চিমবঙ্গে উল্লেখিত উদ্যোগ গড়ে তুলতে যাঁরা প্রয়াসী হবেন তাদের ক্ষেত্রে পথ নির্দেশিকার ভূমিকা পালন করবে। বিশেষ করে যেসব বামপন্থী কর্মী এখনও ধর্মীয় মৌলবাদের ফ্যাসিবাদী স্বরূপ সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হননি, এই গ্রন্থে পরিবেশিত বিপুল পরিমাণ তথ্যরাশি তাদের সচেতন এবং সতর্ক করে তোলার প্রশ্নে অব্যর্থ ভূমিকা পালন করবে। অবশ্য তার আগে প্রয়োজন দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারা। কারণ শ্রী ভট্টাচার্য সি পি আই-এর নেতা। কোনরকম সূত্র উল্লেখ ছাড়াই তিনি যেসব তথ্য পরিবেশন করেছেন এবং তাঁদের অনুসৃত পার্টি লাইন অনুযায়ী যে ধরনের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন এসবের প্রতি আস্থা স্থাপন করার পথে অন্যান্য বামপন্থী দলের কর্মীদের মনে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে দলীয় সংকীর্ণতা, কিংবা ভিন্ন দলের নেতার প্রতি আস্থাহীনতা। এইসব কথা ভেবেই এমন একটি সময়োপযোগী বইয়ের ব্যাপক সাফল্য সম্পর্কে মনে কিছুটা সংশয় থেকে যায়।

আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র ১— আইয়ুব হোসেন সম্পাদিত/পাঠক সমাবেশ, ঢাকা/১৯০ টাকা/ কলকাতায় পরিবেশক দে বুক স্টোর, পাতিরাম, উচ্চারণ, পুস্তক বিপণী

মৌলবাদের ক্ষমা নেই— নন্দগোপাল ভট্টাচার্য/নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা-৭৩/২৫ টাকা

চতুরঙ্গের কার্তিক ১৪০১ সংখ্যায় সমালোচিত 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন অ্যান্ড ট্রেড ইউনিয়ানিজম্ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল' নামক গ্রন্থটির গ্রন্থকারের নাম বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অনবধানতাবশত 'বিজয়কৃষ্ণ' ছাপা হয়েছে। গ্রন্থকার শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা শিক্ষামন্দির নামক বি.এড. কলেজের অধ্যক্ষ। ঠিকানা—গ্রাম+পো. আনুর, জেলা—হুগলী।

মহাদেব সাহার কবিতা

সুজিৎ ঘোষ

স্মৃতির উদ্দেশে তার ফুটে ওঠে এতো বনফুল
নিবিড় বকুল ঝরে পড়ে
বুঝি তারই শুষ্ক মালা ;
এমন শিশির ঝরে মানুষও কোনো শোকে তেমন কাঁদেনি
সারা বনভূমিময় বাজে দীর্ণ ব্যথিত রাগিনী,
আমরা নীরব তবু প্রতিবাদ প্রকৃতি জানায়।
(অন্ধ : মহাদেব সাহার রাজনৈতিক কবিতা)

আমি যখন বলি ভালোবাসি তখন শান্তি-আন্দোলন শুরু হয়
জাতি সংঘের প্রাসাদচূড়ায় গলতে থাকে বরফ,
লেবাননে বোমাবর্ষণ বন্ধ হয়, প্যালেস্টাইনে ওঠে উল্লাসধ্বনি
রুশ-মার্কিন শীর্ষ বৈঠকে গৃহীত হয় ক্ষেপণাস্ত্র হ্রাসের সিদ্ধান্ত
তখনই সবচেয়ে নিরাপদ হয়ে ওঠে মানুষের ভবিষ্যৎ ;
বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা কমে আসে, আমি যখন বলি ভালোবাসি।
(আমি যখন বলি ভালোবাসি : মহাদেব সাহার প্রেমের কবিতা)

ওপরের স্তবক দুটি মহাদেব সাহার যে বই দু'টি থেকে নেওয়া, সেই গ্রন্থদ্বয়ের নামানুসারে কবিতার শ্রেণীবিভাজন,—প্রেম, রাজনীতি বা অন্য অন্য নানা শ্রেণীতে—সমস্যা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। পাঠক প্রথম উদ্ধৃতিটি 'প্রেমের' কবিতা এবং দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি 'রাজনৈতিক' কবিতা বলে গ্রহণ করতে পারেন। অর্থাৎ কবিতার ক্ষেত্রে স্পষ্টাক্ষর শ্রেণীবিভাজন বহু ক্ষেত্রেই অর্থহীন হয়ে পড়ে। মহাদেবের কবিতা পাঠককে ক্রমেই আকর্ষণ করছে তার কবিতা হয়ে ওঠার গুণে।

মহাদেব সাহার জন্ম ১৯৪৪ সালে, পাবনায়। প্রথম গ্রন্থ 'এই গৃহ এই সন্ন্যাস' (১৯৭২) কবির আঠাশ বছর বয়সে প্রকাশিত। প্রচারমাধ্যমের তীব্র আলোকরশ্মির মধ্যে না থেকেও ১৯৭২ থেকে ১৯৯০ এর মধ্যে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে দুই বাংলার বাঙালি কবিদের মধ্যে তিনি নিজের স্থান করে নিয়েছেন।

সাঈদ-উর রহমান তাঁর 'পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা'য় (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩) ওপার বাংলার কবিতাকে পাঁচটি পর্বে চিহ্নিত করেছেন : ১৯৪৬-৫৪ ; ১৯৫৪-৫৮ ; ১৯৫৮-৬৫ ; ১৯৬৫-৬৯ ; ১৯৬৯-৭১। এই পর্ব-বিভাগ মানলে, ১৯৭১-এর পর যে পর্বের সূচনা মহাদেবের স্থান সেই পর্বে। এপারের পাঠকের কাছে অবশ্য পর্ব-পর্বান্তরের এত সূক্ষ্মতা অর্থবহ নয়, বরং ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২, ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ এবং ১৯৭১ এর পরবর্তী-কবিতাকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করে ওপার বাংলার কবিতার ধারার পরিবর্তন ও ধারাবাহিকতা চিহ্নিত করা যেতে পারে। মহাদেবকে এই হিসাবেও ১৯৭১ এর পরের পর্বের কবি বলে চিহ্নিত করাই সঙ্গত।

একথা লজ্জাজনক হলেও সত্য যে, ১৯৫২-র পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলন এপারের বুদ্ধিজীবীদের যথেষ্ট সচকিত, সচেতন করেনি। কিন্তু ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে এপার বাংলাও মানসজগতে ও বাস্তবে জড়িয়ে পড়ে। ফলে ওপারের কবিতা তথা সংস্কৃতির ফসল এপারে পৌঁছনোর ও আস্বাদনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

কবি বিষ্ণু দে সম্পাদনা করেন 'বাংলা দেশের কবিতা—এক স্তবক' (সেপ্টেম্বর, ১৯৭১), তার সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় তিনি লেখেন, "....পূর্ববঙ্গের যেটুকু গদ্য ও পদ্য সাহিত্য পড়তে পেয়েছি, তাতে মনে ইচ্ছা করে সাধ্যমতো একটি সংকলন প্রকাশ করতে, তাহলে পরিবেশগত ও মানসগত কারণে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সাহিত্যাবেগের উৎসের তারতম্যটা স্বচ্ছ হয়, যেমন হয় কিছু শৌখিনতার মিলটাও।" অবশ্য, উক্ত সংকলনে মহাদেবের কোনও কবিতা নেই, সম্ভবত তিনি পাননি হাতে।

কিন্তু, শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'পূর্ববাঙলার শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় (দ্বিতীয় সং, বৈশাখ, ১৩৭৮) মহাদেবের একটি কবিতা গৃহীত, 'আমার দুঃখগুলি'। পরবর্তীকালে এপার-ওপার থেকে প্রকাশিত সব সংকলনেই মহাদেবের কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়ে চলেছে।

মহাদেবের কবিতার শুরুতে এসেছে তাঁর শৈশবের স্মৃতি, স্মৃতিতে লোকালয়, নদী, শস্যক্ষেত্রের প্রতিভাস। অথচ, অনুভবের বিস্তারে এক 'ক্ষুধা'র তীব্রতা কবির 'শরীরে চোখে হৃদয়ে কেবল জ্বলে' — সে 'নির্মম ক্ষুধার আগুনে' 'সুমিষ্ট গোলাপ' থেকে হোটেল ক্যাবারে থেকে 'গোপন খাদ্য, পানীয়' 'সবুজ প্রান্তর থেকে ছিঁড়ে আনা ফল' বিপুল শস্যরাশি, ভোজ্য দ্রব্য মাদক কবি-চেতনায় ছড়িয়ে থাকে, কিন্তু সে-সব কিছুই, "তুলে দিই প্রতিদিন সেই অদৃশ্য রাজার হাতে, শূন্য হয় বিপুল ভাঁড়ার,/পরিপূর্ণ রসদশালা, তবু চোখের সম্মুখে শুধু/রসদহীন ক্ষুধার্ত সৈন্যের মিছিল, তাদের ক্রোধিত মুখ/বন্দুকের উদ্যত নালার মতো আমাকে, আমাকে দেখো বিদ্ধ করে রোজ।" (ক্ষুধা)

মহাদেবের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৭২-এ, "এই গৃহ এই সন্ন্যাস।" এই পর্বে শব্দ ব্যবহারে কখনও কখনও কবির সচেতন আত্মপ্রকাশ— হয়ত বা পাঠককে সচেতন করতেই লক্ষ করা যাবে :

"মনে হয় এক্ষুনি নামবে বৃষ্টি
ভিজবে রুক্ষ ক্ষেত, বনভূমি
গাছের গাউন থেকে গড়াবে জল
হাসপাতালের ব্যস্ত নার্স দাঁড়াবে জানলায়
দেখবে কী করে বৃষ্টি নামে
কী করে মেঘের হাউস থেকে পড়ে জল..."

গাউন, হাউস, ফ্লাইট ইত্যাদি শব্দের চিত্রকল্পে কবির নিজস্ব ভাষার অনুসন্ধান লক্ষ করা যাবে। কিন্তু আধুনিক কবিতার অর্থ-দ্বিত্ব স্বচ্ছন্দে এসে যায় এই কবিতায়ও :

"আবহাওয়ার বিজ্ঞপ্তি শুনি
বৃষ্টি হবে,
আকাশেও দেখি মেঘ
অথচ রোদও নয় বৃষ্টিও নয়
বস্তুত এইভাবে কাটছে সময়।"
(না রোদ না বৃষ্টি)

লক্ষণীয়, 'বস্তুত' শব্দটি অনায়াস চারমাত্রায় ব্যবহার করেন। পাশাপাশি বাস্তবের তীব্র অভিঘাতের সঙ্গে স্মৃতি অন্বিত হয়ে যায়,...এই শোকের শহরে আমি যার কাছে চাই ফুল, কিছু মনোরম/শোভা, যে সবের বিস্তৃত বর্ণনা আমি আপনাকে লিখতে পারি, সে/আমার হাতে শুধু তুলে দেয় দুঃখের বিভিন্ন টিকিট।" এই শোককে অবলম্বন করেই শৈশবের চেতনায় ফিরে যান কবি ; "....মর্মান্তিক অনুভবগুলি/আমার সবুজ সুখ, কোমল আনন্দ, নির্জন কান্নার স্বর/একাকী হাঁটতে পথে যেসব দুঃখ দিয়ে ভরে নিই যমজ পকেট/ঢাকার এইসব রঙিন দোকান হতে কিনতে পারিনে আমি/একেকটি সুখের সংসার, কাঠের ঘোড়া, সোনালি/চাবুক, তাই কাঁদি শৈশবের শ্যামল নদীর উপাখ্যান/ভেবে, যে কাঁদি আমি সঙ্গীহীন মধ্যরাতে সরকারী গোরস্থানে কিংবা/আমার গোপন ঘরে ফিরে এসে জ্বালাই/দিব্য মোম, শোকের গর্তে শুয়ে কাঁদি...." ব্যক্তিক শোকবোধের মধ্যে এখানে অন্তর্লীন থাকে সমষ্টির শোক, যখন কবির চিত্ররূপে ফুটে ওঠে "একেকটি সুখের সংসার" কিনতে না পারার অথবা "সঙ্গীহীন মধ্যরাতে সরকারী গোরস্থানে"র বেদনাবোধ। "শৈশবের শ্যামল নদীর উপাখ্যান ভেবে" মহাদেবের যে ক্রন্দন, তা শুধু ব্যক্তিগত কান্নাতে শেষ হয় না। সমকাল শুধু কান্নায় থেমে থাকে না, প্রেমের স্নিগ্ধতার মধ্যেও ধরা থাকে উত্তাল সময়, "তার বুকে আছে স্বর্ণচাঁপার গাছ, আকাশের মতো বড়ো নীল পোস্টাপিস....তার বুকে আছে/অরণ্যের চিত্রকলা, গোপন স্টুডিও ;/তার বুকে আছে দেরি করে ঘরে ফিরে ডাক দিলে যে দেয় দুয়ার খুলে/সেই ভালোবাসা"-এই অনুভবের মধ্যেই বাস্তবের ছবির প্রাবরণ (overlap) এসে পড়ে, "যখন শহরে বাধে গোলযোগ, ধর্মঘট হরতাল চলে/যানবাহন বন্ধ থাকে, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়/ঝাঁপ-ফেলা দোকানপাট দেখে মনে-হয় সমস্ত শহর যেন মৃত রবিবার", আবার তার পরেই মহাদেব ফিরে আসেন ব্যক্তিক বোধে, "তখনো দাঁড়িয়ে দেখি তার বুকে খোলা আছে জুয়েলারী শপ, ফুলের দোকান, / আকাশের মতো সেই বড়ো নীল পোস্টাপিস,/তার বুকে আছে/গোপনীয় খাম হাতে সোনালী পিয়ন "(তার বুকে আছে)

প্রেমের এই রোমান্টিক মুগ্ধতা থেকে আঠাশ বছরের কবির উত্তরণ-প্রয়াসও লক্ষ করা যাবে, "আমাকে পৌঁছতে হবে নারী আর সংসারের কাছে।" (কোনো বাস নেয় না আমাকে)

অক্ষরমাত্রিক ছন্দে কথ্য গদ্যের স্বাভাবিকতায় মহাদেব গড়ে তোলেন নিজস্ব কবি-ভাষা, "মা আমাকে বলেছিলো—যেখানেই থাকিস তুই/বাড়ি আসবি পয়লা বোশেখে। পয়লা বোশেখ বড়ো ভালো দিন/এদিন ঘরের ছেলে বাইরে থাকতে নেই কভু, বছরের এই একটি দিনে/আমি সিদ্ধিদাতা গণেশের পায়ে দিই/ফুল জল, কে বলবে কী করে কার বছর কাটবে,/বন্যা, ঝড় কিংবা অগ্নি কাণ্ড কতো কি ঘটতে পারে, তোর তো কথাই নেই/মাসে মাসে সর্দিজ্বর, বুক ব্যথা লেগেই আছে/বত্রিশ বছর বয়েস/নাগাদ এই সব চলবে তোর, জানিস খোকা, রাশিচক্র তোর ভীষণ খারাপ,/ যেখানেই থাকিস তুই বাড়ি আসবি পয়লা বোশেখে।..." কিন্তু কবির অনুভব "....ক্যালেণ্ডার পাল্টে যায়, আমার/জীবনে আর আসে না যে পয়লা বোশেখ।" (বৈশাখে নিজস্ব সংবাদ)

মহাদেবের এই পর্বের কবিতায় বাস্তবতা এবং বাস্তবতাকে ভেঙে কবিতার মায়ালোকে যাতায়াত প্রত্যক্ষ করা যাবে। এর আগে সাধারণ রীতি ছিল মায়া (illusion) থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তবে পৌঁছনো। মহাদেব বিপরীত রীতি গ্রহণ করেন : 'সন্দেহজনকভাবে পুলিশ ঘুরলে পিছে' — এই বাস্তব থেকে "...আমি যাবো পাখি হয়ে পুলিশ স্কোয়াড থেকে/জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে, বলবো—/আমি প্রেমিকার পলাতক গুপ্তচর," নিজের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণায় তাই সচেতন থেকেও মহাদেব সে-স্বাতন্ত্র্যে স্ফীত হন না, বলেন, "কিন্তু হায়, আমার ব্লাডগ্রুপের সাথে/কারো রক্ত মেলেনা কখনো।" (বন্ধুর জন্য বিজ্ঞাপন)

"রবীন্দ্রোত্তর আমরা ক'জন যুবা" কবিতায় "শুনুন রবীন্দ্রনাথ"—এই ধুয়া শব্দ দুটিতে আল মাহমুদের সুর থাকলেও বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথেই পরম আশ্রয় খোঁজেন, "....এমন কি ভুলে/যাই নিজেদের নাম, তখনো মনে রাখি / রবীন্দ্রনাথ

আমাদের আবহমান বাংলাদেশ / আমাদের প্রদীপ্ত বিপ্লব,/ রবীন্দ্রনাথ আমাদের চিরদিন একুশে ফেব্রুয়ারি।"

"দুঃখ আছে কতো রকম" কবিতায় ছন্দের নতুন নিরীক্ষা-স্বরবৃত্তের চাল—"কিংবা যেমন কারো কারো প্রেমের জন্যে প্যানপ্যানানি......কেন যে ঠিক দুঃখ করি তাই জানি না/কেবল বুঝি বুকের নিচে সুনীল জখম"। —এই ভাবেই দুঃখ স্বীকার করে নিয়েও দুঃখ নিয়ে বিলাস কবি প্রশ্রয় দেন না, ফলে ছন্দের চলনের বদল হয় দ্রুততায়, দুঃখ আর ভার হয়ে ওঠে না।

অন্তর্গত অসাম্প্রদায়িকতা মহাদেবের কবিতাকে সব বাঙালি পাঠকের কাছে গ্রহণীয় করে তোলে, "তোমার চোখে তাকিয়ে দেখি সূর্য ওঠে নরম সকাল/আমি তখন নামাজরত শুদ্ধচারী/তোমার চোখে তাকিয়ে দেখি/ আমায় দেখি নতুন করে হারিয়ে যাওয়া/গাঁয়ের রাখাল।" (তোমার চোখে)

লুপ্ত নিসর্গ, গ্রাম মহাদেবের চেতনায় আবেশ ছড়ায়, "খুলে দাও জলসত্র/তবু হায়/এ শহরে মরে লোকে ভয়ে জলশূন্যতায় আর/পিপাসায়।" (জলসত্র) বা "কোথাও লেকের জলে দামের মধ্যে মজে আছে মানুষের বাসি লাশ/নিসর্গের এই বিরক্তিকর সংসর্গ থেকে অবশেষে ফিরে আসে/ফতুর মানুষ,/তা হলে মানুষ কোথায় যাবে? তার নিসর্গ নেই, ছাদ নেই,/নেই এই সভ্যতার খাঁচার মধ্যে মানবিক জলবায়ুপুষ্ট প্রেম/মানুষের জন্যে নেই মানুষের প্রাণের কোনো সোনালি বাসরঘর।" (বিপজ্জনক ছাদ) নিসর্গভ্রষ্ট মানুষের সভ্যতার খাঁচা থেকে সমর সেনের মতো মহাদেব কোনও 'মেঘমদির মহুয়ার দেশে' আশ্রয় খোঁজেন না,—বিপজ্জনক ছাদই আশ্রয়, নিরুপায় আশ্রয়। এ-পর্বে প্রেম মহাদেবের কবিতার অন্যতম আলম্বন। কিন্তু, প্রেমের আবেগ প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর ভাষা অনলংকৃত অথচ আন্তরিক।

"তুমি না থাকলে এই বাড়িঘর শহরের লোকজন
সম্পূর্ণ আমার অপরিচিত মনে হয়
নিজেকেই নিজের অচেনা লাগে
মনে হয় দীর্ঘদিন থেকে আমি যেন কোনো
অজ্ঞাত অসুখে ভুগছি
তুমি না থাকলে বাস্তবিক আমি বড়ো কষ্টে পড়ি
বড়োই কষ্ট হয়।" (তোমাকে ছাড়া)

এই সহজ আন্তরিক আত্মপ্রকাশের মধ্যে দিয়ে মহাদেব সাহার কবি হিসাবে চলার সূচনা।

"মানব এসেছি কাছে" (১৯৭৩) সমকালীন বাংলাদেশের বৃহত্তর সমষ্টি চেতনা কাব্যের ভাষাকে অক্ষুণ্ণ রেখেও বারে বারে আত্মপ্রকাশ করেছে, কখনও কখনও সে-ভাষা অতি-প্রত্যক্ষ, রাজনৈতিক বক্তব্যও চলে আসে :

"দূতাবাসে উড়ছে পতাকা
অর্থাৎ স্বাধীন আমরা এ কথা মানতেই
হয়, রাষ্ট্রীয় সনদ আছে দেশে
দেশে আমরা স্বাধীন ;...
অথচ এখন কোনো রাজা নেই, রাজ্য নেই
কেবল আছে রাজ্যশাসন
আমরা এখন কারো প্রজা নই
প্রজাস্বত্ব সর্বত্র প্রবল
তাই কি আমরা এই প্রজাতন্ত্রে এমন বন্দী স্বাধীন ?"

'স্পর্শ' কবিতায় ফিরে আসে প্রেম, দেহ-সম্পৃক্ত, পড়ে যায় মহাদেবের অগ্রজ কোনও কবির কবিতা, কিন্তু চিত্রকল্পে রূপকল্পে মহাদেব আনেন বিস্তার :

"তোমার শরীরে হাত আকাশ নীলিমা স্পর্শ করে
....
জলের অতল থেকে জেগে ওঠে মগ্ন চরাচর
দেশ হয় দেশ, নদী হয় পুনর্বার নদী
নৈঃশব্দ্য নিপুণ হাতে করতালি দেয়
নিসর্গ উন্মুক্ত করে সারা দেহে নগ্ন শরীর
কোন খানে রাখি তুলে দেহের বিস্তার,...."

নিসর্গ-চেতনা মহাদেবের কবিতার অন্যতম প্রধান বিষয়, যে নিসর্গের বোধে নগরবাসী হয়েও মহাদেবের কবিতা 'নাগরিক' কবিতার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবাদে আক্রান্ত হয় না। অত্যধিক দূরন্বয়, ব্যঙ্গ বা দেশি-বিদেশি পুরাণ ইত্যাদির ব্যবহার তাঁর কবিতায় প্রাধান্য পায় না। অথচ, আধুনিক কবির শব্দ-শাসনের ক্ষমতা মহাদেবের কবিতায় লক্ষ করলে ধরা পড়বে—উদ্ধৃত অংশে 'নগ্ন' শব্দটি যেখানে অনায়াসে তিন মাত্রায় খেলিয়ে নেন, তার পরের পংক্তির 'বিস্তার' শব্দটি কিন্তু তিন মাত্রাই থাকে।

এই পর্বে 'ভ্রান্তিলতা' 'বদলবাড়ি চেনা যায় না', 'মাটি দে মমতা দে', 'কত নতজানু হবো, দাঁতে ছোঁবো মাটি', 'তাই মিথ্যা বলা,' 'ভিন্ন মানুষ' প্রভৃতি আরও কিছু কবিতায় ভাব-বক্তব্য ও চিত্ররূপের সমন্বয়ে পরিণতির দিকে যাত্রা করেছেন মহাদেব :

১. লতার মতন ওটা লতা নয়, ওটা সাপ, ওটা সাপ
লতার মতন হলে লতা হবে তার কোনো কথা নেই....
লোকে ওটা ঐ নামে ডাকে
সাপ তাকেই কোমল করে বলে লতা
লতার মতন ওটা লতা নয়, ওটা সাপ ওটা সাপ।
(ভ্রান্তিলতা)

২. তোমার কালো চোখের মতো পাল্টে গেছে বসতবাড়ি...
দেয়ালগুলি বদলে গেছে মাটির নিচে
লাল কবরে
শহরতলীর মধ্যে বিশাল এবড়ো খেবড়ো
কালো গাড়ি, লাশভরা ট্রাক

চেনা যায় না বসতবাড়ি, শহরতলী
চেনা যায় না।
(বদল বাড়ি চেনা যায় না)

৩. তুলে দে এখান থেকে তরতাজা এই কালো ঘ্রাণ
আমি নিয়ে যাবো
উঠোনে রোপণ করা পুঁইশাক, সবজির গাঢ় সজীবতা
তুলে দে একটু মাটি, একটু মমতা দে, মমতা তুলে দে
আমি নিয়ে যাবো....(মাটি দে, মমতা দে)

৪. কত নতজানু হবো, কতো দাঁতে ছোঁবো মাটি
এই শিরদাঁড়া হাঁটু ভেঙে
কতোবার হবো নুব্জ অধোমুখ?
আজীবন সেজদার ভঙ্গিতে কতো আর নোয়াবো শরীর?...
বুক ভাঙা বাঁকানো কোমরে আমি নতজানু লোক
কতো আর নতজানু হবো, কতো দাঁতে ছোবো মাটি!
(কতো নতজানু হবো কতো দাঁতে ছোঁবো মাটি)

৫. তুমি ভয় পাবে, ভয়ে ভীত হবে বলে কোনোদিন
মৃত্যুর বর্ণনা করি নাই,...
তুমি ভয় পাবে, ভীত হবে বলে কোনো মৃত্যু শোক
ও দুঃখ উচ্চারণ করি নাই,
এই সত্য কোনোদিন বলি নাই
পৃথিবীর তিন ভাগ জল মাত্র একভাগ স্থল।

—অত্যন্ত স্বাভাবিক উচ্চারণে, কখনও শব্দগুচ্ছের একাধিক প্রয়োগে বাস্তবের সত্যকে কাব্যের সুরে সম্পৃক্ত করেন মহাদেব। এই পর্বে কোনও কোনও কবিতায় একই সঙ্গে সাধু ও চলিত সর্বনামের প্রয়োগ লক্ষ করা যাবে,—'তাহাদের' 'যাহারা' শব্দের পরেই আবার 'যারা' শব্দের প্রয়োগ —মনে হয় কবির এই নিরীক্ষা সত্তর দশকের পরে বাংলা কবিতায় কোনও নতুন মাত্রা সংযোজনে সফল হয়নি। কিন্তু, যে ভাষা ইতিমধ্যেই মহাদেব অর্জন করেছেন, সেই ভাষায় হতাশা কাটিয়ে আবার একথাও বলে ওঠেন,

"আঙুলে আরশি করে চাঁদের চেয়েও ভালো চন্দ্রিমা দেখাবো
নারীর চেয়েও নারী প্রতিমা দেখাবো
দক্ষিণ সমুদ্রে যাবো, সমুদ্রেই যাবো।"
(দক্ষিণ সমুদ্রে যাবো)

এই প্রত্যয়ে স্থিত হয়ে কবি ভাবেন, 'আমার কী প্রয়োজন, কোথায় বিদ্রোহ হয়, বিক্ষোভ হয়/সংঘর্ষ বা ষড়যন্ত্র হয়'—কবি ভাবতে পারেন, 'আমি এ-কিছুতে নেই',—কোথাও আত্মসমালোচনায় আত্ম-আবিষ্কার, 'ভুল প্রতিমার কাছে হয়েছি আনত/ভুলে বিষলতা থেকে বিষ করেছি গ্রহণ' (ভুল সঙ্গ ভুল সহবাস), 'স্পর্শহীন, পরিচর্যাহীন, একাকী নিঃসঙ্গ আর কতোকাল দগ্ধ হবে প্রেম/ভালোবাসা মরে গেছে গত গ্রীষ্মকালে/এই বুকে মরে গেছে প্রেম।' কিন্তু, এই বোধ সিনিক নয়, কবির আত্মঅন্বেষণে একটি পদক্ষেপ মাত্র, "এই ধুলোঘ্রাণ নিয়ে ধুলোভারসুদ্ধ বুকে নিয়ে/আমি একবার তোমাদের কাছে যেতে চাই/মানব তোমার অতি কাছে যেতে চাই।" এবং "সব মানুষের মধ্যে কিছু অভিমান থাকে, সেইটুকু থাক।"

'চাই বিষ অমরতা' (১৯৭৫) এই আপাত-বিপরীত গ্রন্থনামে কবি কাব্য বিবর্তনের একটি পর্ব চিহ্নিত করেন। "কিছুদিন শোকে ছিলাম, মোহে ছিলাম, কিছুদিন নারীতে শোকাচ্ছন্ন ছিলাম/আরো কিছু দিন, আরে কিছু দিন...আরো কিছুদিন চন্দ্রাসক্ত, আরো কিছুদিন ঘুমিয়ে পড়বো, আরো কিছুদিন।"

মানুষ, প্রকৃতির কাছে আবার ফিরতে চেয়ে যেন রচিত হয় 'শস্যযাত্রা'—"অন্য বুকে তুলে নিয়ে/অন্য স্তব্ধ বিস্মিত হৃদয়, হৃদয়হরণ ভালোবাসা ও প্রত্যয়ে/তোমাকে ধরবো এই মেদ মজ্জা মাংসের ভিতরে, অন্যপারে।"..."শস্যারম্ভ/তুমুল সন্ন্যাসী, তবু শুভার্থী স্বাধীন,/তখন তোমার চুলে সমস্ত শরীরে এই সোনালি শস্যের/স্পর্শ এঁকে দেবো..."। মানুষ ও প্রকৃতির বিরোধে মহাদেব প্রকৃতির পক্ষ অবলম্বনে নির্দ্বিধ, "কতোখানি নত হলো ফুল তোমাদের ঘাতকতা দেখে....কল্যাণকুশল হন্তা তোমাদের পাশব-প্রধান বৃত্তি, যৌথযজ্ঞ,/বলিদান, দাহ, তোমাদের কঠিন/ ঘর্ঘর আরো কতো পাখির পালক ঝরার শব্দে উঠে গেলো গ্রাম/দেখো পাখি ও প্রকৃতির মতো শুদ্ধ কতো মানুষ লুকালো।" মহাদেবের এই কাব্যগ্রন্থে প্রকৃতি সম্পৃক্ত মানবকে সন্ধানের প্রয়াস ঘুরে ফিরে আসে, "যেতে যেতে অরণ্যকে বলি", "অপ্রাকৃতিক", "আমার হাতে দুঃখ পাচ্ছো" কবিতাগুলি এ-চেতনায় চিত্ররূপময়।

'প্রকৃত বিবাহ' কবিতায় বাংলা কাব্যের প্রথম আধুনিক কবি মধুসূদনের ভাবনার অনুরণন চলে, মধুসূদনের মতো কাব্যিক সিদ্ধান্তে কবি পৌঁছতে পারেন না যদিও, কিন্তু তাঁর কবিতা উপভোগ্য হয়ে ওঠে, "একা বর বিবাহ করিতে যাবে কোন দূরদেশে/শব্দ কি বিবাহযোগ্য! নারী কি বিবাহযোগ্য!/কবির বিবাহ হবে কিসের নিয়মে? আহা বুকে বড়ো বাজে!" "আমি কেঁপে উঠি, কেঁদে উঠি", "তোমাকে উৎসর্গ দুঃখ"র মতো কবিতায় মেঘ, বৃষ্টির সঙ্গে মানুষের দুঃখ-কান্না একাকার হয়ে যায়। "ফিরে তাকাতে মানা" কবিতায় মনে হয় সদ্য অতীত এবং বর্তমানের স্বদেশ-রাজনীতির সংকটে কবি এক নিজস্ব সন্ধ্যাভাষা খুঁজে নিয়ে সমকালীন কবিদের নিরুপায় অসহায়তা ব্যক্ত করতে চান। মহম্মদ নূরুল হুদা-কে উৎসর্গিত কবিতাটি (তুমি কিছুই পারবে না) এক কনিষ্ঠ কবির সততার চিত্রণে

এই ধরনের সমস্ত মানুষের পক্ষ থেকেই যেন মহাদেবের এক কাব্যিক প্রতিবাদ—সব দেশের কিছু কবি-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী সুযোগ পেলেই পার্থিব সুখসন্ধানে রত, তথাকথিত তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে এই প্রবণতা কিছু বেশি—

"যারা পারে তারা অন্য রকম মানুষ তারা অন্যভাবে
গড়ে ওঠা
তারা হাত তুলে হাওয়াও স্পর্শ করে
জলের অদৃশ্য অন্দর থেকেও তুলে আনে
হারানো হীরের আংটি
তারা জানে কীভাবে গভীর বাঁকা জলে মাছ ধরা যায়!
.....
তোমাকে সব দরোজা খুলে দিলেও তুমি কিছুই
পারবে না।"

এই গ্রন্থে অনেকগুলি কবিতাই অন্যান্য কবিদের নামে উৎসর্গিত, সে সমস্ত কবিতায় স্বভাবতই লেগেছে, ব্যক্তিগত আবেগের নম্র স্পর্শ। কিন্তু, স্মরণ রাখতে হবে, 'চাই বিষ অমরতা' নামে কোনও কবিতা নেই—কিন্তু সমস্ত কবিতাগুলি পাঠ করলে উপলব্ধি হবে যে বিষ ও অমৃত, মৃত্যু ও জীবনের দ্বান্দ্বিকতার কাব্যিক অনুসন্ধানে কবি এ-কাব্যে ব্যাপৃত।

'কি সুন্দর অন্ধ' (১৯৭৮) গ্রন্থ নামেও আপাত-বৈপরীত্যের রূপ প্রত্যক্ষ করতে চান মহাদেব। চলতি ভাবনা থেকে ভিন্ন ভাবে ভাবা এবং বলার এক বিশিষ্টতা এ-কাব্যে মহাদেব আনতে চেয়েছেন। শীত অন্য কবিদের কাছে প্রথাসিদ্ধ ভাবে প্রায় বৈরাগ্য বা মৃত্যুর ঋতু, কিন্তু মহাদেবের কবিতা, "শীতের সেবায় তবে সেরে উঠি" :

"আমার অসুখ নেই আর ; কাল সারারাত
থোকা থোকা মৃত্যু পান করে আমি সুস্থ হয়ে গেছি
আর কোনো অসুস্থতা নেই আজ,
আজ ভালো আছি!
.....
অবসাদবোধ আর মোহ মূর্চ্ছা ছিলো কিছু আগে
এখন শরীরে আর ব্যাধির স্পর্শ নাই, ভালো হয়ে গেছি।
শীতের সেবায় তবে সেরে উঠি, ভালো হই,
সুস্থ, প্রবাহিত হই!"

"দেশপ্রেম" কবিতায় বিষয়টি এক ভিন্ন মাত্রা লাভ করে :

"তা হলে কি গোলাপেরও দেশপ্রেম নেই
যদি সে সবারে দেয় ঘ্রাণ,...
কিংবা এ-আবহমান নদী কতোটা দেশকে ভালোবাসে
কোনো ভাবোচ্ছ্বাসে তাও কি জানতে হবে তাকে?...
তাহলে কি আকাশেরও দেশপ্রেম নিয়ে কেউ
কটাক্ষ করবে অবশেষে!"

এই সংকলনে 'চিঠি দিও', 'স্মৃতি', 'ভোরের প্রসঙ্গ', 'আরোগ্য উদ্যানে এ-হাসপাতালে', 'মানবিক', 'ফুলের মতো নীরব হয়ে আছি দন্তে' প্রভৃতি কবিতায় হার্দ্য উচ্চারণে বহুল চিত্রকল্পের বিস্তারে পাঠককে মুগ্ধ করে। 'দেশপ্রেম' কবিতাটির মতো 'কফিনকাহিনী' কবিতাটি মাত্র ষোলটি চরণে স্বদেশচেতনার এক আশ্চর্য প্রকাশ :

"...চারজন দেবদূত এসে ঘিরে আছে এক শবদেহ
একজন বললো দেখো ভিতরে সন্দেহ
যেমন মানুষ ছিলো মানুষটি নাই
মাটির মানচিত্র হয়ে ফুটে আছে তাই।....
চারজন দেবদূত এসে ঘিরে আছে একটি কফিন
একজন বললো দেখো ভিতরে নবীন
হাতের আঙুলগুলি আরক্ত করবী
রক্তমাখা বুক জুড়ে স্বদেশের ছবি!"

এই পর্বের আরও কিছু উল্লেখযোগ্য কবিতা 'ভিন্ন যাতনা' 'আবুল হাসানের জন্যে এলিজি' 'আমি মন্দ লোক' 'আলসা প্রহর' 'যদি কবিতা না লিখি' 'কিছুই দেয়ার নেই' 'মানুষই মহৎ শিল্প' 'মলয়ের মৃত্যুতে কয়েকটি পঙক্তি' 'তোমার ব্যাকুলতাগুলি নিয়ে'— স্মিতবাক্, শব্দ সংযমে এই পর্বের প্রায় সব কবিতাই রসোত্তীর্ণ। 'দেনা' নামে সংক্ষিপ্ত কবিতাটিতে পুরনো ত্রিপদী ছন্দের ব্যবহার ভাল লাগায়, যেমন 'আমার জন্য' কবিতায় ছ'মাত্রার এক একটি চরণে কবিতার সঙ্গে কবির সম্পর্কের হার্দ্য বোঝাপড়া, "কবিতা তোমায়/বারবার ভেঙে/বার বার খুঁড়ে/তোমার বক্ষ/সফলতা নয়/খুঁজেছি আমার ব্যর্থতা কতো গভীর দক্ষ!/...আমার আবেগে ফুটেছে কি কোনো/চিরহরিৎ বা/চিরবিষম,/তোমার চোখে কি/একফোঁটা জলও/জমেছে তাতেও/আমার জন্য!"

"তোমার পায়ের শব্দ" (ফেব্রুয়ারি, ১৯৮২) পূর্ববর্তী গ্রন্থের চার বছর পরে প্রকাশিত। ছত্রিশটি কবিতার এই সংকলনে মহাদেব সাহার রাজনৈতিক বিশ্বাস, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা সম্পর্কিত বোধ, ক্রোধ, হতাশা, দেশনেতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং দেশপ্রেম, ব্যক্তিপূজা একই সঙ্গে সংহত রূপ লাভ করেছে।

'ধুলোমাটির মানুষ' (ডিসেম্বর, ১৯৮২) চল্লিশটি কবিতার সংকলন। পূর্ববর্তী সংকলন 'তোমার পায়ের শব্দ'-এ স্বভাবতই এসেছিল স্মৃতিভারাতুর সদা অতীত, অতীতচারিতা। 'ধুলোমাটির মানুষ' সংকলনে মহাদেব নিজেকে নিজের টানা গণ্ডির বাইরে নিয়ে আসেন—বিশ্ব ও সমগ্র বাংলাদেশ এ-কাব্যগ্রন্থে নানা চিত্ররূপে, উল্লেখে মূর্ত হয়ে উঠেছে, ফলে লক্ষ করা যাবে কবির চৈতন্যলোকের প্রসার :

১. ...সেই রাজকুমারীর আর পরস্পর ভাসালো গণ্ডোলা।
২. সেও তো আমারই স্বপ্ন রূপময় এই যে ভেসিস....
৩. যেন রাত্রি নামে নক্ষত্রের নিবিড় কার্পেট
বুনি যামিনী রায়ের কোন সাতিশয় লোকজ মডেল।

৪. এই গাছগুলি কেমন মিষ্টিক আর প্রকৃতি পরেছে
সেই বাউল বর্ণের উত্তরীয়।
৫. তুমিই কি সেই অদৃশ্য স্বপ্নের পাখি কিংবা মায়াবী হরিণ
ছিলে আর কোনোখানে নেই; তুমিই কি সেই
গ্রীক পুরাণ কাহিনী?
৬. কখনো তোমার একটি মুখ হয়নি তো নয়নগোচর
শাগালের সুসমৃদ্ধ ঐশ্বর্যশালিনী প্রদর্শনী জুড়ে
সবার অজান্তে আমি খুঁজেছি তোমার মুখ;
৭. তোমারই দু'টি চোখ পিকাসোর চিত্রময় এলবাম
বোপে করেছি প্রত্যাশা
যামিনী কি জয়নুল-কামরুলেও তব তন্ন খুঁজেছি তোমায়...
৮. ব্লেক একবার তাকে প্রথম দেখতে পেরেছিলেন মাত্র...
৯. রিলকে এই গোলাপ বিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেছিলেন...
১০. এই গোলাপ একজন বিনয় মজুমদারকে প্রবল আক্রান্ত
করে ছেড়েছে...
১১. নক্ষত্রপুঞ্জকে ডলার ভেবেছি বলেই আমি বসে
আছি এমন
তোমার পথ চেয়ে, মধ্যপ্রাচ্যের কোনো বিমান
ধরার তাড়া নেই আমার...

মহাদেবের কাব্যের অন্যতম প্রধান অবলম্বন প্রেম—তা এই গ্রন্থেও স্বাক্ষর রেখেছে, 'স্মৃতিকথা'য় :

"....যতোবার ফিরে চাই সন্ধ্যেপনে এই তুচ্ছ
জীবনের দিকে
দেখি তুমি ছাড়া আর কোনো স্মৃতি কথা নাই
তোমার মুখশ্রী ছাড়া স্মৃতির এল্টিক আমি কিছুই রাখিনি!"

এ ছাড়াও 'ভালোবাসা' 'কোথাও পাইনা দেখা' 'এ সব কিছুই আমি চাই না' 'তোমার বর্ণনা' 'তরুণ প্রেমিকের প্রতি' 'অস্থিরতা, কেন অভিভূত নও' 'ভালোবাসা আমি তোমার জন্যে' প্রভৃতি কবিতায় মহাদেবের কাব্যের মূল উপজীব্য—প্রেম,—প্রেমের মুগ্ধতা ও তীব্র হাহাকারও একই সঙ্গে উচ্চারিত। ভালোবাসা কখনও 'মুগ্ধ মেঘের মতোই কখনো/কারো তৃষ্ণার জল!' 'অভ্রূ চোখের একটি চোখও কি অকস্মাৎ আমার সম্মুখে/তোমার দুষ্প্রাপ্য চোখ হয়ে উঠতে পারে না তেমন?" "ভালোবাসার জন্য ব্যাকুলতা আছে বলেই তো/রঙিন কুয়াশা কুড়োতে যাই না কোথাও—" "এসব কিছুই আমি চাই না, কোনোদিনই চাইবো না/শুধু তুমি যদি আমার জন্যে তোমার ভাঙা কাঁটায় চিরদিন/এমনি কিছু উষ্ণ উল বোনো।" "স্তীভবে দেখাবো মিল, অনুপ্রাস, শব্দের ব্যঞ্জনা/তোমার দেহের কাছে মূর্খ ছাড়া আর কিছু নই।" "তরুণ প্রেমিক তোমাদের হাসি, তোমার কুজন/তুমি তো জানো না আমারই বুকের ঝরাপাতাদের গান!" "ভালোবাসা যদি বলি কেন বলো বিদেশী উদ্যান?...তাই তো তোমাকে আমি, অস্থিরতা, তোমাকেও দিতে পারি/এমন মুগ্ধতা ছাড়া আরো কিছু তীব্র হাহাকার।" "ভালোবাসা আমি তোমাকে নিয়েই/সবচেয়ে বেশি বিব্রত আজ/তোমাকে নিয়েই এমন আহত/এতো অপরাধী, এতো অসহায়!"

"তোমার দূরত্ব" বা "তোমাকেই দেখি" কবিতায় মহাদেবও আরাগঁর মতো দেশ এবং প্রেমিকাকে একাকার চেতনায় ভাবেন :

"তোমার ভালোবাসার দূরত্বের চেয়ে এমন আর কি
দূরত্ব আছে আমার...
তোমার ভালবাসা থেকে দুই পা সরে দাঁড়ানো
তার চেয়ে কেনো দূরত্ব আমার জানা নেই,
আমার জানা নেই।...
হ্যালো বাংলাদেশ! আমার চিরসবুজ বাংলাদেশ!"

অথবা, "কোথাও কোনো স্থাপত্য দেখলেই তোমার মুখ
আমার মনে পড়ে যায়,...
আমার মনে পড়ে যায়, সিংহের মূর্তি দেখে
তোমার অহংকার;
মানচিত্রে সমুদ্রের দিকে প্রসারিত ব-দ্বীপের
কোনো অংশকে
দেখে স্বাভাবিকভাবেই তোমার দুটি ঠোঁটই
আমার মনে পড়ে,..."

মহাদেবের প্রেমের প্রকাশ স্নিগ্ধ, এ-পার বাংলার প্রেমের কবিতার সঙ্গে সাধারণভাবে তুলনায়, সে কবিতায় শরীরী দাহ নেই। এই স্বদেশবোধে স্থিত হয়ে নিসর্গ-সন্ধানী কবিও উচ্চারণ করেন, "তাই আর কতোবার বলবো? জুঁই ফুলের চেয়ে শাদা ভাত অধিক সুন্দর"।

"ফুল কই, শুধু অস্ত্রের উল্লাস" (১৯৮৪) মাত্র আঠাশটি কবিতার সংকলন। এই কাব্যগ্রন্থে মহাদেবের কবিতায় ব্যক্তিগত তন্ময়তার চেয়ে বিষয়গত মগ্নতা বৃদ্ধি পেয়েছে, নিসর্গ-নিবিষ্টতাও কিছুটা কমেছে, আবেগে ঘটেছে বৌদ্ধিক সমন্বয়, বৃদ্ধি পেয়েছে মননের মাত্রা। কিন্তু কখনের সহজ ঢঙ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন মহাদেব, যেমন, "শীতের শিকার" কবিতায় :

শীতে মারা গেছে আব্দুলের কিশোর ছেলেটি...
...সবাই গভীর দুঃখে বলে,
হায়, ছেলেটির জন্য এতোটুকু কাফনের কাপড়ও
জুটলো না
কারো কারো সমবেদনার ভাষা শুনে এও মনে
হয়েছে তখন
এরপর পৃথিবীতে আর কাফনের কাপড়ের অভাব
হবে না,
কিন্তু বেঁচে থেকে আব্দুলের ছেলেটির
শীতে একটুকরো কাপড় পাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই।"

এই কবিতায় প্রচ্ছন্ন অনুচ্চকিত ব্যঙ্গও মহাদেবের কাব্যে

নতুন সংযোজন। যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির পক্ষেও মহাদেব সোচ্চার :

"ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নব্ ইথারের রাজ্যে শুনি দুর্ভিক্ষ, দুর্যোগ,
মহামারী—
পোর্ট স্ট্যানলীতে যুদ্ধ না থামতেই দেখি
আক্রান্ত বৈরুত;
দেখি মারণাস্ত্র, নিউট্রন বোমার হুঙ্কার..."

অথবা, "আমি জানি একটি আণবিক বোমার চেয়ে দশলক্ষগুণ
শক্তিশালী মানুষের হৃদয়
কিন্তু রেগন জানে না...
যুদ্ধের বিরুদ্ধে মানুষের হৃদয়ই সবচেয়ে কার্যকর প্রতিরোধ
আর সেজন্যই এই ভালোবাসার কবিতা;
আমি দেখেছি কেবল এই কবিতাই হৃদয়ের সার্থক
অনুবাদ করতে পারে।"

অথবা, 'শান্তির গান' কবিতায় : "শান্তি চাই যারা শিশুদের ভালোবাসি/শান্তি চাই যারা রাঙা গোলাপ ভালোবাসি;/শান্তি চাই যারা লুমুম্বা, আলেন্দে ও শেখ মুজিবের/নিষ্ঠুর মৃত্যুর জন্য কাঁদি...."

এই সংকলনে যে ক'টি কবিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'লেনিন, এই নাম উচ্চারিত হলে', 'আফ্রিকা, তোমার দুঃখ বুঝি', 'স্বাধীন প্যালেস্টাইন তোমার জন্য এই কবিতা', 'গ্রেনাডার প্রিয় ভাইবোন'—এই কবিতাগুলিতে মহাদেব বাংলাদেশের মানুষ, বাংলাদেশের কবি হয়েও এক আন্তর্জাতিক মানবিক স্তরে নিজেকে উন্নীত করেছেন।

'লাজুক লিরিক' (১৯৮৪) কবিতাকণিকাগুলির মূল উপজীব্য প্রেম ও প্রকৃতি—লিরিকধর্মিতা মহাদেব সাহার কবিতার একটি সামান্য লক্ষণ। এই গ্রন্থে দুটি, চারটি ছয়টি বা আটটি মাত্র চরণে মহাদেব তাঁর ভাবকে রেখাচিত্রে এঁকেছেন; যেমন :

"তোমার বিষণ্ন মুখ দেখে মনে হয়,
সব ফুল ঝরে গেছে, পৃথিবীর বড়ো দুঃসময়।"
(লিরিক-৫)

অথবা, "শরীর জুড়ে আমার শুধু
ভালোবাসার গন্ধ
কেউ বা তাকে ভালো বলে
কেউ বা বলে মন্দ;
আকাশে মেঘ হৃদয়ে ঝড়
যতই চলে দ্বন্দ্ব,
তুমি ঠিকই জানো আমি
ভালোবাসায় অন্ধ"। (লিরিক—২২)

"আমি ছিন্নভিন্ন" (১৯৮৬) কবিতাগুচ্ছে এক হতাশাবোধে মহাদেব তাঁর কাব্যিক বেদনাকে প্রকাশ করেন :

"কতোবার এই কবিতার জন্যে সেই কৈশোর থেকেই
তছনছ করেছি জীবন
এই কবিতার জন্যে আমি আপাদমস্তক ছিন্নভিন্ন এমন ফতুর
ভাঙা শিবদাঁড়া, পোড়-খাওয়া একটি মানুষ
এই কবিতার জন্যে যীশুর মতোই আমি ক্রুশবিদ্ধ।"

অথবা, "পৃথিবীর এই দুঃসময়ে আজ এরূপ একটি ফুল
ফোটানো যে কতোটা কঠিন
আর তার সার্থকতা বিজ্ঞান ও মেধার যৌথ কৃতিত্বের
চেয়েও মহৎ।"

কবি দেখেছেন, "পৃথিবী জুড়ে তৈরী হচ্ছে মানুষ বিধ্বংসী বোমা, ক্ষেপণাস্ত্র, ভয়াল বারুদ", অনুভব করেছেন, "বড়ো সুসময় কখনো পাবো না।

ভিন্নতর এক ঐতিহ্য চেতনায় মহাদেব লেখেন:
"আমারও বলার আছে কিন্তু গদ্যে নয় গানেই বলবো
গানই আমার ভাষা;
আধুনিক গদ্য ভাষার চাইতে গানেই আমার অধিক পক্ষপাত
আমি আমার সমস্ত কথা তাই বলতে চাই না গাইতে চাই;
...একদিন পৃথিবীর সব কবিই যেমন গাইতেন;
আমাদের লালন, আমাদের হাসন রাজা, আমাদের মুকুন্দ দাশ,
আমাদের রমেশ শীল
আমাদের জারি, সারি, ভাটিয়ালি, মৈমনসিংহগীতিকা
স্বভাবত ইট-কাঠ-কংক্রিটের চেয়ে পদ্মা-মেঘনার
পলিমাটিই আমার অধিক প্রিয়।"

কিন্তু 'গান' চেয়েও মহাদেবের এই পর্বের কবিতার গাদ্যিক বিবৃতিধর্মিতা কোনও কোনও কবিতায় বেশি। আবার 'দিনমজুরের গান', 'সব নাও কবিতা নিও না' প্রভৃতি নিয়মিত ছন্দের কবিতাও রচিত হয়।

কিন্তু গ্রন্থের শেষ কবিতায় যে হতাশাবোধ প্রকাশিত, তা মহাদেবের কাব্যধারার যেন ব্যতিক্রম :

"এই ব্যক্তিগত শোকবার্তা যদিও কারোই মনে
বিশেষ চাঞ্চল্য কিছু জাগবে না ঠিক
তবুও, যেমন একটি গোলাপ বলে, একটি উদ্ভিদ বলে,
এই দেশ বলে, মানুষের সত্তার শুদ্ধতা বলে
আমিও তেমনি বলি সবচেয়ে সত্য আর মর্মান্তিক
একটি সংবাদ :
আমি ছিন্ন ভিন্ন—
আমার সমস্ত সত্তা ছিন্নভিন্ন আমার শরীর
ছিন্নভিন্ন, তবুও দাঁড়িয়ে আছি।"

১৯৮৯ সালে প্রকাশিত মহাদেবের নির্বাচিত কবিতায় ছয়টি অগ্রন্থিত কবিতা যুক্ত হয়েছে; এর মধ্যে আবার ফিরে আসে কবির আশাবাদ';—

"কান্তে তখনই চাঁদের চেয়ে সুন্দর যখন সে
শস্য ঘরে তোলে—

হাতুড়ির শব্দও কখনো কখনো সঙ্গীতকে হার মানায়
যখন সে সৃষ্টির গান শোনায়;
আমার কাছে তাই চাঁদের চেয়ে কম সুন্দর নয় কাস্তে,
কোমল হাতের চেয়ে কম সুন্দর নয় সৃষ্টির হাতুড়ি
যেমন প্রেমের চেয়েও আজ
মানুষের বিদ্রোহ সুন্দর।"

অথবা, "যদি পরিশুদ্ধ হতে চাও আরো ভালোবাসো,
আরো দুঃখ পাও, আরো কাঁদো, তবেই কল্যাণ
শুধু জয়মালা চাও, দুঃখ-কখনো চাও না
যদি পরিশুদ্ধ হতে চাও, ভালোবাসো কাঁদো।"
(ভালোবাসো, কাঁদো)

পরিণতির দিকে যাত্রায় মহাদেবের কবিতায় নিসর্গ কিছুটা নেপথ্যে চলে গেছে, মানুষ পেয়েছে প্রাধান্য। কিন্তু কবির ধ্রুবক হয়ে থাকে ভালবাসা।

স্বদেশকে ভালবেসে মহাদেব এক রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার দিকেও এগিয়ে চলেছেন, যদিও সোচ্চার রাজনীতি থেকে দেশকে ভালবাসায় কবিতাই তাঁর হাতিয়ার, কবিতাই বাহন।

বাংলাদেশে চতুরঙ্গের পরিবেশক
পাঠক সমাবেশ
১৭/এ, আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা

শিল্পী শাহাবুদ্দিনের সৃষ্টি-ভুবন

সত্যজিৎ চৌধুরী

দেওয়াল জোড়া ছবি সাজানো প্রদর্শনী ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালে সবারই একটা প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হয়। কোনও শিল্পীর প্রদর্শনী অনুভব করায়, ঘর জুড়ে যেন রঙ উথলে উঠেছে, রেখাকর্তৃত্বের অসীম ক্ষমতায় কেউ-বা দর্শকের মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ খেলিয়ে দেন। এই বিহ্বলতা কাটিয়ে ছবির মধ্যে নিবিষ্ট হতে একটু সময় যায়। কিন্তু ওই প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার রেশ কাটেনা শেষ অবধি, রয়ে যায় টুকরো টুকরো করে খুঁটিয়ে দেখার অভিজ্ঞতা গেঁথে তোলার সুতোর মতো। কোনও শিল্পীর সৃষ্টি-ভুবনে যাবার পক্ষে ওই প্রাথমিক উপলব্ধি তাই মহার্ঘ।

শাহাবুদ্দিন আহ্‌মেদের প্রদর্শনী ঘরের আবহাওয়ায় ধরা ছিল এক বিপন্ন বিশ্ব এবং বিপন্নতা পর্যুদস্ত করার মানবিক পৌরুষ। ক্যানভাসগুলির তীব্র সাদার ঝলক অনামনস্কতা মুহূর্তেই কাটিয়ে দেয়। টেনে নেয় অভিনিবেশ। নজরে আসে বিরাট ফাঁকা জমির মধ্যে তীব্র অভিব্যক্তিময় সব অবয়ব। ওই ফাঁকা জমি, বিরাট ওই অবকাশ যেন বিষয়ের স্থান-কাল নিরপেক্ষ চরিত্রকে অনির্দিষ্ট এক স্থান-কালে বা চিরায়তে উত্তীর্ণ করে দেয়। শিল্পী কি চান, স্থানকালোত্তীর্ণ ভাবাবহ থেকে, ওই অবকাশের তাৎপর্য মাথায় রেখেই দর্শক পটস্থ বিষয়কে দৃষ্টির নির্দিষ্ট সীমায় ধরবে, নির্দিষ্ট স্থানকালে ধৃত ঐতিহাসিক ঘটনা বা চরিত্রকে চিহ্নিত করবে? বোধহয় বিষয়ভাবনার এই বিশিষ্টতা থেকে শাহাবুদ্দিনের বিশিষ্ট শৈলী গড়ে উঠেছে। অন্তত কলকাতার সাম্প্রতিক প্রদর্শনীর চিত্রমালায়। পট অলাঙ্কৃত রেখে দেওয়ার এক ঐতিহ্য আছে চীন এবং জাপানের চিত্রকলায়। শাহাবুদ্দিনের শৈলীতে সে ধরনের গীতিমূর্ছনা নেই। ফাঁকা জমিকে তিনি যেন ব্যবহার করেন অনিশ্চয়তার তাৎপর্যে। পটের শূন্য নিরর্থ নয়, বরং ঐতিহাসিক তাৎপর্যব্যঞ্জক। যেমন 'যুদ্ধ' নামের ছবিটি উপবিষ্ট সন্ত্রস্ত নারীটির সামনে যেন এক অনন্ত অনিশ্চয়তার বিস্তার। চরিত্রটির দৃষ্টিকোণ থেকেই দর্শককে ওই শূন্যতার অবকাশে শিল্পী আকর্ষণ করেন। ঠিক তেমনই, 'এই প্রদর্শনীর অন্যতম স্মরণীয় কাজ, গুলিবিদ্ধ হবার মুহূর্তের মুজিব—যে প্রহৃত অবয়বের সামনেও রেখেছেন শূন্যতার বিস্তার। এ বিশ্বের সাম্প্রতিক বিমূঢ় করে দেবার মতো মুহূর্তের একটি — বঙ্গবন্ধুকে নৃশংস হত্যার মুহূর্ত। সে স্মৃতি সদ্য অতীতের এবং একেবারেই তাজা রয়েছে বিশেষভাবে এই ভারতে আমাদের মনে। তরুণ শাহাবুদ্দিন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। স্বদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধের তাপ উত্তাপ এড়িয়ে অনেক বুদ্ধিজীবী যখন ভারতে চলে আসেন—সেই সময়ে তিনি তুলি রেখে রাইফেল হাতে তুলে নিয়েছিলেন। তাঁর জীবন ও শিল্পের অন্তঃসার, ভাবাদর্শ, তিনি মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব থেকে সঞ্চয় করে এনেছেন। তাঁর ভাবনায় এবং কাজে সেই শাঁস স্থায়ী হয়ে যাওয়া খুব স্বাভাবিক। শিল্পী হিসাবে আত্মবিকাশের, উত্তরণের প্রাথমিক পর্বের সেই ভাবাশ্রয়ের জের তাঁর ছবিতে ফিরে ফিরে আসে। আমরা উপলব্ধি করতে পারি, মুজিব হত্যার মুহূর্ত তার পক্ষে কী প্রবল এক অভিঘাত, যা স্থায়ী ক্ষত রেখে গেছে। সেই মুহূর্তের পরে বাংলাদেশে আজও কোনও স্থিতাবস্থা এল না। অন্তত শাহাবুদ্দিন দেখতে পান না কোনও নিশ্চয়তার ভূমি। 'বঙ্গবন্ধু' নামে ছবির পটও তাই বোধ হয় আকুল করা শূন্যতায় ভরা।

এবং এই বিপন্নতা বোধে ছেয়ে থাকে তাঁর হাতের অন্য প্রতিকৃতিগুলি; মহাত্মাগান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, এমন কী সত্যজিৎ রায়-এর প্রতিকৃতি। প্রদর্শনীতে খুব তাৎপর্যময় বিন্যাসেই 'বঙ্গবন্ধু'-র সামনে রাখা ছিল মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতি। গান্ধীর সাতখানা প্রতিকৃতিতেই দেখি এক নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্বকে। অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সত্যজিৎ রায়-এর দৃষ্টিতে দর্শকের চোখ আটকে যাবে। সে দৃষ্টিতে প্রবল অভিব্যক্তি রয়েছে বিপন্নতার, যন্ত্রণার। শাহাবুদ্দিনের ভাববিশ্বের এই উপলব্ধিতে অবশ্যই তাঁর স্বদেশের সাম্প্রতিক ঝলকে ওঠে। কিন্তু সে শুধুই তাঁর স্বদেশের বাস্তব নয়, আরও বড় বাস্তব, আরও ব্যাপ্ত বিপন্নতার বিগ্রহ হয়ে ওঠে তাঁর হাতের মুজিব-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-সত্যজিৎ। এ কাজগুলি প্রচলিত অর্থের প্রতিকৃতিশিল্প নয়। ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি রূপান্তরিত হয়ে শিল্পীর নিজস্ব কালচেতনা, বাস্তবচেতনার প্রতিমায় দাঁড়িয়েছে। কোনও প্রতিকৃতিতেই ধরে রাখে বাস্তবিক করার চেষ্টা আদৌ নেই। চেনা মানুষের অবয়বকে তিনি নিজস্ব উপলব্ধির আধার হিসাবে নতুন করে, প্রবল এক ইন্দ্রিয়-সংবেদনময় আঙ্গিকে নির্মাণ করেছেন। গড়িয়ে যাওয়া সাদা রঙের ধারার মধ্যে রূপাভাসগুলি, আকৃতির অভিব্যক্তিগুলি অবার্থভাবে আমাদের সন্নিধানে এগিয়ে আসে যেন। এই কৃৎকৌশলে মিশে আছে বিশেষ করে পশ্চিমি আঙ্গিক-নিরীক্ষার অনুশীলন। কিন্তু শাহাবুদ্দিন যে সামর্থ্যের উজ্জ্বল সব স্বাক্ষর এই প্রদর্শনীতে নিবেদন করেছেন তার সামনে দাঁড়িয়ে কার কতটা প্রভাব রয়েছে সে হিসাবে প্রবৃত্তি হয় না।

প্রভাব তো থাকেই। প্রভাব না বলে বলা উচিত ঐতিহ্য

আত্মস্থ করে নেওয়া। প্রতিকৃতি ভিন্ন অন্য ক্যানভাসগুলির অনেক-কটিতে দেখা গেল প্রবল গতিমত্ত এক পুরুষকে, যে ছবির স্থানগত সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে। খুব কাছে গিয়ে নিরীক্ষণে ধরা যায় কেমন ক্ষিপ্রতায় ব্রাশ টেনেছেন শিল্পী। রঙের পোঁচ মসৃণ করে মিলিয়ে দেওয়া নয়। রঙের উচ্চাবচতায় পেশীর প্রচণ্ড শক্তি আক্ষিপ্ত হয়ে পটস্থ আবহাওয়াকে উত্তাল করে তুলছে। এই আঙ্গিকের কোনও স্তরে মাইকেলএঞ্জেলো বুয়োনারোতির কৃৎকৌশলের বনিয়াদ থাকতেও পারে। সব সমর্থ শিল্পীই ঐতিহ্যাগত আঙ্গিকের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করেন, কিন্তু ব্যবহার করেন নিজস্ব বিষয়ভাবনার গরজে। নিজস্ব শৈলীর উপাদান হয়ে যায় পূর্ব-পূর্বপুরুষের অভিজ্ঞতার ইঙ্গিত। এই কাজগুলি এক ভিন্ন ভাবাবহ বয়ে আনে। বার বারই ওই দুর্ধর্ষ পুরুষটির সামনে ফিরে গেছি প্রদর্শনীতে। মনে হয়েছে, এই কি সেই অপরাহত মানব যে সব বিঘ্ন-বিপত্তি পেরিয়ে যায়ই যায়। সব প্রতিরোধ চূর্ণ করে। সৃষ্টি করে নতুন ইতিহাস। শুধুই বিপন্নতা নয়, এক বিজয়ী জাতিসত্তার শরিক শাহাবুদ্দিন। এক স্বাধীন রাষ্ট্র-সত্তার অগণিত প্রতিষ্ঠাতা যোদ্ধার তিনি অন্যতম। বিপর্যয়ের মধ্যেও সেই স্মৃতি ম্লান হবার কথা নয়। নয় বলেই তাকে এমন উত্তরণের, এমন অপরাহত পৌরুষের মহৎ শিল্পরূপ সৃষ্টি করতে হয়।

এই ভাবাবহই এক তীব্র প্রতীকে সংহতি পায় সেই বিস্ময়াবহ কাজটিতে যেখানে সদ্যোজাত সন্তান দুহাতে উপর আকাশে তুলে ধরেছেন এক মাতা—যাঁর বিক্ষত মাতৃ-অঙ্গ থেকে দর্শকের দৃষ্টি উঠে যায় সটান দেহ পেরিয়ে আকাশমুখী দুই হাত এবং হাতে ধরা সন্তানটির অবয়ব পেরিয়ে দূরন্তর আকাশের দিকে। একি শিল্পীর মাতৃভূমির প্রতীক বিগ্রহ? খুব উদ্দীপ্ত সৃজন-কল্পনা থেকে জাত কাজ।

প্রহৃত মানবতার শঙ্কাতুর ভূমি অতিক্রম করে যাচ্ছে পরাক্রান্ত মানুষ। নিজেকে দীর্ণ করে জন্ম দেওয়া নবজাতককে গরীয়সী মানব-জননী বা দেশ-জননী তুলে ধরে আছেন আলোকিত আকাশে। একে তো বলতেই হবে অপরাহত মানবতার প্রতিমা। শাহাবুদ্দিন শেষ অবধি আমাদের এই ভাবাশ্রয়ে উত্তীর্ণ করে দেন।

পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী বাংলাদেশের শিল্পী শাহাবুদ্দিন এখন খ্যাতি-প্রতিপত্তির শীর্ষে রয়েছেন। তাঁর সৃষ্টি-ভুবনে একটা সন্ধ্যা যাপনের অভিজ্ঞতায় এই শক্তিমান শিল্পীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর বিকাশ সম্পর্কে অপার ভরসা এবং ঔৎসুক্য নিয়ে ফিরেছি। শুধু একটাই খটকা মনে ওঠে। স্বদেশাভিমানী এত বড় মাপের একজন প্রতিভাবান মানুষ কেন প্রবাসে দিন কাটাবেন। হোক্ সে প্রবাস শিল্পতীর্থ প্যারিস! ছিন্নমূল ব্যক্তিসত্তা কি প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায়?

‘ধর্ম ও রাজনীতি’

ধর্ম ও রাজনীতি নিয়ে চতুরঙ্গ চৈত্র ১৪০০ সংখ্যায় স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সেই সঙ্গে ছাপা হয়েছে উক্ত বিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত আবদুর রউফের ‘অন্নদাশংকর রায়ের সেকুলার ভারতবর্ষ’। চতুরঙ্গেরই শ্রাবণ ১৪০১ সংখ্যায় ঐ প্রবন্ধগুলির ওপর দুটি চিঠি ছাপা হয়েছে। শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অশোক মৈত্রের। বর্তমান পৃথিবীর দেশে দেশে যখন ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি মধ্যযুগীয় মাতলামি ছাড়িয়ে গেছে, তখন চতুরঙ্গের এই মানবকল্যাণমুখী প্রয়াস ধন্যবাদার্হ। স্বামীজির প্রবন্ধের উত্তর দিয়েছেন শৈলেশবাবু। ‘যাবতীয় ধর্মমতের সারাৎসার যে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি স্বামীজি ইঙ্গিত করেছেন, তাকে বর্জন করার কথা অধিকাংশ ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিরা বলেন না।’ আবার রউফ সাহেবের প্রবন্ধের সমর্থনে তিনি বলেন ‘স্টেট থেকে চার্চের অর্থাৎ প্রচলিত ভাষায় রাজনীতি থেকে ধর্মের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ বা ধর্মনিরপেক্ষ রাজ্যব্যবস্থা ও রাজনীতি বাঞ্ছনীয়।’ বিশেষজ্ঞ শৈল্যচিকিৎসকের মতো জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের সাম্প্রতিক মৌলবাদী রাজনীতির শবব্যবচ্ছেদ করেছেন। শৈলেশবাবু ও অশোক মৈত্র দু’জনেই তাঁর প্রবন্ধটিকে সমর্থন জানালেও মুসলিম স্বতন্ত্রবাদী আন্দোলনের সূচনা নিয়ে জয়ন্তানুজবাবুর বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন শৈলেশবাবু। আমার মনে হয় এক্ষেত্রে শৈলেশবাবুর বক্তব্যই সত্যের কাছাকাছি। তিনি যে ওয়াহাবী শুদ্ধবাদী আন্দোলনের উল্লেখ করেছেন, তার জন্ম মধ্যপ্রাচ্যে এবং ১৮১৮ সালেই ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের প্রখ্যাত সংস্কারবাদী শাসক সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ (১৮০৮-১৮৩৯) জন্মস্থানেই ঐ আন্দোলনকে হত্যা করেন। ভারতবর্ষে সৈয়দ আহমদ রায় বেরিলি ওয়াহাবী আন্দোলনের সংগঠক। তিতুমির ও দুদুমিয়া তাঁর দ্বারাই অনুপ্রাণিত। কিন্তু ১৮৩১ সালে শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রায় বেরিলি এবং ঐ একই বছর ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে তিতুমির মৃত্যুবরণ করেন। তবে জয়ন্তানুজবাবুর একথা মিথ্যা নয় যে ‘জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে হিন্দু ধর্মের ব্যাপক প্রভাবের ফলে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ধর্মের মাধ্যমে সুরক্ষার চেষ্টা অনিবার্যভাবেই শক্তিশালী হয়েছে।’ অশোক মৈত্রের ছোট্ট চিঠিখানা আমাদের এক বড় সত্যের সামনে দাঁড় করায়। ধর্ম যদি ব্যক্তির নৈতিকতা গঠনে সত্যিই কিছু ভূমিকা পালন করে, তাহলে সে ধর্ম লৌকিক বা সমাজ জীবনে ক্রিয়াশীল ধর্ম। প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম শ্রেণী শোষণেরই একটি হাতিয়ার। ধর্মের আদি সাম্যবাদী (egalitarianism) রূপকে ধ্বংস করেই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের উৎপত্তি। তবে জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বক্তব্য, শৈলেশবাবু যাকে ‘খুবই যুক্তিযুক্ত’ বলেছেন তাঁর চিঠিতে, তা আমাদের বেশ ভাবনার মধ্যে ফেলে দেয়। জয়ন্তানুজ বলেছেন ‘মানুষের ধর্মবিশ্বাস অগণতান্ত্রিক জবরদস্তির মাধ্যমে সরাসরি আঘাত না করে বিশ্বাসের মধ্য থেকে যদি সাম্য ও মুক্তির আদর্শের নির্যাস বের করে আনা যায়, আর ধর্মের নামে সে বিশ্বাসকে দলিত-শোষিত শূদ্র মানুষের মুক্তির রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে বিদ্রোহে, প্রতিরোধে, বিপ্লবে ব্যবহার করা যায়, তবে বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে তাতে আপত্তি থাকার বিশেষ কারণ থাকতে পারে না।’ অবশ্যই এ বক্তব্যে দ্বিমত পোষণ করার অনেক কারণ আছে। তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে ইউরোপের ওয়াট টাইলার ও টমাস মুনৎসারের কৃষক বিদ্রোহ, ইংলন্ডের লেভেলার ও ডিগার আন্দোলন এবং সাম্প্রতিককালের লাতিন আমেরিকার তথাকথিত লিবারেশন থিয়োলজির সাক্ষ্য হাজির করেছেন। মানুষের ধর্মবিশ্বাসের ওপর আঘাত করা কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা সমাজ ব্যবস্থার নীতির মধ্যে পড়ে না। আবার ধর্মে জবরদস্তিও কোন স্থান নেই। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাসের ওপর আঘাত করার প্রবণতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু ধর্ম নিয়ে জোরজবরদস্তি যেন ইদানীংকালে বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানেই গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ মেলে। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দেয় যে লেখক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বা অশোক মৈত্রের মতো চিহ্নিত প্রগতিশীল, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী একজন আধুনিক মানুষের মুখ থেকে ধর্মের ব্যাখ্যা দেশের অশিক্ষিত-ধর্মভীরু মানুষের কাছে কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে? ধর্ম সম্বন্ধে তাঁদের চাইতে একজন অজ্ঞ-অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত পুরোহিত-যাজক বা মোল্লার বক্তব্য কি জনসাধারণের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য হবে না? তিনি ইউরোপ ও ইংলন্ডের সেসব আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেছেন, সে সময়ে ধর্মীয় অনুষঙ্গ ব্যবহার ছিল সময়ের দাবি। আর সেদিনের লিবারেশন থিয়োলজি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে ছিলেন স্বয়ং পোপ। চার্চের রাজনৈতিক ক্ষমতা যতই হ্রাস পাক না কেন, এখনও পোপের কথা লক্ষ লক্ষ খ্রিস্টানের চিন্তাকে প্রভাবিত করে। কায়রোতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ‘আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলন’ নিয়ে দ্বিতীয় জন পোপ পলের নেতৃত্বে খ্রিস্টান মৌলবাদীদের তাণ্ডবলীলা প্রত্যক্ষ করা গেল। মুসলিম মৌলবাদীদের কথা আর এখানে উল্লেখ করলাম না। কারণ তা এখন বিশ্বের সেরা আলোচ্য বিষয়। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের ধর্মবণিকেরা আজ ঐক্যবদ্ধ। তারা বিশ্বজুড়ে একই ভাষায়, একই সুরে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার মুণ্ডুপাত করছে এবং তাদের ইচ্ছা ও সুবিধামত ধর্মের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করছে। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী মানুষেরা তাদের কাছে ধর্মদ্রোহী,

মুরতাদ। তাদের সেই অগণতান্ত্রিক ও অধর্মসম্মত ক্রিয়াকলাপের প্রতিক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক শক্তি আজ দিশেহারা। ভারতে মৌলবাদী রাজনীতির সাম্প্রতিক অভ্যুত্থানের পিছনে ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল ও শক্তিগুলির ভূমিকার কথা জয়ন্তানুজবাবু নিজেই অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রমাণ করেছেন। তাঁর সে বিশ্লেষণ বাংলাদেশের জন্যও সত্যি। এরপরও কি বলা যায় যে তাবৎ প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবী একযোগে ধর্মবিশ্বাসের মধ্য থেকে যদি সাম্য ও মুক্তির আদর্শের নির্যাস বের করে আনতে সচেষ্ট হয়, তার ফল পরিশেষে ধর্মবণিকের ঘরে জমা হবে না?

হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান ধর্মবাদীরা নিজেরাই স্ব স্ব ধর্মের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে তাঁদের ধর্মীয় আঙিনার বাইরে ঠেলে ফেলে দিতে চাইছেন এবং নিজেদের একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে ধর্মের নামে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে চাইছেন। জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, ‘সরাসরি হিন্দুত্ববাদী যেসব রাজনৈতিক দল রামায়ণের কল্পকাহিনীকে আশ্রয় করে হিন্দি বলয়ে ধর্মান্ধ হিন্দুদের দলে টেনেছে, আর আদিম বর্বরতায় ধ্বংস করেছে বাবরি মসজিদ, সেসব দলও ধর্মকে রাষ্ট্রশক্তি দখলের হাতিয়ার হিসাবেই ব্যবহার করছে’। সমগ্র পৃথিবীর সকল ধর্মবাদী রাজনৈতিক দল, যারা সুপরিকল্পিতভাবে গণতন্ত্রের স্থলে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার নামে নিজেদের ক্ষমতাসীন করতে চাইছে, তাদের যুক্তিবিন্যাস ও বক্তব্যের অপূর্ব সাযুজ্য লক্ষ করা যায়। সেখানে কাউকে হিন্দু, মুসলমান বা খ্রিস্টান বলে চেনা যায় না।

আমেরিকায় ‘ওয়াল বিল্ডার্স’ নামে একটি সংস্থা আছে। তারা মনে করে স্বাধীনতার পর প্রথম যুগের সংবিধান-রচয়িতারা আমেরিকাকে জুডিও-খ্রিশ্চিয়ান মূল্যবোধ ও নীতির ওপর ভিত্তি করে একটি রিপাবলিকান রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে নয়। কিন্তু বর্তমানে আমেরিকাকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। প্রথম যুগের রাষ্ট্রনায়কদের এটা কাম্য ছিল না। গণতন্ত্রের শক্তিতে ঈশ্বর ও বাইবেলে অবিশ্বাসী বা নির্বিকার ব্যক্তিরা আমেরিকার রাষ্ট্রক্ষমতা অধিষ্ঠিত হচ্ছে। এভাবে ঈশ্বর ও বাইবেল প্রদর্শিত পথ থেকে সরে এসেছে বলে আজ দেশটি গভীর নৈতিকতার সংকটে নিমজ্জিত। সংস্থাটি, তাদের মতে, পুরনো সেই ধর্মভিত্তিক সংবিধান পুনঃস্থাপনের জন্য কাজ করে চলেছে। সংস্থার সভাপতি ডেভিড বার্টনের লেখা ‘Keys to good Government : According to Founding Fathers’ নামে ৩০ পৃষ্ঠার একখানা চটি বই সম্প্রতি হাতে এসেছে। বইটির প্রকাশ এ বছরেই। একই শিরোনামে একটি অডিও-ভিডিও ক্যাসেট সারা বিশ্বে প্রচারিত হয়েছে। বইটি পড়ে বাংলা প্রবাদটির কথা মনে হল। ‘বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা।’ বইটিতে গণতন্ত্রের পিণ্ডি চটকানো হয়েছে এবং বাইবেল ও খ্রিস্টান ধর্মকে রাষ্ট্র পরিচালনার ও রাজনীতির মূল সংবিধান হিসাবে গণ্য করার পক্ষে যুক্তি উত্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশে খুনী, অন্যের ধন লুণ্ঠনকারী ও নারীধর্ষণকারী জামাতে-ইসলামীও দাবি করে ‘কোরান তাদের সংবিধান’। বার্টনের বইটির প্রথমেই আমেরিকার সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের একটি চিত্র তুলে ধরে পাঠকের মনকে পরবর্তী যুক্তি-বিন্যাস গ্রহণের উপযুক্ত করে তোলার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। লেখক আদালতে মীমাংসিত কয়েকটি মামলার রায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। উক্ত মামলাগুলিতে আমেরিকার সংবিধান-সম্মত গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির লংঘনকারীরা পরাজিত হয়েছেন বা শাস্তি পেয়েছেন। যেহেতু ওয়াল বিল্ডার্স গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী নয়, তাদের চোখে ঐসব মামলার রায়ে খ্রিস্টিয় বিশ্বাস ও বাইবেলেরই পরাজয় ঘটেছে। যেহেতু পরাজিতরা বাইবেল ও খ্রিস্টান ধর্মকে উঁচুতে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, তাই তাঁরাই সঠিক। ওয়াল বিল্ডার্স, এভাবে আমেরিকান বসে আমেরিকায় সংবিধানের প্রতিই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে।

এরপর প্রশ্ন তোলা হয়েছে ‘ভাল সরকার কাকে বলে?’ উত্তরে বলা হয়েছে ‘God makes it clear that the purpose of government is to reward the righteous and to punish the wicked’. তারা মনে করে আমেরিকার বর্তমান গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান ঠিক এর উল্টো কাজ করে। ‘the wicked are protected and the righteous are punished’. কাজেই আমেরিকার এখনকার সংবিধান ‘every Biblical standard for good government’ ভঙ্গকারী একটি সংবিধান। বার্টন বলেন, ‘the quality of government depended not upon the goodness found in laws, but rather upon goodness found in leaders.’ সেই ভাল মানুষরাই রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকারী। বার্টন আরও বলেন ‘you had to believe that god's principle applied to civil government or they wouldn't let you near public office—you were a dangerous person to have as a leader.’ সিভিল সরকার পরিচালনার জন্য যারা ঈশ্বরের নীতিমালা উপযুক্ত বিবেচনা করবে না, সেইসব ‘খারাপ’ মানুষকে কোন পাবলিক অফিসের আশপাশে ভিড়তে দেওয়া হবে না। একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায় স্বামী লোকেশ্বরানন্দের প্রবন্ধে, ভারতের

বি জে পি ও সংঘ পরিবার ও বাংলাদেশের জামাতে-ইসলামিসহ সকল সাম্প্রদায়িক দলের মুখে। স্বামীজি বলেন 'রাজনীতি থেকে যদি ধর্ম বাদ দেওয়া হয়, তাহলে যিনি রাজনীতি করবেন, তিনি আর সত্যনিষ্ঠ থাকার কোন প্রয়োজন বোধ করবেন না।' কাজেই যিনি রাজনীতি করবেন তাঁকে অবশ্যই একজন খাঁটি ধার্মিক (এক্ষেত্রে হিন্দু) হতে হবে। মওদুদীর বক্তব্য হচ্ছে মুসলমান নামধারীরা সবাই মুসলমান নয়—তাদের মধ্যে সব রকমের কাফের পাওয়া যাবে। তিনি বলেন 'যে বিপুল বিশৃঙ্খল জনতাকে মুসলমান জাতি বলা হয়, তার অবস্থা এরূপ যে প্রতি হাজারে ৯৯৯ জনই ইসলাম সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না। ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করতে জানে না, তাদের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানসিক ধ্যানধারণাও ইসলাম মোতাবেক পরিবর্তিত হয়নি।...এদের মতাধিক্যের হাতে শাসন ক্ষমতার ভার তুলে দিয়ে যদি কেউ এ আশা করে সে ইসলামের গাড়ী সঠিক পথে চলবে, তাহলে তার খোশা-খেয়াল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য।' (মুসলমান আউর সিয়াসি কশমকাশ, তৃতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা ১৩০)। মওদুদী তাঁর দল মনে করে হাজারে মাত্র একজন মুসলমান খাঁটি এবং সেই একজন মুসলমানেরই শাসন করার ধর্মীয় অধিকার রয়েছে। বলাই বাহুল্য সেই হাজারে এক জামাতে-ইসলামির সদস্য। জামাতে-ইসলামি দল গঠন করার পর প্রথম ভাষণে মওদুদী সে কথা গোপন রাখেননি। তিনি বলেন 'আমরা খাঁটি এবং আসল ইসলাম নিয়ে যাত্রা করছি এবং পুরোপুরি ইসলামই আমাদের আন্দোলন।' (রোয়েদাদে জামাতে-ইসলামি, প্রথম খণ্ড)। বার্টনও বলেন 'wicked people simply do not obey righteous laws' কারণ 'it is not in their nature to do so' তাঁর মতে righteous লোক হল একজন খাঁটি খ্রিস্টান যিনি আইনসভায় নির্বাচিত হতে পারেন এবং শপথ করে বলতে পারেন, 'I do believe in one God, the creator and Governor of the universe, the rewarder of the good and punisher of the wicked and I do acknowledge the Scriptures of the Old and New Testament to be given by Devine Inspirator.'

বর্তমানের গণতান্ত্রিক শাসন বিশ্বকে কী নিদারুণ সংকটে ফেলে দিয়েছে সব ধর্মের মৌলবাদীরা সে সম্পর্কে সোচ্চার এবং লোকজনকে বোঝাতে চাইছে যে কেবল ধর্মীয় শাসনই বিশ্বে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারে এবং শোষণের অবসান ঘটাতে পারে। স্বামীজি তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন 'একজন ধার্মিক লোক যখন রাজনীতিতে যোগ দেয়, তখন তার রাজনীতি নিশ্চয়ই উঁচু মানের হবে অর্থাৎ তা মিথ্যাবর্জিত হবে, প্রতিপক্ষের প্রতি তার ব্যবহার সৌজন্যজ্ঞনক হবে, হিংসা, লোভ ও ক্রোধের দ্বারা তাড়িত হয়ে কোন অন্যায় আচরণ কারো সঙ্গে করবে না।' বিপরীতে 'ধর্মহীন বা ধর্মবিরোধী ব্যক্তির রাজনীতি কী নিদারুণ হবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।' হাজারে একজন খাঁটি মুসলমানের রাজনৈতিক দল জামাতে-ইসলামির নেতা মওদুদী জার্মানির ও ইটালির দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন 'হিটলার ও মুসোলিনি যে বিরাট শক্তি অর্জন করেছে সমগ্র বিশ্বে তা স্বীকৃত।' তাদের সাফল্যের কারণ হিসাবে মওদুদী দু'টো জিনিসের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 'সেই দু'টো বস্তু অর্থাৎ বিশ্বাস ও নির্দেশের প্রতি আনুগত্য। নাজি ও ফ্যাসী দল কখনো এতো শক্তি ও ক্ষমতা অর্জন করতে পারত না, যদি না তারা নিজেদের নীতির প্রতি অটল বিশ্বাস রাখত এবং নিজেদের নেতৃবৃন্দের কঠোর অনুগত না হতো।' (তরজমানুল কোরআন, ১৯৩৪ ডিসেম্বর)। ধর্মের নামে ফ্যাসিজমের এরূপ কদর্য গুণকীর্তন করা ধর্মান্ধ মৌলবদীর পক্ষেই সম্ভব। মওদুদীর এই বাক্যে পৃথিবীর সব দেশের সব ধর্মের মৌলবাদী পার্টির ফ্যাসিস্ট চরিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। হিটলার ও মুসোলিনির ঐতিহ্য অনুসারী জামাতি নেতা বলেন 'সুতরাং এ পার্টির পক্ষে হুকুমত হস্তগত করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই।' (হকিকতে জিহাদ পৃ: ৫৯)। ডেভিড বার্টন বলেন 'when the righteous rule, the people rejoice, when the wicked rule, the people groan.' ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার ফল বার্টন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। 'America would have no murder or theft for we have laws which prohibit them.' আইন থাকা সত্ত্বেও আমেরিকায় হত্যা ও চুরি বন্ধ হয়নি। কারণ ধর্মহীন বা ধর্মবিরোধীরা ক্ষমতায় আছেন। স্বামীজিও একই কথা বলেন 'সুতরাং ধর্মকে বাদ দিলে রাজনীতি দুর্নীতিতে পরিণত হবে। আজ সব দেশেই এই দুর্নীতির প্রাধান্য দেখতে পাচ্ছি।' তাঁরা যখন এসব কথা বলেন, তখন ধর্ম-শাসিত হাজার হাজার বছরের পৃথিবীর কথা মনে রাখেন না কিংবা ইচ্ছা করে গোপন রাখেন। কিন্তু ইতিহাস সবার সামনেই আছে। জয়ন্তানুজবাবু ইতিহাসের সাক্ষ্য টেনেই বলেন 'প্রবল ধর্মবিশ্বাসের যুগে পাশ্চাত্য সমাজ ও সভ্যতা ছিল বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশি নীতিহীন, আদর্শহীন এবং গুরুতর অসাম্য ও স্বৈরাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত।' আজও যদি এইসব ধান্দাবাজ ধর্মবাদীরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যায়, তাহলে পৃথিবীর চেহারা কেমন হবে তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি একাত্তরে বাংলাদেশে, বি জে পির বাবরি মসজিদ ভাঙ্গায়, এখনও পাচ্ছি বসনিয়ায় ও আফগানিস্তানে।

ভারতে যেমন বি জে পির নেতৃত্বে সংঘ পরিবার গণতন্ত্রের

পরিবর্তে হিন্দু-শাসন চালু করার সংগ্রাম করছে, বাংলাদেশে যেমন জামাতে-ইসলামি গণতন্ত্র নয়, ইসলামি শাসন কায়েম করতে চায়, আমেরিকায় ওয়াল বিল্ডার্সও তেমনই সেখানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর অবসান ঘটিয়ে খ্রিস্টীয়-শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তাই এদের সবার যুক্তি বিন্যাসে কী অপূর্ব মিল খুঁজে পাওয়া যায়। 'রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম মেশানো উচিত নয়'—একথা যেমন স্বামীজির কাছে 'অর্থহীন', সেকথা তেমনই অর্থহীন বাংলাদেশের মওদুদী-গোলাম আজম গোষ্ঠী ও আমেরিকার ডেভিড বার্টনের কাছেও। এরা সবাই ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে জনগণের শাসনের স্থলাভিষিক্ত করতে চান। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এদের বিরোধী মানুষের সংখ্যাও প্রচুর। জয়ন্তানুজবাবু তাঁর প্রবন্ধে সেদিকেও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 'বিজ্ঞানের অগ্রগতি, জনশিক্ষার প্রসার এবং শিল্পায়নের পর থেকে ইউরোপ-আমেরিকার খ্রিস্টান-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলির রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব অনেক কমে এসেছে। কারণ ব্যক্তির জীবনেও ধর্মের প্রভাব কমে গেছে।' কেবল ইউরোপ-আমেরিকার জনগোষ্ঠির জন্য একথা সত্যি, তা নয়। অতীতের যেকোন সময়ের চেয়ে বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র সাধারণ মানুষের ধর্মবিশ্বাস শিথিল হয়ে পড়েছে। মানুষ ক্রমেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর বেশি বেশি নির্ভর করতে চাইছে। ভারত ও বাংলাদেশেও ধর্মনিরপেক্ষ ও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের সংখ্যা কম নয়। তাই গণতন্ত্রের বদলে ধর্মভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠার অর্থ হল বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের শাসনের বদলে মুষ্টিমেয় যাজক-পুরোহিত-মোল্লা শ্রেণীর শাসনের প্রতিষ্ঠা। তাহলে পৃথিবীর চেহারা কেমন হবে তা জানার জন্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের পৃথিবীর চেহারাটার দিকে একবার তাকাতে বলি। পৃথিবী দীর্ঘকাল এদের নিষ্ঠুর শাসন প্রত্যক্ষ করেছে। সৃষ্টিকর্তার নাম ভাঙ্গিয়ে বি জে পি-জামাত-ওয়ালবিল্ডার্স আবারও সেই রকমের অমানুষিক বর্বর ও নিষ্ঠুর শাসন কায়েম করতে চাইছে। গণতন্ত্র এদের প্রধান শত্রু। মওদুদী স্পষ্ট ভাষায় সেকথা জানাতে লজ্জাবোধ করেন না। 'জনগণের সরকার—জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য—মুসলমান হিসাবে আমি এ নীতির সমর্থক নই।' (সিয়াশী কাশমকশ, ৩য় খণ্ড পৃ ৬২)। ডেভিড বার্টন বলেন "Our founding fathers had an opportunity to establish a democracy and they choose not to;...So strongly did the Founders oppose a democracy that when they created the Constitution, they included a proposition to keep America from becoming a democracy." তাঁরা একটা 'Republican form of Government' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা গণতন্ত্র বিরোধী। গণতন্ত্র ও Republic-এর পার্থক্য নির্দেশ করতে বার্টন নোয়াহ্ ওয়েবস্টারের একটি উক্তি ব্যবহার করেন 'Our citizens should early understand that the genuine source of correct republican principles is the Bible, particularly the New Testament or the Christian religion.' শক্তির উৎসই গণতন্ত্র ও রিপাবলিকের মধ্যে পার্থক্যের মূল চাবিকাঠি নিহিত। গণতন্ত্রে 'জনগণই ক্ষমতার উৎস', রিপাবলিকে 'বাইবেল'। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, বি জে পি ও মওদুদীও তাই চায়। কারণ বিপুল সংখ্যালঘিষ্ঠ ঐসব সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠি ভালভাবেই বোঝে যে গণতন্ত্রের মাধ্যমে তারা কখনও ক্ষমতার কাছাকাছি যেতে পারবে না।

তাই যাঁরা রাজনীতি বা রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করতে চান, যাঁরা ধর্মকে লৌকিক ও সামাজিক স্তরে ক্রিয়াশীল রাখতে চান, তাঁরা যেমন ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক দলগুলির ধর্মীয় অনুষঙ্গগুলির ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হন, অপছন্দ করেন, তেমনই তাঁদের নিজেদেরও উচিত অন্তত রাজনীতি আলোচনায় স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে ধর্মকে স্বাক্ষ না মানা। সেটাও এক ধরনের ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের মধ্যে পড়তে পারে। আমাদের মতো অশিক্ষিত ও ধর্মভীরু মানুষের দেশে এতে সাম্প্রদায়িক শক্তিরই লাভ হয়। ইহজাগতিকতার অপর নাম রাজনীতি কিংবা রাজনীতির অপর নাম ইহজাগতিকতা। তাই রাজনীতির ক্ষেত্র যেমন ইহজাগতিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাই যুক্তিযুক্ত তেমনি ইহজাগতিকতার সমস্যাগুলির সমাধান রাজনীতির মধ্যেই খোঁজা উচিত। তা অতিক্রম করে ধর্মীয় সীমানার মধ্যে ঢুকলেই সংঘাত অনিবার্য। রাষ্ট্রের উচিত কারও ব্যক্তিগত বা সামাজিক ধর্মবিশ্বাস হস্তক্ষেপ না করা। গণতন্ত্র সেটাই দাবি করে। গণতন্ত্র যেমন তা নিশ্চিত করে, তেমনি রাষ্ট্রপরিচালনায় ধর্মেরও নাক গলানো উচিত নয়। ধর্ম যখন ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রের ইহজাগতিকতায় হস্তক্ষেপ করে, নাক গলায়, তখন অবশ্যই সে বিষয়ে কথা বলার অধিকার সবারই আছে।

শহিদুল ইসলাম
ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

'লেখা ও তার লেখক'

গত শ্রাবণ, ১৪০১ এর পত্রিকা-সংখ্যাটিতে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কাননবিহারী বক্তৃতামালায়' পঠিত শঙ্খ ঘোষের নিবন্ধটির 'লেখক' শীর্ষক অংশটি প্রকাশ করে আপনি আমাদের চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। বর্তমান যানবাহন সমস্যার

দিনে অকুস্থলে উপস্থিত না হতে পারার দরুন নিবন্ধ পাঠটি শোনার সৌভাগ্য থেকে যাঁরা বঞ্চিত হয়েছিলেন, চতুরঙ্গে তার একটি অংশ পাঠের সুযোগলাভে তাঁরা যে কৃতার্থতর বোধ করবেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এবং নিবন্ধটি না পড়লে, কবির কবিতাকে জানার অন্তরস্থিত তাগিদ অনুভবের প্রয়োজনীয়তাও সব পাঠকের ক্ষেত্রে সমান ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হত না। আলোচনাটি অত্যন্ত সময়ানুগ বললেও, কম করে বলা হয়। শঙ্খ ঘোষের 'লেখা ও তার লেখক' নিবন্ধটি যেন আধুনিক সময়ের বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রালোচনার ক্ষেত্রে সৃষ্টিস্তিত মূল্যায়নের একটা সামগ্রিক রূপ। আমাদের বহুল প্রচারিত পত্রিকাগুলির শারদ ও সাধারণ সংখ্যাগুলিতে কবি রবীন্দ্রনাথের রচনা বিষয়ক আলোচনার নামে যে সব প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলির ধারাবাহিক আত্মপ্রকাশ ঘটছে তাতে রবীন্দ্রকাব্যের সাধারণ ও অতিসাধারণ পাঠকেরা বিভ্রান্ত না হয়ে পারেন না। এই সমস্ত পাঠের ফলে আমাদের মতো সাধারণ বুদ্ধি পাঠকের দরবারে কবির কবিতার মর্মবাণী পৌঁছয় না। বরং তার জীবনতথ্যকেই যেন আলোচ্য বিষয় বলে মনে করা হয়। যিনি আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় কবি তাঁর রচনা-সমগ্র থেকে আমরা ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি ধারাবাহিক এক ধরনের তদন্তধর্মী রবীন্দ্রালোচনার আতিশয্যে। বাস্তবতাকে ভিত্তি করেই মহৎ কবিকল্পনা নির্মাণ করে থাকে কবিতার সৌধ। কল্পনা বাস্তবের ওপর প্রতিষ্ঠা না পেলে কবিতার সৌধ ভেঙে পড়তে দেরি হয় না। কিন্তু সেই অজুহাতে কোন কোন সমালোচক লেখকের জীবনতথ্যকে, সে তথ্য যত নিভৃত বা ব্যক্তিগত হোক না কেন, আলোচ্য রচনার ভিত্তিপ্রস্তর বলে নির্দান দেন তা হলে কী করে বোঝা যাবে তা ধন্বন্তরীর নিদান!

আর তাঁর জীবন সম্পর্কিত অন্য কোন তথ্য বা বহুদূর-লগ্ন কবির ব্যক্তিক কোন অভিজ্ঞতা যে তাঁর কবিতার মাটির সঙ্গে শিকড় সম্পর্ক গড়ে তোলেনি তারই বা কী প্রমাণ। শিল্প সাহিত্যের সৃষ্টি ও নির্মিতি বিষয়ক আলোচনায় যাঁরা পারঙ্গম তাঁদের মাধ্যমেই জানা যায় এক ধরনের 'ঐশ্বরিক' নৈর্ব্যক্তিকতাই সৃষ্টির আদি রহস্য। অতীতের কোন ঘটনাকে বর্তমানের সম্পূর্ণ কোন এক ভিন্নধর্মী ঘটনার সূত্রে লগ্ন করে কবিমন জন্ম দিতে সক্ষম হয় কোন বিশেষ একটি কবিতাকে। প্রাবন্ধিক আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর সুচিন্তিত রবীন্দ্র কাব্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের প্রেম পর্যায়ের কোন কোন গানের সঙ্গে তার পূজা পর্যায়ের এক একটি গানের এত সূক্ষ্ম পার্থক্য যে গানগুলি ঠিক কোন পর্বে স্থান হওয়া উচিত তা বোঝাও দুরূহ। আবু সয়ীদ আইয়ুবের ব্যাখ্যার সূত্রে কবিজীবনের কোন তথ্যকে তাহলে এস্থলে গানগুলির প্রাসঙ্গিক ভিত্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হবে। আসলে কবিকে তাঁর রচনার মধ্যে যেমন পাওয়া যায়, তাঁর জীবনচরিতে যে তা যায় না, এ সত্যকথন তো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই। তবু স্বয়ং লেখক যদি তাঁর কোন লেখার পটভূমিকে দেখে থাকেন তাঁরই কোন ব্যক্তিক অভিজ্ঞতাকে তাহলে সেই রচনার অর্থ বুঝতে গেলে সেই কবি-অভিজ্ঞতার সাহায্য আমাদের গ্রহণ করতেই হয়। না হলে কৌতূহলী অন্বেষায় কবিতা পাঠ হবে গৌণ।

নমস্কারান্তে
অশোক মৈত্র
৭৭।২৩।১, বি. রোড
হাওড়া—৬

প্রতিবেদন

পুরস্কৃত উপন্যাস 'অলীক মানুষ'

আবদুর রউফ

'অলীক মানুষ' উপন্যাসের জন্য ১৯৯৪-এর সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেলেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। এই ঘটনা চতুরঙ্গ পত্রিকার জন্য বিশেষ আনন্দ বহন করে এনেছে। কারণ, উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এই পত্রিকায়। পর্যাপ্ত নম্রতার সঙ্গেই অন্তত এইটুকু দাবি করা যায়, চতুরঙ্গের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসাবে সিরাজের কাছে উপন্যাসটি লেখার আরজি পেশ করেছিলাম আমিই। তখন তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। তাঁকে বলেছিলাম, 'এমন একখানি উপন্যাস লিখুন যেটি হবে আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনা; যার মধ্যে থাকবে আত্মজৈবনিক উপাদান'। সিরাজ সানন্দেই সম্মত হয়েছিলেন এবং কথা রেখেছিলেন। কিন্তু মাত্র আটটা পরিচ্ছদ লেখার পরেই তিনি চেয়েছিলেন এই লেখা থামিয়ে দিতে কারণ তখন পর্যন্ত এই ধারাবাহিকটির জন্য তাঁর পরিচিত মহল থেকে প্রত্যাশিত উৎসাহ তিনি পাচ্ছিলেন না। লেখা থামিয়ে দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি তিনি নিজেই লিখে নিয়ে চতুরঙ্গ দপ্তরে হাজির হয়েছিলেন। সেই সময় তাঁর উৎসাহকে জিইয়ে তোলার জন্য আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিলাম। লেখকের নিজের ভিতরের তাগিদও নিশ্চয়ই ছিল। তাই মাঝপথে লেখা থেমে যায়নি। এই ঘটনা সিরাজ পরে আমার প্রতি স্নেহবশত স্মরণ করেছেন তাঁর একটি লেখায়। 'অলীক মানুষ'-এর নির্মিতি সম্পর্কে তাঁর এই লেখাটি ছাপা হয়েছিল 'কোরক' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকার শারদীয় ১৪০০ সংখ্যায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, 'অলীক মানুষ' বই হয়ে বের হওয়ার সময় সেটি আমার নামে উৎসর্গ করে সিরাজ আমাকে দুর্লভ সম্মানে ভূষিত করেছিলেন।

'কোরক'-এর উল্লেখিত সংখ্যাতেই 'অলীক মানুষ' সম্পর্কে আমিও একটি বড় প্রবন্ধ লিখেছিলাম। সংখ্যাটি হাতে আসার আগে পর্যন্ত জানতে পারিনি 'অলীক মানুষ'-এর নির্মিতি সম্পর্কে সিরাজও তাঁর কিছু বক্তব্য এতে রেখেছেন। আমার লেখায় উপন্যাসের কাহিনীবিন্যাসের বিশৃঙ্খলা, কাহিনীর অন্যতম নায়ক শফিউজ্জামানের চরিত্র নির্মাণে কিছু কিছু অস্পষ্টতা, কোন চরিত্রের তেমন কোন উত্তরণ না থাকা ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু কিছু মৃদু সমালোচনা আমি করেছিলাম। কিন্তু সিরাজের বক্তব্য পড়ে বোঝা গেল, এসব ছিল স্বেচ্ছাকৃত ব্যাপার। পাঠকরুচির তোয়াক্কা না করে উপন্যাসের ধর্ম নিয়ে তিনি ইচ্ছে মতন ভাঙাগড়ার খেলা খেলেছেন। এক কথায় তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, "'অলীক মানুষ'-এ আমি স্বেচ্ছাচারীর আনন্দ পেয়েছি"। শিল্পীর এই স্বেচ্ছাচার থেকে সাহিত্যরসিক পাঠক কতখানি রসাস্বাদনের তৃপ্তি পাবেন সেই বিচার এখনও কালের হাতে ছেড়ে রাখাই ভাল।

তবে, আমার মতো আরও অনেক পাঠকের কাছেই যে 'অলীক মানুষ' অনন্যসাধারণ উপন্যাস এতে এখন আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যে সময়সীমার প্রায় একশো বছরের পটভূমিতে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের যে ফেব্রটিতে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করে সিরাজ 'অলীক মানুষ'-এর কাহিনী নির্মাণ করেছেন, সেই সময়সীমায় কারো কারো কিছুটা গতায়াত থাকলেও বিশেষ করে ঐ ফেব্রটিতে বিচরণ করার দুঃসাহস সিরাজের আগে উভয় বঙ্গেই কেউ দেখাতে পেরেছেন বলে আমার জানা নেই। কাহিনীর পটভূমিকে মৃত্তিগ্রাহ্য করে তোলার জন্য যে পরিমাণ ইতিহাস-চেতনা এবং গভীর সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞানের পরিচয় লেখককে দিতে হয়েছে তাতে এই উপন্যাস বাঙালি হিন্দু-মুসলিম জীবনের একটি অনাবিষ্কৃত অধ্যায়ের ঐতিহাসিক ডকুমেন্ট'ও হয়ে উঠতে পেরেছে নিঃসংশয়ে।

'অলীক মানুষ'-এর কাহিনীর প্রধান নায়ক বদিউজ্জামানের চরিত্রকে কেন্দ্র করে সিরাজ 'মিথিক্যাল ম্যান'-এর যে ট্রাজেডি উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য করে তুলেছিলেন তাতেও তাঁর সাফল্য শতকরা একশো ভাগ। বদিউজ্জামানের মতো পীর বা ধর্মগুরুকে কেন্দ্র করে কুসংস্কারাচ্ছন্ন গণমানসে নানারকম অলীক কাহিনীর ভিত্তিতে 'মিথ' গড়ে ওঠার উপযোগী আবহ নির্মাণ নিঃসন্দেহে লেখকের অসাধারণ মুন্সিয়ানার স্বাক্ষর বহন করে। বহুল প্রচারিত এই 'মিথ'-এর প্রবল প্রভাবে এক সময় বদিউজ্জামানের নিজের কাছেই তাঁর প্রকৃত বাস্তব সত্তা অস্পষ্ট এবং অর্থহীন হয়ে ওঠে। শুরু হয় একজন রক্তমাংসের মানুষের জীবনের আসল ট্রাজেডি। 'মিথিক্যাল ম্যান' বদিউজ্জামানের জীবনের ট্রাজেডির যে মর্মন্তুদ চিত্র লেখকের কলমে ফুটে উঠেছে তাতে পাঠকচিত্ত আলোড়িত হয় এবং 'মিথ'-এর আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে আসল বদিউজ্জামান। কিন্তু তাঁর নাস্তিক পুত্র শফিউজ্জামানকে কেন্দ্র করেও গণমানসে যে ধরনের 'মিথ' দানা বেঁধে ওঠে তা অলৌকিকতা নির্ভর না হওয়ায় উপন্যাস পাঠকের কাছে শেষ পর্যন্ত তিনি অনেকাংশে অলীক মানুষই থেকে যান। যদিও এই চরিত্রটি অন্বেষী অংশগুলির সঙ্গে সিরাজের নিজের জীবনের মিল অনেক, একথা শুনেছি লেখকের নিজের মুখেই।

সিরাজের সম্ভবত উদ্দেশ্য ছিল জীবনজিজ্ঞাসার তীব্রতার তাড়নায় এবং নানা ঘাত-প্রতিঘাতে শেষ পর্যন্ত নৈরাজ্যবাদী হয়ে ওঠা এই নাস্তিক চরিত্রটির ভিতর দিয়ে একটি বিশেষ স্তরে জীবনের সামগ্রিক উদ্দেশাহীনতাকে বিবৃত করা।

উপন্যাসটিতে রহস্যময় বাতাবরণ সৃষ্টির প্রশ্নে সিরাজ নিজেই স্বীকার করেছেন, লাতিন আমেরিকার 'ম্যাজিক রিয়েলিজম্'-এর কিছু লক্ষণ এই উপন্যাসে স্পষ্টতই লক্ষ করা যায়।

সিরাজ যে দাবি করেছেন, উপন্যাসটিকে কোন ভাবেই 'মুসলিম জীবনভিত্তিক' বলে পৃথক পংক্তিভুক্ত করা যায় না, এই দাবির সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত। ঘটনাচক্রে বদিউজ্জামান, শফিউজ্জামানের মতো প্রধান চরিত্রগুলিকে মুসলমান সমাজ থেকে আহরণ করা হয়েছে বটে—লেখকের মতে কাহিনীর সুবিধার জন্য অনেকখানি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই তা করা হয়েছে— স্থান-কাল-পাত্রের বর্ণনাকে বাস্তবগ্রাহ্য করে তোলার তাগিদে সেই সময়ের মুসলিম সমাজ এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বাস্তবচিত্র অনুধাবনের প্রয়াস থাকলেও এটি যে আসলে মিথিক্যাল মানুষের ট্যাজেডির কাহিনী এবং এইরকম মিথিক্যাল মানুষ যে কোন দেশ, কাল এবং ধর্মে সীমাবদ্ধ নয়, এতে সন্দেহের কোন অবকাশও থাকতে পারে না। এই দিক থেকেও 'অলীক মানুষ' বাংলাসাহিত্যে একটি নতুন মাত্রা সংযোজিত করতে পেরেছে। উপন্যাসটি যে ভারতীয় ভাষাপরিষদের ভূয়ালকা পুরস্কার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বঙ্কিম পুরস্কার এবং সাহিত্য অকাদেমির পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত হল, এতে এইটুকুই বলা যায় যে পুরস্কারগুলি উপযুক্ত ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হয়েছে।

পরিশেষে আমরা কামনা করব, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ দীর্ঘজীবী হোন, তিনি দেহ-মনে সুস্থ থাকুন, তাঁর মনীষা এবং সৃজনশীলতা দ্বারা বাঙালির মননশীলতা এবং সাহিত্য আরও সমৃদ্ধি লাভ করুক।

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির বই

সফদর হাশমি নাট্য সংগ্রহ	১৫.০০ টাকা
ঋষি- নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য— কুমার রায়	২০.০০ টাকা
কলকাতার নাট্যচর্চা — রথীন চক্রবর্ত্তী	১০০.০০ টাকা
নট ও নাট্যকার যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী — কুমার রায়	৩.০০ টাকা
সুকুমারী দত্ত ও অপূর্বসতী নাটক — সম্পাদনা বিজিত কুমার দত্ত	৮.০০ টাকা
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা তৃতীয় সংখ্যা	২০.০০ টাকা

সদ্য প্রকাশিত

নট- নাট্যকার নির্দেশক বিজন ভট্টাচার্য — লেখা সজল রায়চৌধুরী, সম্পাদনা নৃপেন্দ্র সাহা	৮০.০০ টাকা
নাট্যাচার্য শিশির কুমার — শঙ্কর ভট্টাচার্য	৪০.০০ টাকা
আশার ছলনে ভুলি — উৎপল দত্ত	৩৫.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

নাট্য আকাদেমি দপ্তর- কলকাতা তথ্যকেন্দ্র

১/১ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০.

টেলিফোন-২৪৮-৪২১৪.

ইউনিভারসিটি ইন্সটিট্যুট হল কাউন্টার, কলেজ স্কোয়ার,

কলিকাতা-৭০০ ০৭৩.

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩, দে বুক এজেন্সি, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩,
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গ্রন্থাগার, ১১৮ হেমচন্দ্র নস্কর রোড, কলিকাতা - ৭০০ ০১০।